বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস: রাইচরণ সরদার, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তুলনামূলক আলোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

বিমলেশ মান্না

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. কনক চন্দ্র সরকার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

'বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস: রাইচরণ সরদার, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তুলনামূলক আলোচনা' (Banglar Dolit Chetonar Itihas: Raicharan Sardar, Jogendranath Mondal O Adwaita Mollabarmaner Tulonamulak Alochana) submitted by me for the Award of the Degree of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Kanak Chandra Sarkar, Professor, Department of International Relations, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Kanak Sarkar
05/09/24

Dr. Kanak Chandra Sarkar
Professor
Department of International Relations
Jadavpur University
Kolkata:700032
Dated

PROFESSOR
Dept. of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate

Bimales Manna
05/09/24

(Bimales Manna)
Dated

মুখবন্ধ

(Preface)

ভারতবর্ষ হল বিশ্বের বৈচিত্র্যময় দেশগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেশ। কবির ভাষায় বলা যায় ‘নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’। এই ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার গঠন এবং প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। এই সমাজে যেমন বিভিন্ন ধর্মের, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য আছে, তেমনি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পার্থক্য স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। উক্ত পার্থক্য গুলিকে অনুধাবন করার জন্য ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, নৃতাত্ত্বিক গবেষকগণ সর্বদাই আগ্রহী। ভারতীয় সমাজে ‘জাত ব্যবস্থা’ (Caste System) একটি নেতিবাচক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রথা। কারণ এই জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা সমাজে মানুষের মধ্যে ঘৃণা, অবজ্ঞা সৃষ্টি করছে। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি স্তর তৈরি করছে। উঁচুজাত এবং নিচুজাতের মানুষের মধ্যে বায়োলজিক্যাল ও নৃত্তাতিক পার্থক্য কতটা তা বিজ্ঞানের পর্যালোচনার বিষয়। কিন্তু ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সূক্ষ পার্থক্য রয়েছে সেবিষয়ে সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসে নিরন্তর গবেষণা চলছে। সমাজের উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের প্রভেদকে অনুধাবন করার জন্যই দলিত বিষয়ে গবেষণাতে আগ্রহী হয়েছি।

বর্তমান গবেষণা পত্রটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড.কনক চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট। তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য ব্যতীত আমার গবেষণাপত্র রচনার কাজ সম্পন্ন হত না। তাই তাঁকে আন্তরিকভাবে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া আমার গবেষণার RAC (Research Advisory Committee) র দুইজন সদস্য হলেন অধ্যাপক ড.বিজয় কুমার দাস এবং ড.অরূপ ভট্টাচার্য। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণার কাজের পথকে মসৃণ করে তুলেছে। তাই তাঁদের দুজনকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এম.ফিলের (M.Phil) তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড.রূপকুমার বর্মন মহাশয়কে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে তিনিও আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদেরকে জানাই আমার প্রণাম। অধ্যাপক ড.কৌশিক রায়, অধ্যাপক ড.দেবজিত দত্ত, অধ্যাপক সমীর দাস, অধ্যাপিকা ড.তিলোত্তমা মুখার্জী, অধ্যাপিকা ড.মহুয়া সরকার, অধ্যাপিকা ড.সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী, অধ্যাপিকা ড.মেরুরা মুর্মু ওনারা গবেষণার কাজকে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া শেষ পর্বে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক ড.কামরান মণ্ডল, তাঁকেও আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

স্নাতক স্তর থেকে যার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে এগিয়ে চলেছি এবং প্রতিনিয়ত গবেষণার কাজের খবর নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ভক্তি ভৌমিক মহাশয়া। এবং ওনার স্নেহ ভালবাসা আমাকে জীবনে অগ্রসর হতে সাহায্য করছে। ওনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কলেজ স্তরের শিক্ষক মানিক সাউটিয়্যা মহাশয়কেও কৃতজ্ঞতা জানাই তিনিও পড়াশোনা চলাকালীন বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। আমার গবেষণার

কাজ তরান্বিত ও শেষ করার জন্য প্রতিনিয়ত খবর নিয়েছেন এবং বিবিধ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ড.গৌতম জানা ও অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত মহাশয়। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অশিক্ষক কর্মচারীগণ সজল দা, প্রতিমা দি বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজকর্ম করতে সহায়তা করেছেন। এবং আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগের অশিক্ষক কর্মচারীগণও সাহায্য করেছেন। তাই তাঁদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

বর্তমান গবেষণা পত্রের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি যাদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি তারা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের লাইব্রেরিয়ান বণানী ম্যাডাম, জয়শ্রী দি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভাগীয় লাইব্রেরিয়ান পার্থপ্রতিম বোস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর যে সমস্ত লাইব্রেরিয়ান আমাকে বাংলা সহায়ক উপাদান দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এছাড়া কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, বাংলা সাহিত্য একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকেও অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ির জেলা লাইব্রেরী থেকেও আমি সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাই ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য কর্তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণা চলাকালীন যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য পেয়েছি তারা হলেন শিক্ষক দিলীপ গায়েন (দক্ষিন ২৪ পরগনা), মনোহর মৌলি বিশ্বাস (কলকাতা), অধ্যাপক

অসিত বিশ্বাস (কলকাতা), হরষিত সরকার (উত্তর ২৪ পরগনা), ধূর্জটি নস্কর (দক্ষিন ২৪ পরগনা), গোবর্ধন দাস (পূর্ব মেদিনীপুর), গৌতম মন্ডল (দক্ষিন ২৪ পরগনা) প্রমূখ। এদের কাছ থেকে আমি মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি এবং বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি। তাই এই সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞান বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ও ধন্যবাদ। আমার গবেষণা সন্দর্ভকে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক ড.মহম্মদ আবু নাসিম তাই তার কাছেও আমি চির কৃতজ্ঞ। গবেষণা চলাকালীন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। সেই সময় সর্বদা পাশে থেকে আমায় উৎসাহ দিয়েছেন আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা ড.সাবর্নী প্রামানিক নায়ক, অধ্যাপক ড.অর্কপ্রভ মিশ্র এবং অধ্যাপক ড.মনিরুল ইসলাম তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার যে সমস্ত গবেষক বন্ধু ও গবেষক দাদা দিদিদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড.কৃষ্ণ কুমার সরকার, ড. আশীস ওরাং, সংঘামিত্রা দাস, সৌম্যদীপ খান্ডা, সৌমজিৎ মুখার্জী, সুদীপ মন্ডল, অধ্যাপক আদিত্য হালদার এদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আমার বিশেষ বন্ধু পুলকেন্দু মন্ডলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কারণ তার আর্থিক সাহায্য ব্যতীত আমার মাস্টার ডিগ্রি থেকে বর্তমান গবেষণা পর্যন্ত পড়াশুনা সম্ভবপর হতনা।

ছোটবেলা থেকে আমাকে পড়াশোনায় যিনি নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা শ্রীবানেশ্বর মান্না এবং মাতা জয়ন্তী মান্না তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমার শিক্ষাজীবন অপূর্ণ থেকে যেত। সেই জন্য আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী। এছাড়া আমার পরিবারের যারা সর্বদাই পাশে থেকে মানসিক ভাবে আমাকে সাহায্য

করেছেন তাঁরা হলেন দাদারা এবং বৌদিরা। আমার ভাইপো, ভাইজি সকলেই বিবিধভাবে সাহায্য করেছেন। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে আমার সহধর্মিনী (অনুশ্রী) ও পুত্র (দেবোত্তম) কেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। কারন তাদেরকে ভালোবাসা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে সর্বদা নিজের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিএইচ.ডি র গবেষণার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি।

বিমলেশ মান্না

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২

সংকেতাবলি (Abbreviations)

BA - Bachelor of Arts.

BL - Bachelor of Laws.

BPES – Bombey Peoples Education Society.

DC – Depressed Classes.

DS – Drabir Samiti.

FA – Fine Arts.

IA - Intermediate Arts.

ILA – Independent Labour Party.

INC – Indian National Congress.

JP – Justis Party.

MA - Master of Arts.

MLA – Member of the Legislative Assembly.

ML – Muslim League.

OBC – Other Backword Classes/Caste.

SC – Scheduled Caste.

ST – Scheduled Tribe.

সারণী সূচী (List of Table)

সারণী: নং	পৃষ্ঠা নং
সারণী: ১.৩. বিভিন্ন অর্থ ও বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী দলিত বলতে কাদের বোঝানো হয় সে সম্পর্কে তালিকা।	৫৩-৫৪
সারণী: ১.৪. উপনিবেশিক বাংলার ৭৬ টি তপশিলি জাতির নামের তালিকা।	৫৫-৫৮
সারণী: ১.৫. ঔপনিবেশিক পরবর্তী পশ্চিমবাংলার তপশিলি জাতির তালিকা।	৫৮-৫৯

পারিভাষিক শব্দাবলি (Glossary)

অস্পৃশ্য- জাত ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণীয় যে সমস্ত জাতিকে স্পর্শ করা যায় না।

আদমশুমারি- জনগণনা বা লোকগণনা।

উপনয়ন/উপবীত– ব্রাহ্মণনদের পৈতে ধারন অনুষ্ঠান।

কুনবী- মহারাষ্টের একটি নিম্নবর্ণীয় জাতি।

কৈর্বত্য- বাংলার তপশিলি জাতি ।

ক্রমনিম্ন পরিস্রুত তত্ত্ব (Downword Filtration Theory)- টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ধারনা অনুযায়ী ভারতে শিক্ষা উচ্চবর্ণ থেকে ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের মধ্যে পরিবাহিত হবে।

তপশিলি- The Government of India Act 1936 order অনুযায়ী ভারতীয় জাত ব্যবস্থার হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ, অনগ্রসর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য জাতিদেরকে তপশিলি জাতি হিসাবে অভিহিত করা হয়।

তম (Tama)- গীতার সূত্র অনুযায়ী এটি হল মানুষের নির্বুদ্ধিতা, বোকাটে, সৃজন ক্ষমতার অভাব প্রভৃতি গুণাবলী।

দলিত প্যান্থার- ১৯৭২ সালে মহারাষ্টে গঠিত দলিত সামাজিক সংগঠন। এখানে দলিত বিষয়ক লেখা সমূহ প্রকাশিত হয়।

দীনবন্ধু– ১৮৭১ সালে জ্যোতিবা ফুলে কতৃক প্রকাশিত পত্রিকা।

নমঃশূদ্র- বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তপশিলি জাতি।

নাপিত- বাংলার অনগ্রসর জাতির একটি অন্যতম। এদের পেশা ক্ষৌরকর্ম ।

পৌণ্ড্র- বাংলার চতুর্থ বৃহত্তম তপশিলি জাতি।

মালো- অবিভক্ত বাংলার মৎসজীবি একটি তপশিলি জাতি।

বাগদী- বাংলার তৃতীয় বৃহত্তম তপশিলি জাতি।

ব্রাত্যষ্টোমযজ্ঞ- নিম্নবর্ণীয় জাতিদের উচ্চবর্ণীয় জাতিতে উন্নীত হওয়ার যজ্ঞ/ শূদ্র জাতির ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হওয়ার যজ্ঞ।

রজ (Raja)- গীতার সূত্র অনুযায়ী রজ গুণাবলীর দ্বারা আবেগ, অহংকার ও অন্যান্য ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বোঝায়।

রাজবংশী- প্রধানত উত্তর বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য এবং বাংলার বৃহত্তম তপশিলি জাতি।

রেনেসাঁ- এটি একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ পুনঃজন্ম/নবজাগরণ।

মহাসঙ্ঘ- বর্তমান গবেষণাপত্রে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সংস্থা।

সত্ব (Satva)- গীতায় বলা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, সততা এবং অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলী প্রকাশ করে তাহল সত্ব গুণ।

হরিজন– মহাত্মা গান্ধী অভিহিত নিম্নবর্ণীয় জাতি সমূহ।

সূচীপত্র
(Contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	i-v
সংকেতাবলি	Vi
সারণি সূচী	Vii
পারিভাষিক শব্দাবলি	viii-x
ভূমিকা:	**১-৩৯**
প্রথম অধ্যায়: ইংরেজ শাসনাধীনে বাংলার দলিত জাতিদের পরিচিতি	**৪০-৭৩**
১.১. ভূমিকা	৪০
১.২. জাতি প্রথার উদ্ভব-প্রাচীন ভারতীয় সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত	৪১
১.৩. দলিত কাদের বলা হয়	৪৯
১.৪. ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জাতি সমূহের সংক্ষেপে বিবরণ	৫৫
১.৫. পর্যবেক্ষন	৬৭
➢ তথ্যসূত্র ও টীকা	৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: ৭৪-১০৮

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দলিত চেতনার বিকাশ

২.১. ভূমিকা ৭৪

২.২. উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দলিত চেতনার বিকাশ ৭৪

২.৩. সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত চেতনা এবং জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রীঃ) ৭৭

২.৪. সাবিত্রী বাঈফুলে (১৮৩১-১৮৯৩ খ্রীঃ) ৭৯

২.৫. শ্রী নারায়ন গুরু (১৮৫৫-১৯২৮ খ্রীঃ) ৮৭

২.৬. ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩ খ্রীঃ) ৮৮

২.৭. বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রীঃ) ৯০

২.৮. ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত চেতনায় উল্লেখযোগ্য মনীষীগন ৯৩

২.৯. হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) ৯৪

২.১০. গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭) ৯৮

২.১১. পর্যবেক্ষন ১০১

➢ টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১০২

তৃতীয় অধ্যায়: ১০৯-১৬৩

পৌণ্ড্রসমাজ জাগরণে রাইচরণ সরদারের (১৮৭৬-১৯৪২) ভূমিকা

৩.১. ভূমিকা ১০৯

৩.২. বংশ পরিচিতি এবং শিক্ষা লাভ ১১০

৩.৩. জীবন যুদ্ধে জয়ী যোদ্ধা রাইচরণ ১১৩

৩.৪. শিক্ষার প্রসারে রাইচরণ সরদারের অবদান ১১৬

৩.৪.১. সমাজ গঠনে সাংগঠনিক দক্ষতা ১১৯

৩.৪.২. সমাজ সংস্কারে রাইচরণ ১২১

৩.৫. বাংলা দলিত সাহিত্যের পথপ্রদর্শক ১২৩

৩.৬. বাংলার তপশিলি জাতির প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাইচরণ ১২৫

৩.৭. রাইচরণ সরদারের অন্যতম “শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র” গ্রন্থে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমানের প্রচেষ্টা ১৩৭

৩.৮. রাইচরণ সরদারের লেখার প্রধান কারন কি ছিল? ১৪০

৩.৯. তৎকালীন সময়ের অবিভক্ত বাংলা এবং বর্তমান সময়ের পশ্চিমবাংলাতেও রাইচরণ সরদার বঞ্চিত কেন? ১৪৭

৩.১০. পর্যবেক্ষন ১৪৯

- টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১৫২

চতুর্থ অধ্যায়: ১৬৪-২৪১

বাংলার দলিত চেতনায় মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের (১৯০৪-১৯৬৮) অবদান

৪.১. ভূমিকা ১৬৪

৪.২. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার প্রাথমিক পরিচয় ১৬৬

৪.৩. ছাত্রাবস্থায় জাতব্যবস্থার শিকার ১৭৪

৪.৪. আইন ব্যবসা ও জনকল্যান ১৭৬

৪.৫. বঙ্গীয় তপসিলি জাতি ফেডারেশন গঠন ১৮০

৪.৬. তপসিলি জাতির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় যোগেন্দ্রনাথ ১৮৩

৪.৭. বঙ্গ বিভাজনের পটভূমি ১৮৫

৪.৮. বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ কি দায়ী ছিলেন ১৯০

৪.৯. বাংলা সমন্বিতকরন পরিকল্পনা ২০৬

৪.১০. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে কেন মহাপ্রাণ বলা হয় ২০৯

৪.১১. মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সংগ্রাম এবং তাঁর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ২১৪

৪.১২. পর্যবেক্ষন ২২১

➢ তথ্যসূত্র ও টীকা ২২৩

পঞ্চম অধ্যায়: ২৪২-২৮৭

বাংলার দলিত চেতনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) ভূমিকা

৫.১. ভূমিকা ২৪২

৫.২. আর্বিভাব ও শিক্ষা জীবন ২৪৩

৫.৩. প্রাথমিক জীবনের লেখাপত্র এবং জীবিকা ধারন ২৪৫

৫.৪. শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম-এ মালোদের নিম্নবর্ণীয় সামাজিক অবস্থান ২৪৭

৫.৫. তাঁর বিবিধ রচনায় দলিত ঐতিহাসিক চেতনা ২৫১

৫.৬. অদ্বৈতের লেখাতে অর্থনৈতিক দারিদ্র ভাবনা ২৬১

৫.৭. অদ্বৈত মল্লবর্মনের লেখার প্রধান বিষয়বস্তু কি? ২৭৪

৫.৮. প্রধান বাংলাভাষী প্রদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মন অপ্রাসঙ্গিক কেন ? ২৭৬

৫.৯. পর্যবেক্ষন ২৮০

➢ তথ্যসূত্র ও টীকা ২৮১

➢ **উপসংহার: ২৮৮-২৯৫**

➢ **সংযোজনী: ২৯৬-৩২২**

➢ **চিত্রাবলি ৩২৩-৩৩০**

➢ **মানচিত্র ৩৩১-৩৩৩**

➢ **নামের নির্দেশিকা তালিকা ৩৩৪-৩৩৮**

➢ **বিষয় ভিত্তিক নির্দেশিকা তালিকা ৩৩৯-৩৪৩**

➢ **নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী: ৩৪৪-৩৬৮**

ভূমিকা

(INTRODUCTION)

বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা হল ভারতীয় সভ্যতা। প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চিন্তা চেতনা নিয়ে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনা ছিলনা, ভারতীয়রা ইতিহাস লিখতে জানতো না প্রভৃতি। এতদসত্বেও আধুনিক কালের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার ঘরানা কে চ্যালেঞ্জ করে দলিত স্টাডিজ (Dalit Studies) এবং সাবলটার্ন স্টাডিজের (Subaltern Studies) আগমন ঘটিয়েছেন। দলিত স্টাডিজে জাতপাত সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা করা হয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতপাতের উদ্ভব প্রাচীনকালে হয়েছিল। কিন্তু আধুনিককালে যখন ইংরেজ জাতি ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দখল করেছিল সেই সময় থেকে নতুন ভাবে জাতপাতের ইতিহাস চর্চায় গতি সঞ্চার করেছিল কিছু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Bucanon Hamilton (১৭৬২-১৮২৯), William Wilson Hunter (১৮৪০-১৯০০), Herbert Hope Risley (১৮৫১-১৯১১) প্রমূখ। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৮৩) ভারতের প্রান্তিক সমাজের মানুষজন নিয়ে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এছাড়া ১৯৯০ দশকের গোড়ায় দলিত প্রর্তকের (Dalit Discourse) সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত। ১৮৭২ সালে ঔপনিবেশিক

ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয়। ফলে তখন থেকেই ভারতীয় সমাজে জাতি পরিচিতি নির্মাণের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত।

জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০), সাবিত্রীবাঈ ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭), শ্রীনারায়ণ গুরু (১৮৫৬-১৯২৮), ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩), বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) প্রমুখদের দ্বারা ভারতে যেমন দলিত আন্দোলন গতি পেয়েছিল। ঠিক তেমনি তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, সমাজ গঠনেও মনোনিবেশ করেছিলেন। বাংলা প্রদেশের দলিত জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলিও নিজেদের শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে তারা জাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া আলোচ্য সময়ে নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলি উচ্চবর্ণীয়দের সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে উচ্চস্তরে ওঠার চেষ্টা করেন। যা সমাজবিজ্ঞানে সাংস্কৃতিকরণ নামে অভিহিত হতে থাকে। এবং প্রাচীন ভারত থেকে প্রচলিত জাত ব্যবস্থার (Caste System) বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নিম্নবর্ণীয় জাতিরা আন্দোলনে সামিল হতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences) বা ইতিহাস চর্চায় (Historical Studies) ওই সমস্ত নিম্নবর্ণীয় জাতিদের সংস্কার আন্দোলন গুলি অপাংতেয় হয়ে রয়েছে বা অনালোচিত থেকেছে বহুদিন। তাই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস এবং তিনটি দলিত জাতির তিনজন ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক এবং সংস্কার মুলক কার্যকলাপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা।

গবেষণার সমস্যার বিবরণ (Description of the Research Problem)

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত। তারা অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চাকুরি ও কর্মসংস্থান এবং সামাজিক এক কথায় সার্বিক বিকাশের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে দলিত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মহান ব্যক্তিবর্গ তাদের সমাজের জন্য নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজ করেছেন। এছাড়া স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী (২৬ শে জানুয়ারি ১৯৫০) হওয়ার পরে শিক্ষা, সরকারি চাকরি ও সংসদীয় নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলিত সমাজের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এতদসত্বেও দেখা যাচ্ছে যে দলিত সমাজের সবাই ওই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গুলো গ্রহণ করতে পারছে না। দলিত সমাজের একটি বৃহত্তম অংশের মানুষজন উপযুক্ত শিক্ষা এবং সামাজিক চেতনার অভাবে সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। এছাড়া সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতের দলিত সমাজের মানুষের প্রতি অদলিত মানুষজন ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং হেয় প্রতিপন্ন করেই চলেছে প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি। দলিত সমাজের এহেন দুর্দশার কারণ নির্ণয় প্রতিকার এবং সেই জন্য কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরী।

গবেষণার পরিধি (Scope of Research)

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিকে ঔপনিবেশিক অবিভক্ত বাংলা তথা ঔপনিবেশিকোত্তর পশ্চিমবাংলা এবং অধুনা বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। গবেষণা পত্রটি তিনজন দলিত মনীষা সম্পর্কে আলোচিত। যাদের মধ্যে একজনের জন্ম বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এবং অপর দুজনের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। গবেষণা প্রকল্পের সময়সীমা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। উক্ত ব্যক্তিদের জীবনকাল যেমন পৌণ্ড্র মনীষা শ্রী রাইচরণ সরদারের জন্ম ১৮৭৬ সাল। সালটি উপনিবেশিক ভারত তথা বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিবিধ গুরুত্ব রয়েছে যেমন ভারত সভা (India Association, ১৮৭৬) নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠেছিল। মৃত্যু ১৯৪২ সাল। পরাধীন ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২) এই বছর শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন নমঃশূদ্র সমাজের মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরটিও ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যেমন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রনয়ন, এবং তার মৃত্যু ১৯৬৮ সাল। নেহেরু যুগের অবসানের কয়েক বছর পরে তার মৃত্যু হয়। ওই বছর স্বাধীন ভারতে প্রথম নতুন শিক্ষানীতি (১৯৬৮) গৃহীত হয়েছিল। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন মালো সমাজের বিখ্যাত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর জন্ম ১৯১৪। বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ভারতের ক্ষেত্রে ও উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ ১৮৭৬ থেকে ১৯৬৮ সাল প্রায় ১০০ বছর বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিতে

পৌন্ড্র, নমশূদ্র, এবং মালো এই তিন সমাজের তিনজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির অবদান কতখানি তা তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে সুবিস্তৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

তথ্য ও সাহিত্য সমীক্ষা (Survey of Literature)

ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাত ব্যবস্থা (Caste System) বর্তমান সময়েও একটি স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিরাজমান। তবে এটা ঠিক যে এই জাতি ও বর্ণপ্রথা দেশের সর্বত্র সমানভাবে স্বীকৃত নয়। প্রাচীনকালে বৈদিক সভ্যতার (১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সময় থেকে যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলেই জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। ফলে উনবিংশ শতক থেকে জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সক্রিয় হতে থাকে যা পরবর্তীকালে 'দলিত আন্দোলন' (Dalit Movement) নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে। দলিত আন্দোলনের পাশাপাশি দলিত বিষয়ক সাহিত্য সম্ভার ও দলিত বিষয়ক ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবতারণা করার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সমাজ বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন গবেষক মহল বর্তমানকালে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁরা দলিত আন্দোলনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির একটি সারসংক্ষেপ নিচে বর্ণনা করা হল –

William Wilson Hunter (1840-1900) তাঁর *A statistical account of Bengal, 20 Volume,*[১] (London, Trubner & Co,1875-77), reprint edn, (New Delhi, Concept Publishing Company, 1984) এই গ্রন্থে বাংলার সার্বিক বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, নদ নদী ইত্যাদি

সম্পর্কে। তিনি বাংলার জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবকিছুর উপরে তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বাংলার নিম্নবর্ণীয় রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি, মালো, কৈবর্ত, পাটনি, ধোবা প্রভৃতি জাতিগুলির সামাজিক পরিচিতি বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

নির্মল কুমার বসু রচিত *হিন্দু সমাজের গড়ন* [২] (শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৪৮) গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি ১৯৩১ সালের জনগননার ভিত্তিতে বাংলার জাতিসমূহের সাক্ষরতার হার, তাদের জীবিকা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থে ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে রচিত হয়নি।

বিশিষ্ট লেখক Nripendra Kumar Dutta তাঁর *Origin and Growth of caste in India*[৩] (Calcutta, Firma KLM Pvt Ltd, 1969), গ্রন্থটিতে তিনি ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তি বিভিন্ন বর্ণ গোষ্ঠীর সমাজ সংগঠন তাদের জীবিকা ও সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন। এছাড়া ভারতীয় জাত ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এবং সমস্ত হিন্দু সমাজের আইন সমূহে ওই ‘জাতি বর্ণপ্রথার’ প্রভাব কি ছিল সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন।

হিতেশ রঞ্জন সান্যাল রচিত *Social Mobility in Bengal*[৪] (Calcutta. Papyrus, 1981) গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে তিনি বাংলার জাত ব্যবস্থার উদ্ভব, জাতি পরিচিতি এবং তাদের প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ তথ্যবহুল ব্যাখ্যা করেছেন। তবে নিম্নবর্ণীয় তপশিলি জাতিদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার বিষয়ে তিনি কোন মতামত ব্যক্ত করেননি।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বর্ণ ও রাষ্ট্র* [৫] সুজিত সেন (সম্পা), জাতপাতের রাজনীতি, (কলকাতা,পুস্তক বিপণি,১৯৮৯) নামক প্রবন্ধে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে জাত ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে বিভিন্ন জনপদে ব্রাহ্মণদের যে আধিপত্য ছিল তা তথ্যের সাহায্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে সপ্তম শতকের পরে রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। যেমন পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরো লিখেছেন প্রাচীন বাংলাতে অধিকাংশ ব্যক্তি নিজেদের বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করতেন। তবে কিছু ব্যতিক্রমী যারা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করত।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় *জাত জাতি জাতীয়তা* [৬] সুজিত সেন (সম্পা), জাতপাতের রাজনীতি, (কলকাতা,পুস্তক বিপণি,১৯৮৯) নামক প্রবন্ধটি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। যেমন এম এন শ্রীনিবাসনের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটি কতটা যুক্তিযুক্ত? যে সমাজে জাত ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকে প্রথিত সেখানে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সম্পর্কে তিনি উপনিবেশিক ভাব ধারাই প্রভাবিত ঐতিহাসিকদের মতবাদটিও তুলে ধরেছেন। উপনিবেশিক শাসনের অবসান কল্পে ভারতীয়রা আধুনিক হতে পেরেছে কি? উত্তর না। তার মতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে ভারতেও উচ্চবর্ণ এবং নিম্নের বর্ণের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। এই প্রবন্ধেও কোনো একটি জাতি বা একক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচিত হয়নি।

অধ্যাপক শেখর বন্দোপাধ্যায় তাঁর *Caste Politics and the Raj : Bengal 1872*-1937[৭] (Kolkata, K.P. Bagchi & Company, 1990), বইটিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলার নীচু জাতিদের ভূমিকা কেমন ছিল তা তিনি আলোচনা করেছেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বিষয়গুলিতে তাদের দাবীগুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়নি সে সম্পর্কেও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

এছাড়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *Caste Protest and Identity in Colonial Bengal : The NamaSudras of Bengal 1872 – 1947* [৮] (Surrey Carzon Press, 1997) গ্রন্থটিতে বাংলার নম:শূদ্রদের জাতি পরিচিতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। হিন্দু সমাজের তথাকথিত নীচু জাতিরা আন্দোলনের মাধ্যমে কিভাবে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল তার বিশেষ আলোচনা করেছেন। এছাড়া তৎকালীন পূর্ব বাংলার যে সম্প্রদায় স্বাধীনতার আগে চন্ডাল নামে পরিচিত ছিল স্বাধীনতার পরে তারা বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে কিভাবে নমঃশূদ্র পরিচিতি পায় তার বিবরণকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আধুনিক ভারতের নমঃশূদ্রদের নেতা মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই।

তাঁর অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *Caste Culture and Hegemoni : Social Domination in Colonial Bengal*[৯] (New Delhi, Sage Publication, 2004) এখানে তিনি এক ব্যতিক্রমী সামাজিক উন্নয়নের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া ঔপনিবেশিক বাংলার জাত ব্যবস্থার জাতি সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক পর্বে হিন্দুদের নিম্নবর্ণের

বাঙালিরা সমাজে কিভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তাও আলোচনা করেছেন। এই সময় থেকে জাতি এবং ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। এই গ্রন্থে বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে তথাকথিত নীচু জাতিদের এক সমমাত্রিক ধর্মীয় লড়াইয়ের বিবরণ আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে কোনো দলিত নেতা বা দলিত মনীষা সম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইনি।

বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী তাঁর *পতিত: ভারতের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান*[১০] (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১) গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় কিভাবে ওই জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল তা বিশেষ দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। এক কথায় দলিত আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন বিশেষ দলিত জাতি যেমন রাজবংশী, নমঃশূদ্র, কোচ, কৈবর্ত্য, পৌণ্ড্র, মালো প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচিত হয়নি।

খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক লিখিত *সংরক্ষণ ও জাতপাত*[১১] (কলকাতা, সঞ্চয়ন প্রকাশনী,২০০২) বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এখানে ভারতীয় সমাজে ধর্মের প্রভাব, চতুর্বর্ণ প্রথার উদ্ভব ,বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি প্রভৃতির সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এছাড়া ভারতীয় মনীষীদের দ্বারা সমাজ সংস্কারের বিষয়েও আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী অনগ্রসর শ্রেণী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে সমস্ত কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে

সম্পর্কেও তথ্যবহুল বিশ্লেষণকে স্থান দিয়েছেন। ভারতে বিভিন্ন দলিত জাতিগুলি সম্পর্কেও পরিচয় প্রদান করেছেন।

অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী তাঁর *মানবাধিকার ও দলিত* [১২] (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৪) বইটি ও তথ্যনিষ্ঠ দলিতদের অধিকারের প্রশ্নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা কি সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রধানত দলিত শ্রমজীবী শিশু ও দলিত নারীদের মানবাধিকার প্রতিনিয়ত কিভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে তা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। এবং তাদের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এখানে দলিত আন্দোলন এবং দলিত নেতাদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

অধ্যাপক গোপাল গুরু সম্পাদিত *Humiliation claims and Context*[১৩] (New Delhi, Oxford University Press,110002) গ্রন্থটিতে বিভিন্ন লেখক দলিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি বিভিন্ন ভাবে যেসব অবমাননাকর ব্যবহার, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে অন্যায় অপমানজনক ঘটনা ঘটে থাকে সেগুলিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে কোন দলিত আন্দোলন বা কোন বিশেষ দলিত জাতি নিয়ে আলোচনাকে স্থান দেওয়া হয়নি।

বর্তমানে দলিত প্রতর্ক (Dalit Discourse) বিষয়ে অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মন বেশকিছু গ্রন্থ সমূহের অবতারণা করে চলেছেন। যেমন তাঁর *Caste Identity formation: Mobility and Elite leadership In B. K. Saha (e. d) Wealth and Welfare*[১৪] (Kolkata, Academic Enterprise, 2005) বইটিতে জাতি গঠন

পরিচিতি এবং সচলায়ন সম্পর্কে প্রধানত উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিবরণকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য দলিত জাতিদের আন্দোলন সম্পর্কে কিছুই আলোচিত হয়নি।

অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *Partition of India and Its Impact on the Schedule Caste of Bengal*[১৫] (New Delhi, AbhijIt Publication, 2012) এখানে জাতপাত প্রথার উৎপত্তি, বাংলার দলিত জাতি সমূহের পরিচিতি এবং ভারত ভাগের ফলে বাংলার তপশিলি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। অথচ দলিত বলতে বর্তমান সময়ে তপশিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর জাতি সমূহকেও বোঝায়। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আলোচনা উপেক্ষিত রয়েছে।

অধ্যাপক মনোশান্ত বিশ্বাস *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি* [১৬] (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬) একটি গবেষণামূলক গ্রন্থের অবতারনা করেছেন। এখানে দলিত জাতি গুলির মধ্যে অন্যতম হলো নমঃশূদ্র বা মতুয়া। শিক্ষা বিস্তার মূলক আন্দোলন, সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে স্থান দিয়েছেন। এই গ্রন্থে শ্রীবিশ্বাস মতুয়া ব্যতীত অন্য কোন দলিত জাতি সম্পর্কে আলোচনা করেননি। বা কোন ব্যক্তির আন্দোলনকে তুলে ধরেননি। তবে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করছেন।

অধ্যাপক শ্রী বর্মন তাঁর *জাতি- রাজনীতি জাত পাত ও দলিত প্রতর্ক* [১৭] (কলকাতা, আলফাবেট বুক, ২০১৯) গ্রন্থটিও বর্তমানে বহুল আলোচিত। এখানে জাত

ও জাতপাতের ইতিহাস চর্চার বিবরণকে সূক্ষ্মভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং জাতপাত ও জাতি হিংসা কিভাবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে কলুষিত করে চলেছে তার একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা। ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলার জাতি ও জাতপাতের রাজনৈতিক বিবরণকে তুলে ধরা হয়েছে। এবং ডান-বাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে বাংলার দলিত জাতিগুলিকে তাদের দলীয় ঝান্ডা বাহকে পরিণত করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতি হিংসা বা দলিত আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা নেই।

এছাড়া সুজিত সেন সম্পাদিত *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ* [১৮] (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১৩) গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের বহু লেখক রাজনীতিবিদ কবি ও অধ্যাপক মন্ডলী তাঁরা তাঁদের প্রবন্ধ গুলিতে ভারতের দলিত আন্দোলন এবং দলিত মুক্তির ভাবনাকে নানান আঙ্গিকে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের সমস্যার বিষয়গুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। দরিদ্র বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার বিবরণকেও তুলে ধরেছেন। এখানে কোনো নির্দিষ্ট দলিত জাতি বা কোনো উল্লেখযোগ্য দলিত নেতার জীবনি আলোচনা করা হয়নি।

এবং অধ্যাপক সুজিত সেন সম্পাদিত অপর একটি বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *জাতপাত ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট* [১৯] (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০০৮) এখানে ভারতের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী দলিতদের সংরক্ষণের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এবং সংরক্ষণ নিয়ে স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরপূর্ব যে বিতর্ক রয়েছে সেই বিতর্ক সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়বস্তুকে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য

গ্রন্থে দলিত সংরক্ষন নিয়ে আলোচনা দলিত আন্দোলন বা দলিত মণীষা সম্পর্কে আলোচনার স্পর্শমাত্র নেই।

অধ্যাপক ড. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *প্রান্তিক নিম্নবর্গ দলিত: পরিভাষার অন্তরে* [২০] শিরোনামে প্রবন্ধটি দলিতদের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রবন্ধে প্রান্তিক, নিম্নবর্গ ও দলিত শব্দগুলির সূক্ষাতি সূক্ষ অর্থকে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং ঐ সমস্থ শব্দের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে আলোচনা করেছেন। প্রান্তিক, নিম্নবর্গ ও দলিত প্রভৃতি শব্দগুলির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের বাস্তব রূপকে স্থান দিয়েছেন। নিম্নবর্গ ও দলিত এই শব্দ দুটি ইতিহাসে আধুনিক রুপে প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭০-১৯৮০ দশক থেকে। এছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু হল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রান্তিক শব্দের ব্যবহার। তাঁর মতে শুধু বর্তমান বাংলা সাহিত্যেই নয়, চর্যাপদের যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

গবেষক মৌসুমী নাথ এর *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত: দেবেশ রায়ের নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপায়ন*[২১] নামক প্রবন্ধটিতে নদী মাতৃক সমাজ সভ্যতা ও নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানব সমাজকে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রান্তিক নিম্নবর্গের মানুষদের মানুষ বলেই গন্য করা হয়না। তাদের কোন নাম নেই, গ্রাম নেই, দেশ নেই বলেই প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিস্তা নদীতে আধুনিকতার ও কৃত্রিমতার ছোঁয়া দিয়ে ব্যারেজ নির্মাণের নামে এক শ্রেণীর মানুষ নিম্নবর্গীয়দেরকে শোষণ করে চলেছে।

এই প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসন ও শোষনকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেখানে শোষিত মানুষের ৭৫% হচ্ছে প্রান্তিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধি।

বর্তমানে দলিত বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড.রূপকুমার বর্মণ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতি মধ্যে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। ড.বর্মণ তাঁর *বাঙালী নিম্নবর্ণ মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম: সমাজ ও সাহিত্যের তুলনাত্মক বিশ্লেষণ*[২২] নামাঙ্কিত প্রবন্ধে বাংলার নিম্নবর্ণীয়রা যে কথা বলতে পারে লিখতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্ণীয় দলিতদের বহুমুখী অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। যেমন ১) উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যিকরা তাদের লেখাতে দলিতদের অপমান জনক পরিচিতি দিয়েছেন। ২) অ-দলিতরা আবার দলিতদের প্রতি সম্মান প্রদান করে কলম ধরেছেন। ৩) দলিতরা নিজেরা তাদের কথা নিজেদের মতো করে লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আত্মকথা ইত্যাদিতে। এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয় অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে মালো জাতির যে আর্থিক দারিদ্রের বর্ণনা দিয়েছেন সে কথাকে ব্যক্ত করেছেন। ঔপনিবেশিক পর্বে অবিভক্ত বাংলার মালো জাতির জাতি স্বত্তার বিকাশকেও আলোচনায় স্থান দিয়েছেন।

বর্তমান গবেষণা পত্রটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেসমস্ত তথ্য ও সাহিত্যিক সমীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল ড.জীবন কুমার সরকার এর *উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনে নমঃশূদ্রদের ভূমিকা*[২৩] নামক প্রবন্ধটি। এখানে নমঃশূদ্রদের কতগুলো সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসকে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন তাদের

মতূয়া ধর্মের প্রবর্তন, চন্ডালত্ব দূরীকরন ও শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে বর্ণনা করা হয়েছে। নমঃশূদ্র সমাজের প্রানপুরুষ হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের সামাজিক অধিকার গুলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে কিভাবে একত্রিত করেছিল তার বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে নমঃশূদ্ররা যে অধিক প্রতিবাদী এবং সংঘবদ্ধ জাতি সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ড.কৃষ্ণকুমার সরকার রচিত *পোদ থেকে পৌণ্ড্র: বাংলার পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক আলোচনা*[২৪] প্রবন্ধটিতে বাংলার চতুর্থ বৃহত্তম তপশিলি জাতি পৌণ্ড্রদের সংক্ষিপ্ত জাতি পরিচিতিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের মহান ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে তাদের পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় পরিচিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করেছেন। সেই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিশদ বিবরণ রয়েছে এই প্রবন্ধে। যদিও পৌণ্ড্ররা প্রধানত অঞ্চল বিশেষে একাধিক নামে পরিচিত ছিল। যেমন উত্তরবঙ্গে পুড়ো এবং দক্ষিনবঙ্গে পোদ ইত্যাদি।

এছাড়া ড.অরুন কুমার বাড়ৈ তাঁর *শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরঃ প্রসঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক আন্দোলন*[২৫] প্রবন্ধে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলার কৃষকদের আর্থিক দৈন্যতার অবস্থা তুলে ধরেছেন। কৃষকরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন মুখী হয়ে উঠত। ঐ সময় কৃষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নমঃশুদ্র বা মতূয়াদের হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তনিকা সরকার সম্পাদিত *Caste in Bengal : Histories of Hierarchy Exclusion and* Resistance[২৬] (Permanent Black,

2022) গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, মনোশান্ত বিশ্বাস, মেরুনা মুর্মু প্রমুখদের বিখ্যাত প্রবন্ধ গুলি প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মোট ১৯ টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আলোচিত প্রবন্ধ গুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত ঔপনিবেশিক শাসকদের আগমনের ফলে জাত ব্যবস্থায় পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ জাতি সম্পর্কিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা। তৃতীয়ত জাতি শ্রেণি ও শ্রমের আন্ত:সম্পর্ক। এবং দেশভাগের পরবর্তী সময়ে জাতিপ্রথা ও জাতি কেন্দ্রিক রাজনীতির স্বরূপ। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল এখানে নিম্ন জাতি গোষ্ঠীর উপরে উঠার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং তার সাথে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় বর্ণ হিন্দুদের জাত সম্পর্কে চিন্তা চেতনা বিশ্লেষণ করেছেন। তনিকা সরকার তার প্রবন্ধে বলেন যে কোল, ডোম, হাঁড়ির মতো জাতিগুলি মেথর জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলেন। দ্বৈপায়ন সেন তার প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন যে উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলি যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে সর্বদাই ব্রাত্য করে রেখেছিলেন। কারণ দলিত রাজনীতিকে প্রতিরোধ করার জন্য।

অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ অতিসম্প্রতি একটি গ্রন্থের অবতারনা করেছেন। *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ*[২৭] (গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২) গ্রন্থটি তথ্য ও তত্ত্বমুলক এবং বিশেষ যুক্তি গ্রাহ্য। ভারতে যেমন জাতপাত সমস্যা অদ্যাবধি প্রকট তেমনি ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বর্তমানে জাতি

হিংসা,ধর্মীয় হিংসা, রাজনৈতিক, সামাজিক বৈশম্যও এখনো সক্রিয় রয়েছে তা তিনি তথ্যের সাহায্যে আলোচনা করেছেন। বিবিধ হিংসার কারনে বাংলার তপশিলি সমাজ সংকট জনক অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বাংলার তপশিলি সমাজ কিভাবে ব্যবহারকারী রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে সে বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন।

দার্শনিক, কবি শ্রী অনন্ত কুমার ব্রহ্ম রচিত *'বাঙালী জাতির উৎস সন্ধানে'*[২৮] (কলকাতা, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, ২০১০) গ্রন্থটি বাঙালী দলিত জাতি সম্পর্কে আকর গ্রন্থ রূপে সমাদৃত। বাংলাতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এবং বাঙালীর বিভিন্ন লৌকিক ক্রিয়া কর্মে বাংলা ভাষা ব্রাত্য কেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের (কৈর্বত্য, রজক, চাষা, ধোবা, শুড়ী, স্বর্নকার, গন্ধবনিক, সদগোপ, নাপিত, রাজবংশী, পৌণ্ড, বাগদি ইত্যাদি) পরিচিতি তথা উৎপত্তির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে। সর্বোপরি শ্রীব্রহ্ম বাংলার দলিত বহুজন সমাজের ইতিহাস এবং তাদের অধিকার ও আত্মচেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

অধ্যাপিকা যুথিকা বর্মার *জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি উপেন্দ্রনাথ বর্মণ(১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন* উত্তরবঙ্গ[২৯] (কলকাতা, সোপান, ২০২১) গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যদিও গ্রন্থটিকে আত্মচরিত মূলক গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এখানে রাজবংশী সম্প্রদায়ের তথা দলিত প্রতিনিধি হিসাবে, ভারতের জাতীয় রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ কিভাবে অবাধ বিচরন করেছেন সেই

ইতিহাস বিবৃত আছে। উক্ত গ্রন্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে কেবল মাত্র রাজবংশীদের দলিত মণীষা উপেন্দ্রনাথ বর্মণ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। অন্যান্য দলিত মণীষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুজিত সেন সম্পাদিত *জাতপাতের রাজনীতি* [৩০] (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯) বিষয়ক গ্রন্থটি বিশেষ আলোচিত ও সমালোচিত। অধ্যাপক সেন তাঁর সংকলনটিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতপাতের প্রভাব এবং দ্বিতীয় অংশে জাতপাতের প্রধান প্রধান সমস্যাকে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের উপরে প্রথমে ব্রাহ্মনদের প্রভাব বেশি ছিল। ক্রমে কায়স্ত, বৈশ্যদের প্রভাব কার্যকরী ছিল। কিন্ত এক সময় কোন বর্ণের প্রভাব রাষ্ট্রের উপরে ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন। জাতপাত জনিত বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। এছাড়া জাতিভেদ ও বর্ণ ব্যবস্থা ভারতের সমাজকে আচ্ছন্ন করেরেখেছে বলে অভিহিত করেছেন। জাতপাত ব্যবস্থা নির্মূল করার জন্য কি ধরনের আন্দোলন প্রয়োজন তার বর্ণনাও রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

চিহান্না রাও জাগতি রচিত *Dalit Studies A Bibliographical* Handbook[৩১] (New Delhi, Kanishka Publishers Distributors, 2003) গ্রন্থটি দলিত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ। বইটিতে ভারতবর্ষের দলিত সম্পর্কে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এছাড়া দলিত সম্পর্কিত গবেষণা মূলক গ্রন্থের তালিকাও লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

দলিত বিষয়ে M.Phil এবং Ph.D গবেষণাপত্রের নাম, সাল তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ আছে। কিন্তু দলিত আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো আলোচনা নেই।

ইতিহাস চর্চার ধারা এবং ধারণা প্রবহমান। তাই ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় নবতম সংযোজন নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস চর্চা। ১৯৮২ সালে *'Subaltern Studies'* এর প্রথম প্রকাশ। ঐ সময় থেকেই নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *নিম্নবর্গের* ইতিহাস[৩২] (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮) গ্রন্থটিতে ভারতীয় নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস সমৃদ্ধ। ১৯৮০ সালের আগে পর্যন্ত ভারতে উচ্চবর্গ তথা উচ্চবর্ণীয়দের ইতিহাস বেশি মাত্রায় আলোচিত হয়েছে। কিন্ত আশির দশকের পর থেকে বিভিন্ন আন্দোলনে নিম্নবর্গীয় প্রভাব আলোচনা করা হচ্ছে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পর্বের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয়দের যে বিবিধ আন্দোলন তার স্বরূপকে আলোচনা করা হয়েছে।

ডাঃ জি এস বৈদ্য তাঁর *বাঙালি উদ্বাস্তু মতুয়া ও অন্যান্য নমঃশূদ্রদের বর্তমান শিক্ষা ও অর্থনৈতিক* অবস্থা[৩৩] *'সোজাকথা নমজাতি সংখ্যা',* হরষিত সরকার, সম্পা (উত্তর ২৪ পরগনা, প্রকাশক সোজাকথা, ২০১৯) নামক প্রবন্ধে অবিভক্ত বাংলার নমঃশূদ্রদের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে পূর্ববঙ্গ ছিল নমঃশূদ্রদের আদিবাসভূমি। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে নমঃশূদ্রদের অধিকাংশই উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়ে ভারতবর্ষে অভিবাসন করেন। এবং এখানে তাদের অবস্থা করুন ও অবর্ণনীয়। এরা প্রধানত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন যদিও এদের নিজস্ব জমির পরিমাণ নেই বললেই চলে। আর্থিক দিক থেকে একেবারে

পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। তবে বর্তমানে তারা নিজেদের অধিকার কে প্রতিষ্ঠিত করতে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগ্রাম করছে। বর্তমান প্রজন্মের নমঃশূদ্ররা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষিত করতে চাইলেও রয়েছে প্রবল আর্থিক বাধা। ওই সমস্ত বাধা যাতে অতিক্রম করা যায় তার জন্য সরকারি বিবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা মতুয়া নমঃশূদ্রদের এবং বাংলাদেশের নমঃশূদ্রদের আর্থিক সামাজিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী রচিত *'Caste and Partition in Bengal: the story of Dalit refugees, 1946-1961'* [৩৪] (Great Clarendon Street, Oxford, OX26DP, United Kingdom, Oxford University Press, 2022) গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি বর্তমানে বহুল আলোচিত দলিত উদ্বাস্তুদের কাহিনী ব্যাখ্যা করেছেন। দেশভাগ পরবর্তী কালে পশ্চিমবাংলায় ' জাতিকে' এক বিশ্লেষণাতক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান বিষয়বস্তু হল দলিত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের অন্য অঙ্গরাজ্যে অভিবাসন ও পুনর্বাসনের ইতিহাসকে বর্ণনা করা হয়েছে। লেখকদ্বয় আলোচ্য গ্রন্থটিকে ভূমিকা ও উপসংহার নিয়ে মোট পাঁচটি পরিচ্ছদে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে লেখকরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে বাংলায় বিভাজিত রাজনীতির ফলে দলিত আন্দোলনের মূলধারা হারিয়ে গিয়েছে। গ্রন্থটির সূচনায় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সম্পর্কে পূর্ব রচিত গ্রন্থ গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচিত হয়েছে। এছাড়া দলিত আন্দোলনের নেতা হিসাবে এই গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর এর প্রভাবকেও সামান্য আলোচিত হয়েছে।

তাদের মতে ১৯৫০ সালের দিল্লি চুক্তি ব্যর্থ হয়েছি। কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর ধারণা ছিল যে অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হলে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বহুলাংশে বন্ধ করা যাবে। বাস্তুহারা সভা সমিতি গুলো সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত দলিত উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, ২৪ পরগনা ইত্যাদি জেলায় বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তাদের সেই প্রচেষ্টাকেও তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫০ সালের পরবর্তীকালে আগত দলিত উদ্বাস্তুদের বহির বাংলায় যেমন বিহার, আন্দামান এবং দণ্ডকারনে নিয়ে রাখার কারণ কি ছিল ভারতবর্ষের সে সম্পর্কেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এক কথায় আলোচ্য গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে জাতি এবং বিভাজনের অধ্যায় কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ১৯৭৮-১৯৭৯ সালের মরিচঝাঁপির গণহত্যার বিষয়েও আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে।কিন্তু এইগ্রন্থে পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণের জনক মহাত্মা রাইচরণ সরদার সম্পর্কে কোন আলোচনার স্থান নেই।

নমঃশূদ্র সমাজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক এবং বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণেতা কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর সম্পাদিত *‘বাংলার নমঃশূদ্র প্রথম খন্ড’* [৩৫] (কলকাতা, কে এন টি এ এ, ২০২২) বইটিও দলিত ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু হল প্রাচীন ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঘৃণা হিংসা এবং বিদ্বেষ পরায়ন মনোভাব গড়ে তুলছে। ভারতীয় সমাজের বেশিরভাগ মানুষ নিম্নবর্গীয়, নিম্নবর্ণীয় তারা ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। অথচ তাদের

সেই শ্রম সম্পর্কিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে দূরে রেখে অস্পৃশ্য দলিত হিসাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। ওই জাতিভেদ প্রথার গভীরতা দলিতদের কি যথেষ্ট সংগ্রাম করে সামাজিক রাজনৈতিক দার্শনিক পাহাড় প্রমাণ বাধা সমূহ কে দূর করে যোগ্যতা অর্জনকরে চলেছে। আর এই বাধা সমূহ দূর করার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকাই অবতীর্ণ হয়েছিলেন নমঃশূদ্র সমাজের শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭)। এবং এদের প্রচলিত মতাদর্শ পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলায় মতুয়া সম্প্রদায় হিসাবে বিস্তার লাভ করেছে। তাদের সেই ধর্মীয় আন্দোলন পরবর্তীকালে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এর মত রাজনীতিবিদ। যা বাংলার দলিত আন্দোলনকে যেমন সক্রিয় করেছে। তেমনি পরবর্তীকালে বাংলা দলিত সাহিত্য আন্দোলনকেও সক্রিয় করে তুলেছে। মতুয়াদের আন্দোলন তাদের সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যেমন শিক্ষা এবং চাকরিতে সংরক্ষণ, রাজনীতিতে যোগদান সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই বাংলার দলিত জাতি গুলির মধ্যে নমঃশূদ্ররা ছিলেন অগ্রগণ্য। তাদের এই অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২০১৭ সালে কলকাতায় নমঃশূদ্র ইতিহাস কংগ্রেস তৈরি করেছিল। সেখানে আলোচিত হয়েছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের জন্য গবেষণামূলক এবং তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব আমাদের বহন করতে হবে। তারই ফলস্বরূপ কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের বাংলার নমঃশূদ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্যগ্রন্থে মোট বারো টি প্রবন্ধ একটি পরিশিষ্ট এবং সামান্য কিছু চিত্র রয়েছে। নমঃশূদ্রদের ইতিহাস রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নমঃশূদ্রদের যে অবদান এবং দলিত চেতনার বিকাশ ও আন্দোলনে এই গ্রন্থটির অবদান অতুলনীয়।

অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামানিকের সম্পাদিত *‘দলিত* সাহিত্যচর্চা’[৩৬] (কলকাতা, গাংচিল, ২০২৩) রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী গবেষণা মূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। যেমন দলিত বলতে কাদের বোঝায়? এবং দলিত সাহিত্য কাকে বলা হয়? লেখকগণের প্রধান অভিমত হল ‘বাংলা এবং বাঙালির’ সাহিত্য, শিক্ষা। সংস্কৃতির মধ্যে জাতপাতের এক অন্যান্য(otheraisation) ধারণা রয়েছে। এই অপরায়ন বলতে শুধু কি কেবল হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ, দলিত নারী, মুসলমান এবং নিঃস্ব কৃষক রয়েছে? এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের মধ্যেই তিনি দলিত বলতে কাদের বোঝায় তার উত্তর দিয়েছেন। এই গ্রন্থে দলিত শব্দের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত দলিত বলতে বিশেষ্য অর্থে অতিশূদ্র অথবা ভারতীয় তপশিলি জাতির মানুষদেরকে বলা হয়েছে। সংগ্রামকারী মানুষজন। এখানে তাদেরকেই দলিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা জন্মের জন্য সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সার্বিক বিষয় থেকে বঞ্চিত।

এছাড়া এই গ্রন্থে দলিত সাহিত্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্পাদকের নিজস্ব মতে দলিত সাহিত্যের ও দলিত পঠন পাঠনের একটি নিজস্ব পরিসর রয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে দেশভাগজনিত ছিন্নমূল মানুষজন কিভাবে অভিশাপের শিকার হতে হয়েছিল তা বর্ণিত হয়েছে। এবং দলিত মহিলা সাহিত্যিক হয়েও লেখা যায় সে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিদ্রোহের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কৈবর্ত বিদ্রোহ, চুয়াড় ও সাঁওতাল বিদ্রোহ, চাকমা ও গারো বিদ্রোহ, মতুয়া আন্দোলন বা পৌন্ড্র জাতি

আন্দোলনের মতো জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে নমঃশূদ্রদের হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর বা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এছাড়া পৌন্ড্র সমাজের রাইচরণ সরদারের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনার কোন স্থান নেই।

উপরি লিখিত সংক্ষিপ্ত সাহিত্য সমীক্ষা মূলক আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দলিত বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ্ গুলি রচিত হয়েছে সেখানে দলিত আন্দোলনে প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন জাতিভিত্তিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও দলিত বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা বা মহাত্মা রাইচরণ সরদার যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নেই। উক্ত সংকীর্ণতার কথা মাথায় রেখেই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও আলোচনার প্রেক্ষিত উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হিসেবে সমাজের সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়গুলি ও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ফলে গবেষণার পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাপ্রদেশে বহু সংখ্যক দলিত সম্প্রদায়ের বসবাস তাদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের জীবন কাহিনীসহ তাদের সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কি অবদান সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোকপাত করা হবে বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of Research)

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলার দলিত চেতনার ইতিহাস পর্যালোচনা করা। প্রধানত বাংলার তিনটি নিম্ন বর্ণের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের রাইচরণ সরদার (১৮৭৬-১৯৪২), নমঃশূদ্রদের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (১৯০৪-১৯৬৮) এবং মালো সমাজের অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে উক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের সমাজ চেতনার বিকাশ, সমাজ সংগঠন ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যাবে। এবং তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অবদানে সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি এবং আধুনিক চিন্তা ও চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্প (Research Project)

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্থ বর্ণের শূদ্র জাতির মানুষেরা ১৯৩৬ সাল থেকে তপশিলি জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। আম্বেদকরের পরিভাষায় তারা পরবর্তীকালে দলিত হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। বর্তমান গবেষণা পত্রটি বাংলার অসংখ্য দলিত জাতির মধ্য থেকে তিনটি জাতির তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন পৌন্ড্র সমাজের মহাত্মা রাইচরণ সরদার, নমঃশূদ্রদের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এবং মালোদের অদ্বৈত মল্লবর্মণ। রাইচরণ সরদারের সময় পৌন্ড্ররা অনেকটাই জাগরিত হয়েছিল যেমন তার সাহায্যে ক্ষত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা, উপবিত ধারণ তার সমাজের কিছু মানুষ করেছিল। কিন্তু আবার শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে ছিল। বিশ শতকের

সাতের আটের দশক থেকে পৌন্ড্ররা শিক্ষা লাভ করে আর্থিকভাবে কিছুটা সচল হতে পেরেছেন। ওই শিক্ষা বিস্তারের আলো রাইচরণ বহু পূর্বেই সূচনা করেছিলেন তার সমাজের জন্য।

অপরদিকে নমঃশূদ্র সমাজের জাগরণ ও বিকাশে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান অপরিসীম। কিন্তু তাদের পরবর্তীকালে যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। তিনিও নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সরকারি চাকরির ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি, বিনা অর্থে আইনি সহায়তা প্রভৃতি কাজ করেছেন। তাসত্ত্বেও উচ্চবৃত্তের দল কংগ্রেস যোগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র সমাজের মানুষকেই লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণীয় নমঃশূদ্র সমাজের মানুষজন যোগেন্দ্রনাথের কর্মপন্থাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারলেন না। ফলে প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার কয়েক দশক নমঃশূদ্ররা অনেকাংশে সার্বিকভাবে পিছিয়ে ছিল। এরাও নিজেদেরকে পরবর্তীকালে শিক্ষা, চাকুরী, সমাজ, রাজনীতি, এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এছাড়া মালো সম্প্রদায়ের অদ্বৈত মল্লবর্মন ছিলেন একজন সাহিত্যিক। তিনি নিজে নিম্নবর্ণীয় সমাজের জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জাত ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন। এছাড়া সমাজের অন্যান্য মানুষজন কিভাবে জাত ব্যবস্থার দ্বারা সমাজে শাসিত, লাঞ্ছিত হতেন সেগুলিকে সমাজের দর্পণ সাহিত্যের মাধ্যমে বিবৃত করেছেন।

গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন (Research Questions)

কোন বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে গেলে এবং সেই সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল সেই বিষয় সম্বন্ধে অনুধাবন করা। গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল সঠিক পদ্ধতি ও প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যকে উপস্থাপন করা। তাই বর্তমান গবেষণার বিষয়টি বিশদে অধ্যয়ন ও অনুধাবনের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন –

১) দলিত বলতে কি বোঝায়? এবং বাংলায় দলিত কারা?

২) বাংলার দলিত সমাজের চেতনা, সংস্কার উন্নয়ন ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য অগ্রদূত হিসাবে কোন কোন ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন?

৩) পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের আত্মজাগরণে মহাত্মা রাইচরণ সরদারের ভূমিকা কতখানি? তিনি পৌণ্ড্রদের শূদ্রত্ব মোচন করে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল কি?

৪) বাংলার নমঃশূদ্র সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনা ও সামগ্রিক অধিকার বিকাশ আন্দোলনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল কি অবদান রেখেছিলেন? বঙ্গভঙ্গের জন্য যোগেন্দ্রনাথ কি দায়ী ছিলেন?

৫) অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা সমূহে তৎকালীন মালো ও ঝালোমালো সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও করুন সমাজ চিত্র কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে?

গবেষণার উপাদান (Sources of Research)

গবেষণার ক্ষেত্রে উপাদান বা উপকরণ সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। যেকোনো বিষয়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তার উপাদান গুলির সাহায্যে আমাদের ইতিহাস চেতনা ও গবেষণা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য বা উপাদানগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা প্রাথমিক উপাদান(Primary Sources) এবং গৌণ বা সহায়ক উপাদান(Secondary Sources)। এছাড়াও বর্তমান উত্তর আধুনিক যুগে অসংখ্য বৈদ্যুতিন মাধ্যম গবেষণা পদ্ধতিকে অনেকটাই সহজ সাপেক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে। যাকে ইংরেজিতে Webliography বলা হয়। বর্তমানে এই Webliography উপাদান থেকেও আমরা গবেষণা সংক্রান্ত বহু তথ্য আরোহন করতে পেরেছি।

বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের প্রাথমিক উপাদান (Primary Sources) সমূহ হল নিম্নরূপ। ব্যক্তিবর্গের ডাইরি, চিঠিপত্র, সেই সময়ের Census Report, Government Record, সংবাদপত্র, সাক্ষাৎকার(Interview), তাদের আত্মচরিত, কথোপকথন, স্মৃতিচারণ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি যথপোযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা কর্মের গৌণ বা সহায়ক (Secondary Sources) উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লিখিত, সম্পাদিত, মুদ্রিত, নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ, সাময়িক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি। এছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জাতপাত ভিত্তিক রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এই

গৌণ উপাদান গুলি বর্তমান গবেষণা পত্রকে পূর্ণতা দান করতে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ বা তথ্য উপস্থাপনার পাশাপাশি তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) হল যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বর্তমান গবেষণা পত্রটি রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল। যেমন ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method), গুণগত পদ্ধতি (Qualitative method) এবং তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method)। ঐতিহাসিক পদ্ধতি হল সমাজে পূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন রকম ইতিহাস থেকে যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। পূর্বের সেই ঘটনা বা আন্দোলন সম্পর্কে বর্তমান ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কেমন সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। যেমন উনবিংশ শতাব্দী থেকে সংগঠিত দলিত আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সহায়ক উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লিখিত, সম্পাদিত, মুদ্রিত, নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ, সাময়িক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি। এছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জাতপাত ভিত্তিক রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এবং তথ্য গুলোকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাপত্রটি রচনার ক্ষেত্রে অপর যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়েছে সেটি হল গুণগত পদ্ধতি (Qualitative method)। যে গবেষণার দ্বারা কোন ব্যক্তি

বা বস্তুর মনোভাব (Attitude), চরিত্র (Behavior), ধারণা (Believe system) প্রভৃতি পর্যবেক্ষন (Observe) বা বিশ্লেষণ (Analysis) করা হয় সেই গবেষণাকে গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) বলা হয়। বর্তমান গবেষণা পত্রে তিনজন দলিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রাথমিক এবং সহায়ক উপাদান পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে উক্ত ব্যক্তিদের মনোভাব (Attitude), চরিত্র (Behavior), ধারণা (Believe system) এবং তাদের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। যে সমস্ত প্রাথমিক এবং সহায়ক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলির সত্যতা যাচাই করার জন্য অনেক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এবং তারপর ঐ সমস্ত তথ্য গুলো পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় অন্যতম গবেষণা পদ্ধতি হল তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method)। আলোচ্য গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method) গ্রহণ করা হয়েছে। যে গবেষণা পদ্ধতিতে প্রধানত দুই বা ততোধিক বস্তু, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় তুলনামূলক পদ্ধতি। সাধারণত একই শ্রেণীতে অবস্থানকারী যে কোন বিষয়ের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা হয়। ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান গবেষণা পত্রেও দলিত সম্প্রদায়ের তিনজন ব্যক্তির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে আমরা দেখছি পৌন্ড্র সমাজের রাইচরণ সরদার, নমঃশূদ্র সমাজের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এবং মালো সমাজের অদ্বৈত মল্লবর্মণ এরা

তিনজনেই দলিত সম্প্রদায় ভুক্ত। উক্ত তিনজন ব্যক্তি বাংলার দলিত আন্দোলন কে অগ্রসর হতে তিন ভাবে সাহায্য করেছিল। যেমন রাইচরণ সরদার পৌন্ড্র সমাজের শিক্ষামূলক এবং সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নমঃশূদ্র সমাজের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রধানত রাজনৈতিকভাবে নিজ সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করেছিল। এবং মালো সমাজের অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিনি তাঁর সাহিত্যিক কর্মে দলিত সমাজ কিভাবে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিল তা সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

বর্তমান গবেষণাপত্রকে সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত Research tools বা গবেষণা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি হল Content analysis এবং Interview। এই দুটি Research tools সম্পর্কে নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় Content Analysis হল একটি গুরুত্বপূর্ণ Research tool। এখানে তথ্য লিখিত, মৌখিক এবং ভিজুয়াল অবস্থায় থাকে। যেমন বই, নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, বক্তৃতা, ইন্টারভিউ, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণা পত্রের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত বিষয় থেকে প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তথ্যগুলির গুরুত্ব কতটা তা উপলব্ধি করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু দুর্লভ চিত্র এবং মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি হল "বাংলা দলিত চেতনার ইতিহাস: রাইচরণ সরদার, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা"। এখানে দলিত কারা? দলিত বলতে কী বোঝানো হয়? বাংলার দলিত চেতনায় কাদের অবদান? পৌণ্ড্র সমাজকে জাগরিত করতে রাইচরণ সরদারের অবদান কতখানি? যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক। এবং অদ্বৈত মল্লবর্মনের রচনায় মালোদের সামাজিক অর্থনৈতিক করুন দৃশ্য কেমন ফুটে উঠেছে সেগুলিই আলোচনা করা আমার গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য। বর্তমান গবেষণা পত্রটি রচনার জন্য সরকারি আর্কাইভ, আত্মজীবনী, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, সেন্সাস রিপোর্ট, বিভিন্ন রকম পত্রিকা প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সহায়ক উপাদান হিসেবে পশ্চিমবাংলার বিবিধ লাইব্রেরি থেকে গ্রন্থ, সম্পাদিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। ওই সমস্ত উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে প্রথমে অধ্যয়ন এবং পরবর্তী সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সবশেষে গবেষক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গবেষণা পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল Interview (সাক্ষাৎকার)। বর্তমান গবেষণাতে তথ্য সংগ্রহের জন্য Interview বা সাক্ষাৎকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একটি প্রাচীনতম কৌশল বা পদ্ধতি। একক বা তার অধিক ব্যক্তির প্রশ্ন-উত্তর পর্ব কে বলা হয় Interview method। Interview সাধারণত দুই প্রকার। Personal Interview এবং Group Interview। এই পদ্ধতির বিশেষ কিছু সুবিধা রয়েছে এটি খুবই

বিশ্বাসযোগ্য, সামনা সামনি বসে দ্রুত উত্তর পাওয়া যায়। আবার কিছু অসুবিধাও রয়েছে যেমন এটি খরচ সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ। এছাড়া অনেক সময় যে ব্যক্তির ইন্টারভিউ নেওয়া হয় সেই ব্যক্তি নিরপেক্ষতা হারিয়ে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে। বর্তমান গবেষণাপত্রের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানত একক বা পার্সোনাল ইন্টারভিউ এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত ব্যক্তি বাংলা দলিত আন্দোলন নিয়ে সক্রিয় এবং ওই বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন তাদের বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে একক ইন্টারভিউ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে আলোচিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে যারা অবগত আছেন তাদের কাছ থেকেও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাদের মতামত অনুযায়ী যে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সেই সমস্ত তথ্যগুলোকে প্রথমে পর্যবেক্ষণ এবং সবশেষে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

অধ্যায় বিভাজন (Chapterization)

বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। **ভূমিকা পর্বটিতে** গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, তথ্য ও সাহিত্য সমীক্ষা, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি ও উপাদান এবং প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়:** ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জাতিগুলির পরিচয়, ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি, দলিত বলতে কাদের বোঝানো হয় এবং উপনিবেশিক বাংলা

তথা বর্তমান সময়ের বাংলায় বিভিন্ন দলিত জাতিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আলোচ্য অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দলিত চেতনার বিকাশ, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত চেতনার বিকাশে জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, শ্রী নারায়ণ গুরু, ই ভি রামস্বামী পেরিয়ার এবং বি আর আম্বেদকর প্রমুখদের অবদান এবং উপনিবেশিক বাংলায় দলিত চেতনায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের অবদান কতখানি সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: আলোচ্য অংশে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের প্রথম গ্রাজুয়েট মহাত্মা রাইচরণ সরদার তাদের সম্প্রদায়ের সংস্কার, বিকাশ, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ জাগরণে ভূমিকা কতখানি এবং তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি এছাড়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান তা সবিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি কেন বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক সে সম্পর্কেও তথ্য মূলক আলোচনা তুলেধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বর্তমান অংশটিতে নমঃশূদ্র সমাজের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। যেমন ছাত্রাবস্থায় তিনি কিভাবে জাত ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন, দলিত জাতিদের প্রভুত জনকল্যান মূলক কাজ করেছিলেন সেগুলিকে তুলেধরা হয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ দায়ী ছিল কি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতামতের সততা কতখানি তা আলোচিত হয়েছে। এবং তিনি কিভাবে উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: আলোচ্য অধ্যায়ে মালো সমাজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দলিত লেখক শ্রীঅদ্বৈত মল্লবর্মণের বিবিধ লেখা সমূহে সমকালীন মালোদের করুণ সমাজ চিত্রের বিবরণ ও আর্থিক দুর্বলতার বিষয়টিকে কিভাবে তুলে ধরেছেন তা বিশেষভাবে উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সে সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। এক কথায় অদ্বৈতের রচনায় দলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের সার্বিক অবস্থার চিত্র বর্নণা করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclution)

এই অংশে বর্তমান গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহের সামগ্রিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহার আলোচিত হয়েছে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. William Wilson Hunter: '*A statistical account of Bengal 20 Volume',* (London, Trubner & Co,1875-77), reprint edn, (New Delhi, Concept Publishing Company, 1984).

২. নির্মল কুমার বসু: '*হিন্দু সমাজের গড়ন',* (শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৪৮)।

৩. Nripendra Kumar Dutta: '*Origin and Growth of caste in India',* (Calcutta, Firma KLM Pvt Ltd, 1969).

৪. Hitesh Ranjan Sanyal: '*Social Mobility in Bengal',* (Calcutta. Papyrus, 1981).

৫. নীহাররঞ্জন রায়: '*বর্ণ ও রাষ্ট্র',* সুজিত সেন (সম্পা), *জাতপাতের রাজনীতি,* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯)।

৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: '*জাত জাতি- জাতীয়তা',* সুজিত সেন (সম্পা), *জাতপাতের রাজনীতি,* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯)।

৭. Sekhar Bondyopadhyay: '*Caste Politics and the Raj : Bengal 1872-1937,'* (Kolkata, K.P. Bagchi & Company, 1990).

৮. Sekhar Bondyopadhyay: *'Caste Protest and Identity in Colonial Bengal : The NamaSudras of Bengal 1872 – 1947,'* (Surrey Carzon Press, 1997).

৯. Sekhar Bondyopadhyay: '*Caste Culture and Hegemoni : Social Domination in Colonial Bengal',* (New Delhi, Sage Publication, 2004).

১০. দেবী চ্যাটার্জী: '*পতিত: ভারতের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান',* (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১)।

১১. খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক: '*সংরক্ষণ ও জাতপাত',* (কলকাতা, সঞ্চয়ন প্রকাশনী,২০০২)।

১২. দেবী চ্যাটার্জী: '*মানবাধিকার ও দলিত',* (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৪)।

১৩. Gopal Guru: '*Humiliation claims and Context',* (New Delhi, Oxford University Press,110002).

১৪. Rup kumar Barman: ‘*Caste Identity formation: Mobility and Elite leadership In B. K. Saha (e.d) Wealth and Welfare’,* (Kolkata, Academic Enterprise, 2005).

১৫. Rup kumar Barman: *‘Partition of India and Its Impact on the Schedule Caste of Bengal’,* (New Delhi, AbhijIt Publication, 2012).

১৬. মনোশান্ত বিশ্বাস: ‘*বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি’,* (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬)।

১৭. রূপ কুমার বর্মন: ‘*জাতি- রাজনীতি জাত পাত ও দলিত প্রতর্ক’,* (কলকাতা, আলফাবেট বুক, ২০১৯)।

১৮. সুজিত সেন (সম্পাদিত): ‘*দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ’,* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১৩)।

১৯. সুজিত সেন (সম্পাদিত): *‘জাতপাত ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট’,* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০০৮)।

২০. ড. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়: ‘*প্রান্তিক নিম্নবর্গ দলিত: পরিভাষার অন্তরে’,* খোকন কুমার বাগ(সম্পা) *অন্তর্মুখ বাংলা গবেষণা পত্রিকা,* পর্ব-৪, সংখ্যা-২, বর্ধমান, অক্টোম্বর-ডিসেম্বর-২০১৪।

২১. মৌসুমী নাথ: ‘*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত: দেবেশ রায়ের নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপায়ন’,* খোকন কুমার বাগ(সম্পা) *অন্তর্মুখ বাংলা গবেষণা পত্রিকা,* পর্ব-৪, সংখ্যা-২, বর্ধমান, অক্টোম্বর-ডিসেম্বর-২০১৪।

২২. রূপ কুমার বর্মণ: '*বাঙালী নিম্নবর্ণ মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম: সমাজ ও সাহিত্যের তুলনাত্মক বিশ্লেষণ'*, খোকন কুমার বাগ(সম্পা) *অন্তর্মুখ বাংলা গবেষণা পত্রিকা,* পর্ব-৪, সংখ্যা-২, বর্ধমান, অক্টোম্বর-ডিসেম্বর-২০১৪।

২৩. ড.জীবন কুমার সরকার: '*উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনে নমঃশূদ্রদের ভূমিকা'*, ড.সুধাংশু কুমার সরকার(সম্পা) *চতুর্থবার্তা,* চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৫।

২৪. ড.কৃষ্ণকুমার সরকার: '*পোদ থেকে পৌণ্ড্র: বাংলার পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক আলোচনা'*, ড.সুধাংশু কুমার সরকার(সম্পা) *চতুর্থবার্তা,* চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৫।

২৫. ড.অরুন কুমার বাড়ৈ: '*শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরঃ প্রসঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক আন্দোলন'*, ড.সুধাংশু কুমার সরকার (সম্পা) *চতুর্থবার্তা,* চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৫।

২৬. Sekhar Bandopadhyay: '*Caste in Bengal : Histories of Hierarchy Exclusion and Resistance'*, (Permanent Black, 2022).

২৭. রূপ কুমার বর্মণ: *'সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ'*, (গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২)।

২৮. অনন্ত কুমার ব্রহ্ম: '*বাঙালী জাতির উৎস সন্ধানে'*, (কলকাতা, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, ২০১০)।

২৯. যুথিকা বর্মা: ‘*জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি উপেন্দ্রনাথ বর্মণ(১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ’,* (কলকাতা, সোপান, ২০২১)।

৩০. সুজিত সেন সম্পাদিত: ‘*জাতপাতের রাজনীতি’,* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯)।

৩১. Chinna Rao Yagoti: ‘*Dalit Studies A Bibliographical Handbook’,* (New Delhi, Kanishka Publishers, Distributors, 2003).

৩২. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত): ‘*নিম্নবর্গের ইতিহাস’,* (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮)।

৩৩. ডাঃ জি এস বৈদ্য: ‘*বাঙালি উদ্বাস্তু মতুয়া ও অন্যান্য নমঃশূদ্রদের বর্তমান শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থা’, ‘সোজাকথা নমজাতি সংখ্যা’,* হরষিত সরকার (সম্পা) (উত্তর ২৪ পরগনা, প্রকাশক সোজাকথা) ২০১৯।

৩৪. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী: *‘Caste and Partition in Bengal: the story of Dalit refugees, 1946-1961,’* [৩৪] (Great Clarendon Street, Oxford, OX26DP, United Kingdom, Oxford University Press, 2022).

৩৫. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (সম্পাদিত): *‘বাংলার নমঃশূদ্র প্রথম খন্ড,’* (কলকাতা, কে এন টি এ এ, ২০২২)।

৩৬. মৃন্ময় প্রামানিকের (সম্পাদিত): *‘দলিত সাহিত্যচর্চা’’* (কলকাতা, গাংচিল, ২০২৩)।

প্রথম অধ্যায়

(CHAPTER ONE)

ইংরেজ শাসনাধীনে বাংলার দলিত জাতিদের পরিচিতি

১.১.ভূমিকা: প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সূচনা কাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'জাত ব্যবস্থা' (Caste System) একটি অবিচ্ছিন্ন সামাজিক প্রথা হিসাবে বর্তমানেও প্রবাহমান আর এই ভারতবর্ষের অন্যতম অংশ পশ্চিমবঙ্গও এই প্রথার বহির্ভূত অঞ্চল নয়। ভারতীয় সামজে দলিত বলতে কাদের বোঝায়? তাদের সমস্যা এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান কোথায়? এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র ধারা বেশ কিছুদিন হল প্রবলভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।[১] তবে এই ঐতিহাসকি প্রেক্ষাপট কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। এদেশের প্রাক্ স্বাধীনতার পর্ব থেকেই এই ধারার সূত্রপাত। ভারতবর্ষে যে সমস্ত মানুষ দলিত, ব্রাত্য অন্ত্যজ, অনুসূচিত অস্পৃশ্য, নিম্নবর্ণ এবং সমাজের নীচের তলায় অপাংতেও তাঁদের উৎস তথা উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীগণ নানান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২] এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জনজাতিগুলি সম্পর্কে পরিচয় ঘটানো অর্থাৎ কোন কোন জাতিগুলি ওই সময় দলিত হিসাবে বিবেচিত হত।

বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ১৯৩০-এর দশক থেকে সামাজিক মর্যাদায় নিম্নশ্রেণীর মানুষজনকে তপশিলি জাতি হিসাবে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত করা

হয়েছিল।[৩] প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতীয় সাহিত্যে তাদের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদা অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করে থাকি। যেমন– চণ্ডাল, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য ইত্যাদি।[৪] সাইমন কমিশন সর্বপ্রথম 'তপশিলি জাতি' কথাটি ব্যবহার করেছিল এবং সেটিকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। আর ১৯৩৬ সালে সমস্ত নিম্নবর্ণীয় অনুন্নত জাতিগুলিকে সরকারীভাবে 'তপশিলি জাতি' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৫] সাধারণত দলিত বলতে তপশিলিভুক্ত জাতিকে বোঝান হয়। তবে বর্তমানে তপশিলি উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীকেও দলিত হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

১.২. জাতি প্রথার উদ্ভব-প্রাচীন ভারতীয় সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত

'জাত ব্যবস্থার' উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক গণ বহু গবেষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের Herbert Hope Risley - এর 'The Tribes and Castes of Bengal, James Wise এর Notes on the Races Castes and Trades of Eastern Bengal এবং Christophe Jaffrelot এর India's Silent Revolution: Rise of the Low Castes in North India Politics' প্রমুখ পণ্ডিতগণ ও তাঁদের গ্রন্থগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে Nripendra Kumar Dutta এর Origin and Growth of Castes in India, Suvira Jaiswal এর Caste: Origin, Function and Dimensions of change ও Ram Saran Shamar -র Sudras in Ancient India: A Social History of the Lowr order

Down to circa AD 600, প্রমুখদের লিখিত গ্রন্থগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি, বিকাশ এবং ভাতীয় সমাজে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ীত্বের কারণ নিয়ে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। আধুনিক কালে আবার কোন কোন ঐতিহাসিক এক একটি বিশেষ জাতির উৎপত্তি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণাও করেছেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজের গঠন অত্যন্ত জটিল, কেবল জটিলই নয় জাতি ধর্ম বর্ণের ভিত্তিতে সমাজ গঠন জন্ম ও রক্তের সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্ধন যা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য নজির বিহীন ঘটনা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য বেশী কিছু নয়। তবে প্রধান পার্থক্য হল ভারতবর্ষ ও বাকি দুনিয়ার মধ্যে। বর্ণাশ্রম শাসিত ব্যবস্থার মতো শ্রেণী স্বার্থপুরক এবং পাকা গাঁধুনীর প্রাসাদ বিশ্বে আর কোথাও নেই।[৬] ফলে ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় তথাকথিত দলিত, পতিত, আদিবাসী ব্রাত্য মানুষদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে ইতিহাসের উৎস মুখ থেকে তাঁদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ তথা ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জাতিগুলির পরিচয় সম্পর্কে জানার পূর্বে দক্ষিণ এশিয় সমাজের জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছল ধারণা থাকা আবশ্যিক বলেই মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকরা। কারণ এই পৃথিবীর 'জাত ব্যবস্থার' উৎপত্তি ও বিকাশ দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থারই সম্প্রসারিত ঐতিহ্যশালী প্রথা হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জাতি (Caste) বা 'জাত ব্যবস্থা' ভারতীয় মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান

হিসাবে বর্তমানেও স্বমহিমায় বিরাজমান। যদিও এই জাত বা জাতি শব্দটি ভারতীয় নয়।[৭] জাতি শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থ নিয়েও ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী মহলে প্রবল মতানৈক্য রয়েছে। জাতির ইংরেজি শব্দ 'Caste' এটি স্প্যানিশ শব্দ 'casta' থেকে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ হল কুল বা জাতি।[৮] অপর একটি অভিমত অনুযায়ী এটি একটি পর্তুগীজ শব্দ 'Casta' যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল আসল বা খাঁটি রুটি (Pure Bread) কিন্তু আমরা 'জাত' শব্দটির দ্বারা ভারতীয় ভাষায় অনেকগুলি অর্থ নির্দেশ করে থাকি। ভারতের জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি বৈদিক যুগেই (আনুমানিক ১৫০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।[৯] এই প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল মূলত নৃতাত্ত্বিক কারণে এবং প্রধানত সমাজের ব্যবহারিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। চতুর্বর্ণ বিভক্ত সমাজে বর্ণ কথাটি বৃহত্তর ভাবে ব্যবহৃত হত কিন্তু জাতি এটি একটি ঐতিহ্যশালী ধারণা। অন্য অর্থে স্থানীয়ভাবে জাতি বলা হত যা সমগত্রীয় সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝাত। তাই আমরা পশ্চিমী দুনিয়ার সামাজিক ধারণা 'জাতির' বিকল্প হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি এবং সমাজ বিজ্ঞানীগণ 'জাতি" এবং "বর্ণ" একই অর্থে ব্যবহার করে চলেছেন।[১০] দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশে জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে এ সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসকি এবং সমাজ বিজ্ঞানীগণ তিনটি তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সেগুলি হল -(১) ধর্মীয় রহস্যাত্মক তত্ত্ব (Religious Mystical Theory) (২) জৈবিক তত্ত্ব (Biological Theory) এবং (৩) সামাজিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Socio Historical Theory)।[১১] এই সমস্ত তত্ত্বগুলি বর্তমানে বহুল আলোচিত এবং গ্রহণযোগ্য বলে ঐতিহাসিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক গণ মনে করেন।

যদিও ভারতবর্ষে জাতি বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে রহস্যবৃত। ফলে এই গবেষণা সমাজ বিজ্ঞানে আজও প্রবাহমান। যদিও বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে ভারতের আদি স্থানীয় বসবাসকারীদের মধ্যে সংগ্রাম ও আন্তঃক্রিয়ার ফলে এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যা বিজয়ী আর্যদের স্বপক্ষে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করা বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।[১২]

ধর্মীয় তত্ত্ব টিতে কিভাবে চতুর্বর্ণ বা জাতিগুলির উৎপত্তি হয়েছিল তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশের কিছু দিনের মধ্যে সম্ভবত ১৫০০- ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাদের দ্বারা রচিত হয় বৈদিক সাহিত্য 'ঋকবেদ'। ওই ঋক বেদেই সর্বপ্রথম ‘জাতি বা জাত’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে আর্যরা ক্রমান্বয়ে সাম, যজু এবং অথর্ব বেদ রচনা করেছিলেন। এবং সেগুলিতে প্রধানত আর্যদের জীবন যাপন পদ্ধতি, পূজার্চনা এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মের এক জীবন্ত দলিল হিসাবে আজও বিশেষ সমাদৃতের বিষয়। পরবর্তী বৈদিক পর্বে ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, সূত্র এবং স্মৃতি শাস্ত্রগুলি বৈদিক সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির দ্বারা একটি দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে তুলেছিল যাকে আমরা 'ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা' বলে চিহ্নিত করতে পারি। আর ঐ দার্শনিক তত্ত্বগুলি ধীরে ধীরে ভারতের আর্য সংস্কৃতি প্রাধান্য অধ্যুসিত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল।[১৩] এইভাবে আর্যদের দ্বারা রচিত বৈদিক সাহিত্যগুলি মানুষদের অর্থনৈতিক শোষনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল ব্রাহ্মণদের কাছে। সমস্ত হিন্দুকে বেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে হত, না হলে তাদেরকে হিন্দু বলে গণ্য করা হত না।[১৪]

এতদসত্ত্বেও 'জাত ব্যবস্থা' একটি সামাজিক প্রথা হিসাবে প্রাথমিক পর্বে খুব বেশী মাত্রায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কেবলমাত্র ঋকবেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত পুরুষসূক্তের মধ্যেই 'জাত ব্যবস্থা' তথা চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে যে সৃষ্টি কর্তা প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি।[১৫] ("ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"। ঋকবেদ ১০:৯০")।[১৬] যদিও আমরা এই তত্ত্বটির মধ্যে বেশ কিছুটা অতিকথনমূলক বর্ণনা লক্ষ্য করে থাকি। উক্ত তত্ত্বানুযায়ী ব্রাহ্মণরা হলেন সমগ্র ভারতীয় মানব জাতির নিয়ন্ত্রক, ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা শ্রেণী এবং বৈশ্য ও শূদ্ররা হলেন কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি।

ভগবদ্ গীতাতে 'জাত ব্যবস্থার' উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা একটি বিকল্প তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাচ্ছি। গীতার অভিমত হল আদিতে 'গুণ' (Quality) এবং কর্মের (Profession) ভিত্তিতে সমাজে চতুরবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। মানব ধর্মশাস্ত্র মনুস্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র সূমহে সমাজকে কর্মের ভিত্তিতে চারটি জাতি বা জাত ব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন– শিক্ষক ও পুরোহিতরা হলেন ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা এবং রাজারা হলেন ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়ীরা হল বৈশ্য ও শিল্পী, ভৃত্যরা শূদ্র বলে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত হয়েছিল। যদিও বৈদিক পর্বে গুণের ভিত্তিতে ওই জাত ব্যবস্থা সমাজে বংশ পরম্পরায় রূপান্তরিত হয়েছিল। মনু স্মৃতিতে পুরোহিত শ্রেণীকে অদৃশ্য দেবতা বা ঈশ্বরের উপরেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মনুস্মৃতিতে যাজকদের বেদশিক্ষা, যজ্ঞ এবং বিভিন্ন প্রকার দান গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[১৭]

মনুস্মৃতি এবং আর্যদের অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্যে বর্ণহিন্দুদের দেশের মূল স্রোতে সরাসরি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওই গ্রন্থগুলিতে প্রতিটি বর্ণের জাতি, উপজাতি, নিম্নজাতি এবং অস্পৃশ্যদের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সঠিক কারণ নির্দেশ করতে পারেননি।

জৈবিক তত্ত্বটির দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব গুনের উপর নির্ভর করে সমগ্র মানব সমাজকে একটি স্বতন্ত্রভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে সমগ্র মানব সমাজজকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যেমন- 'সত্ব' (Satva), 'রজ' (Raja) এবং 'তম' (Tama)।[১৮] প্রথমত: 'সত্য' নির্দেশ করছে জ্ঞান, বুদ্ধি, সততা এবং মানুষের অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলী। দ্বিতীয়ত: 'রজ' গুণাবলীর দ্বারা আবেগ, অহংকার ও অন্যান্য ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বোঝান হয়ে থাকে এবং 'তম' নির্বুদ্ধিতা, বোকাটে, সৃজন ক্ষমতার অভাব এবং মানুষদের অন্যান্য নেতিবাচক গুণাবলীকে আমরা চিহ্নিত করছি। উক্ত তিন প্রকার গুণাবলী অনুসারে এক এক জন ব্যক্তি যেকোন একটি পেশা গ্রহণ করতেন। প্রধানত পুরোহিতরা শিক্ষা দান করতেন সেইজন্য তাদের ব্রাহ্মণ বলা হত আর সেটি তাদের সত্য গুণাবলী। এইভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মানীয় পেশা অলম্বন করতেন। সেক্ষেত্রে তারা ছিল রজ গুণাবলীর অধিকারী। এবং শূদ্ররা জন্মগত ভাবেই 'তম' গুণের অধিকারী। ফলে তাদের পেশা ছিল সমাজের সবচেয়ে নিম্নমানের।[১৯] সমাজ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে Biological তত্ত্বটি অনেকটাই যুক্তি সম্মত কিন্তু বাস্তবে সমাজের সমস্ত মানুষকে নির্দিষ্ট জাতির বিভাগে শ্রেণীভুক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। কারণটি খুবই স্পষ্ট সমাজের সমগ্র ব্রাহ্মণ

সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেমন ‘সত্য' গুণাবলীর হতে পারে না তেমনি সমগ্র শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষও ‘তম’ গুণের অধিকারী নয়।

ভারতবর্ষে 'জাত ব্যবস্থার' উৎপত্তি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহাসিক (Sociohistorical) তত্ত্বটা বর্তমানে খুবই গ্রহণযোগ্য বলেই আধুনিক গবেষকদের ধারণা। আলোচ্য তত্ত্বটিতে বর্ণ, জাত এবং অস্পৃশ্যদের উৎপত্তির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানতে পারি আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর এশিয়া থেকে শ্বেতাঙ্গ আর্যরা উত্তর পশ্চিম পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম জাত ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন।[২০] ভারতবর্ষে নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মোঙ্গলিয় ও অস্ট্রালয়েড বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিল আদিম বাসিন্দা কিন্তু আর্যরা এখানে বসতি বিস্তার করে ওই আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করতেন এবং তাদের অধিকৃত অঞ্চলকে আর্যরা জয় করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ওই সমস্ত জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে আর্যরা প্রাধনত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিল যোদ্ধারা এদের বলা হত 'রাজন্য' যারা পরবর্তী পর্বে ক্ষত্রিয় উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিভাগে ছিলেন পুরোহিতরা যারা ব্রাহ্মণ নামে সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং সবশেষে ছিল কৃষক ও কারিগর তাদেরকে 'বৈশ্য' রূপে চিহ্নিত করা ছিল। ওই তিন বর্ণের পাশাপাশি শূদ্রদের অবস্থানও ছিল তারা সমাজে সাধারণত শ্রমিক হিসাবে গণ্য হতেন।[২১]

বৈদিকপর্বের সূচনাতে 'জাত ব্যবস্থা' তার শিকড় ও শাখা প্রশাখাকে সমাজের খুব বেশী গভীরে বিস্তার করতে পারেনি কারণ আলোচ্য সময়ে শূদ্ররাও বেদপাঠ ও ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করতে পারতেন। তখন সমাজ প্রধানত আর্য ও অনার্য এবং বিজেতা ও বিজিত এইভাবে শ্রেণী বিভাগ ছিল বলেই অধিকাংশ গবেষক ও ঐতিহাসিকদের ধারণা। অনার্যদের দাস বা শূদ্র হিসাবে অভিহিত করে তাদেরকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া হয়েছিল।[২২] কিন্তু পরবর্তী বৈদিক পর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাত ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। এছাড়া ঐ সময় উঁচু ও নিচু জাতির মেয়েদের মধ্যে মেলামেশার ক্ষেত্রেও কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছিল যা আমরা স্মৃতিশাস্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারি।[২৩]

পরবর্তী বৈদিক পর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে অব্রাহ্মনরা মূলত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা জোরালো প্রতিবাদ করতে থাকে যার অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান। ওই দুই ধর্মের মানুষেরা ক্ষত্রিয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩-৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং বর্ধমান মহাবীর (৫৯৯ - ৫২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের।

প্রাক্ মধ্যযুগে অসবর্ণ বিবাহের ফলে বহু সংখ্যক নতুন নতুন পেশার উৎপত্তি হতে থাকে ফলে পূর্বের জাত ব্যবস্থায় অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছিল। প্রাক মধ্যে যুগের সূচনা কাল থেকে অসংখ্য মিশ্র জাতির উৎপত্তি হয়েছিল যারা তাদের পেশা ভিত্তিক ও গুণাবলী অনুযায়ী বিভিন্ন মর্যাদা লাভ করেছিল। বৃহৎধর্ম্ম পুরান, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরান থেকে আমরা ওই মিশ্র জাতিগুলি সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে জানতে পারি। ওই জাতিগুলিকে আবার কয়েকটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন-উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর এবং অধম সংকর ইত্যাদি।[২৪]

মধ্যযুগ এবং প্রাক আধুনিক যুগে ভারতীয় জাত ব্যবস্থায় আরো বিশেষ কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। ঐ পর্বে নিচু জাতির মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের অধিকার এবং মর্যাদার কোন উন্নতিসাধন পরিলক্ষিত হয়নি। মুসলিম সমাজের আরজাল ও আতরাপ শ্রেণীভুক্ত মানুষরা ঐতিহ্য ভিত্তিক হিন্দু সমাজের শুদ্র ও অস্পৃশ্যদের সমতুল্য হিসাবেই পরিচতি লাভ করেছিল। সুতরাং তারাও মুসলিম সমাজের দলিত জাতি হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। এছাড়া নীচু জাতি এবং ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদেরও দলিত রূপে সনাক্ত করা হয়েছিল। এক অর্থে ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত অস্পৃশ্যরাই দলিত রূপে প্রতীয়মান হতে থাকে।[২৫]

১.৩. দলিত কাদের বলা হয়

দলিত বলতে কি বোঝায় ? বা দলিত বলতে কাদের বোঝায়? অথবা দলিত কে? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে প্রাথমিক পর্বেই আমাদেরকে দলিত শব্দটির অর্থ প্রকৃতি এবং শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে বিশদভাবে জ্ঞান অর্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাক্ স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থা তথা বর্তমানে বহুল আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় বস্তু হল দলিত সমাজ ব্যবস্থা। এই দলিত শব্দটির অর্থ বিভিন্ন গবেষক, ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেও যার আক্ষরিক অর্থ কিন্তু একটি অর্থকেই চিহ্নিত করে আর সেটি হল অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ জনকে অথবা তপশিলিভুক্ত জাতিগুলিকে। তবে বর্তমানে তপশিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেও নির্দেশ করা হচ্ছে।

এবার দলিত শব্দের অর্থ কি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। প্রাথমিকভাবে বলা যায় যে দলিত শব্দটি এক অর্থে নতুন মারাঠী সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে মহারাষ্ট্রে 'দলিত প্যান্থার' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলিত একটি পরিভাষা রূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। কিন্তু সাংবাদিকতার ভাষা হিসেবে দলিত শব্দটির ব্যবহার ভারতীয় সমাজে ১৯৩১ সালেও লক্ষ করা যায়।[২৬]

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'দলিত' শব্দটি 'দলন' হইতে আগত অর্থাৎ বলপূর্বক কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে দমিয়ে রাখা। যদিও আলোচ্য প্রক্রিয়ায় পেশীশক্তির যাবতীয় প্রকারণই যুক্ত তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক ক্রমোচ্চ বিন্যাস এবং তার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতার ব্যাপারটিও। যার ফলে প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে অমান্য করেও দলন প্রক্রিয়া প্রায় ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অব্যাহতভাবেই চলেছে।[২৭] দলিত শব্দটি বিশেষণ, এর অভিধানগত অর্থ হল মর্দিত, বা মাড়ানো হয়েছে এমন অর্থাৎ পদদলিত পিষ্ঠ, দমিত ও নিপীড়িত প্রভৃতি। এছাড়া ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে মুসলমানরা ছাড়াও যে সব সামাজিক গোষ্ঠী কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখেছিলেন তারাই হল অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। বিংশ শতকের তিনের দশক থেকে অস্পৃশ্যরা নিজেদের 'দলিত' অর্থাৎ নিপীড়িত বলে পরিচয় দিতে শুরু করেছিল। বর্ণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে এদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বোঝার জন্যে দলিত শব্দটি বেশ উপযুক্ত ছিল।

ঔপনিবেশিক শব্দ পশ্চাদপদ শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ অন্য দিকে গান্ধীজীর দেওয়া 'হরিজন' যার অর্থ 'ঈশ্বরের মানুষ' অভিধাটিও ছিল বিশেষ আপত্তি কর।[২৮] কারণ আমাদের মনে হয় এই শব্দের দ্বারা কৃপা ও করুণার পাশাপাশি রয়েছে বর্ণাশ্রম শাসিত দর্শনের প্রতি নিম্ন মনোভাবের পরিচায়ক।

অন্যভাবে “দলিত” কথাটির অর্থ এমন বস্তু বা ব্যক্তি যাদের কেটে ফেলা হয়েছে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে অথবা টুকরো টুকরো করে পিষে ফেলা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হয়েছে ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত মারাঠী সমাজ সংস্কারকও মহান বিপ্লবী মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০) হিন্দু সমাজে নিপীড়িত অবর্ণ ও অস্পৃশ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে এই কথাটি ব্যবহার করেন। ১৯৩০-এর দশকে ‘ডিপ্রেসড ক্লাসেস' (Depressed Classes) কথাটির হিন্দি ও মারাঠী অনুবাদ হিসাবে দলিত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। অস্পৃশ্য জাতিদের ক্ষেত্রে বৃটিশরা "ডিপ্রেসড ক্লাসেস' (Depressed Classes) কথাটা ব্যবহার করেছিল। ১৯৩০-এর দশকে পুনে থেকে অস্পৃশ্য জাতিগুলির উদ্যোগে 'দলিত বন্ধু' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। বি. আর. আম্বেদকরের (১৮৯১-১৯৫৬) বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই কথাটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তিনি তাঁর মারাঠী বক্তৃতায় দলিত কথাটি প্রায়শই ব্যবহার করতেন।[২৯] ১৯৭০-এর দশকে মহারাষ্ট্রে দলিত প্যান্থার আন্দোলনের সমর্থকরা 'দলিত' কথাটি ব্যবহার করতেন এবং এর দ্বারা তাঁদের উপর যুগ যুগ ধরে বঞ্চনাও অবদমনের কথাটিকে মনে করিয়ে দিত। ঐ দলিত কথাটির দ্বারা যে মানুষদের বোঝান হয় তাদের কাছে এটা শুধুমাত্র একটা নাম বা পরিচয় নয় তবে এটা এখন একটি আশার প্রতীক। তাদের পরিচিতি ফিরে পাওয়ার আশায় বর্তমানে এর একটি ইতিবাচক অর্থ

দাঁড়িয়েছে। সাধারণত দলিত কথাটির অর্থ নিম্নবর্ণ অথবা দরিদ্র নয়, বরং এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে এক অবদমিত অবস্থা। সামাজিক রীতি-নীতির মাধ্যমে তাদের যে অধঃপতিত অবস্থায় পরিণতি করেছে দলিত বলতে সেটাই বোঝানো হয়েছে।[৩০]

দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দলিতদের অসংখ্য নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ সব নামগুলো ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত এবং এই নামগুলোর পিছনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব প্রবলভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। সেই নামগুলি হল- দাস, দস্যু, রাক্ষস, আগুর, অবর্ণ, নিষাদ, পাঞ্চমা, চণ্ডাল হরিজন ও অস্পৃশ্য ইত্যাদি। আলোচ্য নামগুলি দেওয়ার সময় "আমরা-ওরা অথবা আমরা-তোমরা" মনোভাব কাজ করেছিল বলেই আধুনিক গবেষক মহল তথা ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। 'আমরা শুচি' এবং 'তোমরা অশুচি'।[৩১] এই সব অবমাননাকর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ জন যখন 'দলিত' নামটিকে বিশেষ মর্যাদার সহিত গ্রহণ করল তখন সেটা একদিকে যেমন তাদের জীবন ধারনের কঠিন অবস্থাকে চিহ্নিত করে অন্যদিকে তাদের পূর্বের অবস্থা থেকে মুক্তির উচ্চাকাঙ্খাকেও সমানভাবে মর্যাদা দেয়।

ব্রিটিশরা দলিতদের 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস' (Depressed Classes) (অবদমিত শ্রেণী) বলেই সনাক্ত করেছিল। এবং ১৯৩৫ সালে সিডিউলড কাস্ট এ্যাক্ট-এ 'তপশিলি' জাতি নামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গান্ধীজী তাদের হরিজন নামে আখ্যায়িত করে যার অর্থ 'ভগবানের সন্তান'। কিন্তু দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা গান্ধীর দেওয়া নামটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি কারন তাদের অভিমত-এর মাধ্যমে তাদের অবস্থা বোঝা

যায় না।[৩২] এবং সেটা দলিত সম্প্রদায়ের কাছে ছিল বিশেষ আপত্তিজনক এবং অবমাননাকর।

ঐতিহ্যভিত্তিক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিভাজনের সূত্র ধরেই বর্তমানে প্রশাসনিক পরিভাষায় 'দলিত' বলতে আমরা সাধারণত তাদেরকেই বুঝি যাদের তপশিলভূক্ত জাতি হিসাবে অভিহিত করা হয়। অনেকে আবার তপশিলভুক্ত উপজাতি সমূহ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষ জনকেও দলিত অভিধায় ভূষিত করতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য আলোচ্য অংশে একথা মনে রাখাটা খুবই জরুরি যে সনাতনী বর্ণ ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথার নিরিখে যদিও ‘দলিত' বলতে তথাকথিত অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীগুলিকে বোঝানো হয়ে থাকে।[৩৩] দলিত শব্দের ব্যাপকতা নিয়ে বলা যায় যে আমরা যদি সংকীর্ণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করে থাকি তাহলেও দলিত বলতে আমরা বুঝি জাতপাত ভিত্তিক ভারতীয় সমাজকাঠামোতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানব জনগোষ্ঠী সমূহকে।

সারণী ১.৩. বিভিন্ন অর্থ ও বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী দলিত বলতে কাদের বোঝানো হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১	সংকীর্ণ অর্থে	হিন্দু চতুরবর্ণ ব্যবস্থার একেবারে নিম্নস্তরের শূদ্র এবং তারও বাইরের অতি শূদ্র ও অন্যান্য জনগণ
২	বৃহৎ অর্থে	আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক শোষিত সমাজের প্রান্তিক নারী, শিশু, বৃদ্ধ,তপশিলি জাতি, তপশিলি

		উপজাতি,সংখ্যালঘু, আদিবাসী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী
৩	ঐতিহাসিক অর্থে	অপবিত্র, মেলচ্ছ, চন্ডাল, অচ্ছুত, অন্তজ্য, হরিজন সম্প্রদায়
৪	সাংবিধানিক অর্থে	তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কিছু অংশ
৫	আদমশুমারি অনুযায়ী	ভারতবর্ষের প্রায় ১৭ কোটি জনগণ
৬	আধুনিক অর্থে	দলিত পরিচিতি প্রদানকারী শিক্ষিত চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী
৭	রাজনৈতিক অর্থে	নিম্নবর্গীয় আন্দোলন ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় নিহিত সচলায়িত গোষ্ঠী
৮	অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে	পশ্চাদপদ ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ
৯	গান্ধীবাদী মতাদর্শ অনুযায়ী	হরিজন সম্প্রদায়
১০	মার্কসবাদী মতে	শ্রেণী সচেতন কৃষক, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, ছাত্র এবং অন্যান্য সমপর্যায়ে পেশাগত গোষ্ঠী

তথ্যসূত্র-সুজিত সেন (স):*‘দলিত আন্দোলন : প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ’*, (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০)

১.৪. ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জাতি সমূহের সংক্ষেপে বিবরণ

দলিত শব্দটির দ্বারা যে সকল মানব জনজাতির নীচু জাতে জন্ম এবং যাদেরকে তাদের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করত, তারা বংশ পরম্পরায় নিম্ন শ্রেণীভুক্ত সর্বদা উৎপীড়িত এছাড়াও যাদের পেশা অশুদ্ধি হিসাবে বিবেচিত হতেন তারাই দলিত জনজাতি, রূপে চিহ্নিত হত। দলিত সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হল দলিত এবং 'সিডিউলড কাস্ট' (Scheduled Caste) সমার্থক শব্দ রূপেই প্রচলিত। কিন্তু সিডিউলড কাস্ট (Scheduled Castes) এর বাইরেও যে অসংখ্য মানুষ (অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, পঞ্চম জাতি, অতিশুদ্র বা চণ্ডাল) বাস করত তাদেরকেও দলিত বলা হত।[৩৪] বৃহত্তর অর্থে দলিত শব্দটির দ্বারা সামাজিক ক্রমোচ্চ বিন্যাসে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু তপশিলি উপজাতির নিম্নজাতের মুসলিম এবং খ্রীষ্টানদেরও দলিত অভিধায় ভূষিত করা হয়। যাই হোক এই অধ্যায়ে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত জাতিগুলি সম্বন্ধে সমক্য ধারণা লাভ করা।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৬ সালে ঔপনিবেশিক বাংলায় মোট ৭৬টি সম্প্রদায়কে তপশিলি জাতি অথবা দলিত হিসাবে সনাক্ত করা হয়ে ছিল।[৩৫] এছাড়া উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলায় ১৯৩৬ সালের তালিকার সঙ্গে আরো কিছু তপশিলিভুক্ত উপজাতি কেও দলিত হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

সারণী: ১.৪. উপনিবেশিক বাংলার ৭৬ টি তপশিলি জাতির নামের তালিকা উল্লেখ করা হল The Government of India (schedule caste) order 1936 অনুযায়ী

১	আগরিয়া	৪০	বাইটি
২	ওরাও	৪১	বাউরি
৩	কাদার	৪২	বাগদি
৪	কান	৪৩	বেদায়
৫	কান্দ	৪৪	বেরুয়া
৬	কাওরা	৪৫	বেলদার
৭	কাপুরিয়া	৪৬	বাহেলিয়া
৮	কারিংগা	৪৭	বিন্দ
৯	কাসটা	৪৮	বিনজিয়া
১০	কাউর	৪৯	ভূঁইয়া
১১	কোচ	৫০	ভাটি
১২	কোনাই	৫১	মাল
১৩	কোনওয়ার	৫২	মালাহ
১৪	কোরা	৫৩	মালপাহারিয়া
১৫	কোটাল	৫৪	মাহালী
১৬	খারিয়া	৫৫	মাহার

১৭	খাটিক	৫৬	মেচ
১৮	গনরি	৫৭	মুচি
১৯	গারো	৫৮	মেথর
২০	ঘাসি	৫৯	মুন্ডা
২১	চামার	৬০	মুসাহার
২২	জালিয়া কৈবর্ত	৬১	রাজবংশী
২৩	ঝালোমালো বা মালো	৬২	রাজওয়ার
২৪	ডোম	৬৩	রাভা
২৫	তীয়র	৬৪	লোধা
২৬	তুরি	৬৫	লালবেগি
২৭	দোয়াই	৬৬	লোহার
২৮	দোষাদ	৬৭	শুড়ি
২৯	ধেনুয়ার	৬৮	সাঁওতাল
৩০	ধোবা	৬৯	হাজং
৩১	নাত	৭০	হাডি
৩২	নুনিয়া	৭১	হাঁড়ি
৩৩	নমঃশূদ্র	৭২	হো
৩৪	নেগেসিয়া	৭৩	হোলকার
৩৫	পাটনি	৭৪	ভূমিজ

৩৬	পোদ	৭৫	ভুইমালী
৩৭	পান	৭৬	মাল
৩৮	পালিয়া		
৩৯	পাশি		

Source-The Government of India (schedule caste) order 1936

সারণী:১.৫. ঔপনিবেশিক পরবর্তী পশ্চিমবাংলার তপশিলি জাতির তালিকা, ২০০১

১	কাদার	৩১	নুনিয়া
২	কামি(নেপালী)	৩২	নমঃশূদ্র
৩	কান্ড্রা	৩৩	পাটনি
৪	কাঞ্জার	৩৪	পোদ (পৌণ্ড্র)
৫	কাওরা	৩৫	পান
৬	কারেংগা	৩৬	পালিয়া
৭	কাউর	৩৭	পাশি
৮	কেওট	৩৮	বাইটি
৯	কোচ	৩৯	বাউরি
১০	কোনাই	৪০	বাগদি
১১	কোনওয়ার	৪১	বেলদার

১২	কোটাল	৪২	বাহেলিয়া
১৩	কুরারিয়ার	৪৩	বাটনার
১৪	খারিয়া	৪৪	বিন্দ
১৫	খাটিক	৪৫	ভূঁইয়া
১৬	গনরি	৪৬	ভুইমালী
১৭	ঘাসি	৪৭	ভোগতা
১৮	চামার	৪৮	মাল
১৯	চৌপল	৪৯	মাহার
২০	জালিয়া কৈবর্ত	৫০	মাল্লা
২১	ঝালোমালো বা মালো	৫১	মুসাহার
২২	ডোম	৫২	রাজবংশী
২৩	তীয়র	৫৩	রাজওয়ার
২৪	তুরি	৫৪	লালবেগি
২৫	দোয়াই	৫৫	লোহার
২৬	দোষাদ	৫৬	চাই
২৭	দাবগার	৫৭	সারকি (নেপালি)
২৮	দামাই	৫৮	শুড়ি
২৯	ধোবা	৫৯	হারি
৩০	নাত	৬০	হোলকার

Source: Government of West Bengal, Short Note on Scheduled Caste of West Bengal, (Kolkata: Cultural Research Institute. Backward Classes Welfare Department, 2005)

ঔপনিবেশিক বাংলার জনগণনার রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি, পৌণ্ড্র, বাউরি, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায় গুলোকে বৃহত্তর জনসংখ্যার তপশিলি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অপরপক্ষে ধোবা, ডোম, হাড়ি, জালিয়া কৈবর্ত, মালো, লোহার, মাল, শুরি, তিওর ইত্যাদি জাতি গুলি মাঝারি জনসংখ্যার তপশিলি জাতি। এছাড়া ভুঁইমালি, কারিঙ্গা, কেয়ত, মাল্লা, রাজওয়ার, কাদার, বাহেলিয়া, বিন্দ, ভোক্তা, দোয়াই, ঘাসি, গোনড়ি প্রভৃতি জাতিগুলিকে ছোট জনসংখ্যার তপশিলি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[৩৬]

ঔপনিবেশিক বাংলায় যে সমস্ত তপশিলি জাতিগুলিকে দলিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে কিছু সংখ্যক জাতি সম্পর্কে এবং জেলা ভিত্তিক অবস্থান সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে -

পৌন্ড্র: ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম তপশিলি জাতি হল পৌণ্ড্র। এরা নিজেদেরকে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করতে বিশেষ তৎপর ছিল। পৌণ্ড্রগণ পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ (১২%) বৃহত্তম দলিত তপশিলি জাতি হিসাবে স্বীকৃত।[৩৭] তবে সরকারী তালিকাতে পোদ বলেই সীলমোহর প্রাপ্ত।[৩৮] পৌন্ড্রদের অধিকাংশ মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, খুলনা ও নদীয়া জেলাতে আধিক্য দেখা যায়। কৃষিকাজ, মাছ ধরা এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাদের পেশা।[৩৯]

ডোম: ঔপনিবেশিক বাংলার এক বিশেষ প্রান্তিকায়িত জনজাতি হল ডোম। আলোচ্য পর্বে তারা ধানগোড (Dhangod) নামেও পরিচিত ছিল। ডোমদের জাতিগত পেশা ছিল ঝুড়ি তৈরি, মাদুর তৈরী, প্রভৃতি। এদের কয়েকটি সমাজিক বিন্যাসও আমরা লক্ষ করে থাকি যেমন জানি ডোম, অংকুরি ডোম, বাজুনি ডোম ইত্যাদি।[৪০] ডোমরা বাংলার মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ইত্যাদি জেলাগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

ধোবা: পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জেলাতেই এদের কমবেশী বসবাস দেখা যায়। হিন্দু জাত ব্যবস্থায় এরা ছিল অস্পৃশ্য, অপরিচ্ছিন্ন। ফলে বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণরা ধোবাদের কাছ থেকে জল গ্রহণ করতে পারতেন না। তারা অশৌচ কাপড় কাচার পাশাপাশি কৃষিকাজকেও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করত। এইভাবে তাদের দুটি ভাগে পরিলক্ষিত হয়। যেমন – চাষা ধোবা এবং সাধারণ ধোবা।[৪১]

বাগদি: ঔপনিবেশিক বাংলার তফসিলি জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বাগদি। বাগদি শব্দটি দুটি শব্দের মিলিত রূপ যেমন বাগ (বাঘ) এবং তি (জল)। বাগদি জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন উপবিভাগ লক্ষ করা যায়। যেমন – তেঁতুলিয়া, দলুই, মাছুয়া, কাশিকুলিয়া। কুশমাটিয়া ইত্যাদি। এদের নিয়ে বিভিন্ন পৌরানিক কাহিনীও আমরা লক্ষ করতে পারি। তবে সাধারণত বাগদিদের পেশা ছিল মাছ ধরা তাছাড়া তাদের বিভিন্ন উপজাতি অনুযায়ী বিভিন্ন পেশাও তারা গ্রহণ করতেন।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি জেলাতে বাগদিদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।[৪২]

হলালখোর: ঔপনিবেশিক বাংলাতে হালালখোররা বিভিন্ন নামে যেমন ভাঙ্গি, ভাঙ্গিয়া, মেথর ইত্যাদি হিসাবে পরিচয় লাভ করেছিলে। এরা সাধারণত ঝাড়ুদার হিসাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৪৩]

রাজবংশী: বাংলার তপশিলি জাতিদের মধ্যে সর্ববৃহত্তম (১৮.৪%) জাতি হল রাজবংশী।[৪৪] বর্তমান উত্তবঙ্গের জেলাগুলিতে এদের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন- অবিভিক্ত বাংলার রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ইত্যাদি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের রাজবংশীদের বিভিন্ন পেশা গ্রহর করতে দেখা যায়। যদিও অবিভক্ত বাংলায় তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। তবে নদীয়া, চব্বিশ পরগরা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুরের রাজবংশীরা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করতেন।[৪৫]

ভূঁইমালী: ভূঁইমালী শব্দটি দুটি শব্দের মিলিত রূপ ভুঁই বা ভূমি অর্থাৎ জমি এবং মালী মানে রক্ষক। এদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বরাভাগীয় এবং ছোট্টভাগীয়, ভূঁইমালীরা পূর্ববঙ্গের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পাবনা ইত্যাদি জেলাগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৪৬] তারা বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র তৈরি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজনা পরিবেশনের কাজ করে থাকে।

ঝল্ল মল্ল বা মালো: মালোরা প্রধানত পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, পাবনা, ময়নমনসিংহ, যশোর এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে প্রাকঐতিহাসিক যুগ থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করত এবং মাছ ধরাকে তারা প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলে।[৪৭] এইভাবে ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নমঃশূদ্র, কেওড়া, মাল, কোচ, মাহার, মেথর, মুচি, মুণ্ডা, শুঁড়ি ইত্যাদি তপশিলি জাতিগুলির আধিকা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বাউরি: বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে জাত ব্যবস্থার নিচে অবস্থান করে বাউরিরা। বাউরিরা বাংলার তৃতীয় (১৪.৯%) বৃহত্তম তপশিলি জাতি।[৪৮] এরা পেশা এবং উৎপত্তির ভিত্তিতে কতকগুলি উপজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। যেমন মাল, মালুয়া, ধুলিয়া, মাল্লভুমিয়া ইত্যাদি। পুরুলিয়াতে এদের কিছুটা পরিমাণে আধিক্য দেখা যায়। প্রাক ঔপনিবেশিক পর্বে এরা মানভূম অঞ্চলে ঘোড়া দেখাশোনার কাজ করত। দিন মজুর হিসাবে তারা কৃষি কাজও করতেন।[৪৯]

বাহেলিয়া: বাহেলিয়ারা ঔপনিবেশিক বাংলাতে ছিল খুবই কম সংখ্যক। এরা মূলত বিহার উত্তরপ্রদেশ ও রাজপুতানা থেকে আগত জনগোষ্ঠী। এই বাহেলিয়ারা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতে সেনাবাহিনীর কাজ করতেন। বাহেলিয়ারা বাংলাতে বিভিন্ন নামে অভিহিত হতেন। যেমন বয়লা, বাইলা, বোইলিয়া ও বাহিলা ইত্যাদি। পরবর্তীকালে বাংলাতে তারা বিবিধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যেমন শিকার করা, ভূমিহীন কৃষক, এছাড়া পুলিশ ইত্যাদিতে। এরা নিজেদেরকে পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রিয় জাতির সমতুল্য বলে মনে করতেন।[৫০]

বেলদার: বেলদার শব্দটি এসেছে ইংরেজি শব্দ bel থেকে। যার অর্থ নিড়ানি। তারা প্রধানত বিহারের জনগোষ্ঠী। পশ্চিমবাংলায় এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এরা বাঁধ নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কিছু সংখ্যক বেলদার জাতি ভাগলপুর দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতেও বসবাস করতেন।[৫১]

বিন্দ: ঔপনিবেশিক বাংলাতে বিন্দদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাংলার মালদা জেলাতে প্রধানত বিন্দের দেখা যেত। এছাড়া পাবনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও বিন্দের

বসবাস লক্ষ্য করা যায়। তারা মাছ ধরা, মাদুর এবং ঝুড়ী তৈরীর কাজে যুক্ত থাকতেন।[৫২]

চামার/ চর্মকার: জুতো প্রস্তুতকারকরা প্রধানত চামার হিসাবে পরিচিত ছিল। এরা উত্তর, মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে বসবাস করতেন। তারা চর্মকার, রবিদাস, চাম্বার এবং রামদাসিয়াই প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল। এদের উৎপত্তি সংক্রান্ত বহু বিতর্ক রয়েছে। বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে চন্ডাল পিতা এবং ব্রাহ্মণ মাতার গর্ভজাত মানুষজন চামার হিসেবে পরিচিত। অপরদিকে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্র মাতার গর্ভজাত সন্তান চামার হিসাবে পরিচিত। ঔপনিবেশিক বাংলাতে জাত ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতি হিসেবে বিবেচিত হত চামাররা। চামারদের প্রধান পেশা অশুচি, এটাকে তারা নিয়তির দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত বলেই মনে করতেন। ওই সময় তারা মরা গরুর চামড়া সংগ্রহের কাজেও যুক্ত ছিলেন। ওই কাজকে অপরিচ্ছন্ন বলে মনে করা হতো।[৫৩]

হাঁড়ি: উপনিবেশিক বাংলার অপর উল্লেখযোগ্য জাতি হল হাঁড়ি। আলোচ্য পর্বে তারা নয়টি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। সামাজিকভাবে এদের অবস্থান ছিল একেবারে নিম্নস্তরে। এরা প্রধানত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তৈরি ও বাজনা বাজাত। এছাড়া গাছ কাটা, বাশের ঝুড়ি তৈরি ইত্যাদি কাজও করতেন। সমাজের উপর তলার মানুষেরা এদের হাত থেকে জল গ্রহণ করতেন না। সমাজের বিভিন্ন মন্দিরে এদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন জেলাতে এদের আধিক্য দেখা যেত।[৫৪] মেথর,

ভাঙ্গি, বাল্মিকী এই গোষ্ঠীগুলি বাজার হাট ঝাড়ু দেওয়া বা বিভিন্ন অপরিষ্কার ক্ষেত্র পরিস্কার করে থাকে

গনোরি: যারা প্রধানত মাছ বিক্রি করতেন এবং মাছ ধরতেন তারা সমাজের গনোরি হিসাবে পরিচিত ছিল। গণরি রা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। এবং বিভিন্ন পেশা ও গ্রহণ। কুরবিন, মাঝি, ছোটাহা, ছবি ইত্যাদি। করবেন রা ব্যবসা এবং চাকরির সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। মাঝি গনোরিরা নৌকাবাহক হিসাবে সমাজে পরিচিত। ছোটা হা এবং ছবিরা মৎস্যজীবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। উপনিবেশিক ভারতে এরা বিহার এবং বর্ধমান ২৪ পরগনা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতে বসবাস করতেন।[৫৫]

লোহার: বাংলা লোহাররা প্রধানত বিহারের কামার জাতি। বাংলার বাউরি বাগদী এবং মালদের থেকে এরা সামাজিক দিক থেকে অনেক নিচেতে অবস্থান করতেন।[৫৬]

নমঃশূদ্র: ঔপনিবেশিক বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম (১৭.৪%) তপশিলি জাতি হল নমঃশূদ্র জাতি গোষ্ঠী।[৫৭] নমঃশূদ্র নামটি একেবারে নবাগত। প্রাক ও উপনিবেশিক পর্বে নমঃশূদ্ররা চন্ডাল হিসাবে সমাজে পরিগণিত হত। **১৯১১** সালের জনগনা নমঃশূদ্র হিসেবে পরিচিতি পায়।[৫৮] এই নমঃশূদ্রদের উৎপত্তি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এই জাতি গোষ্ঠী প্রধানত অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে বসবাস করে। তবে অধুনা বাংলাদেশে এদের সংখ্যা নগণ্য। ভারতের পশিমবঙ্গে সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, এছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিক্ষিপ্ত সংখ্যায় বসবাস করছে এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষরা। অনেকের ধারনা নমঃ নাম ‘নমস’ মুনির নাম অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে।[৫৯] নমঃশূদ্রদের অনেক মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের

অনুগামী ছিলেন। এরা প্রধানত নমঃই কাশ্যপ গোত্রের হয়ে থাকে। নমঃশূদ্রদের আদি পুরুষ গোণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনেকে অভিমত পোষন করেছেন। এছাড়া অপর একটি মতবাদ অনুযায়ী নমঃশূদ্র বা চণ্ডালরা প্রধানত চন্দ্র বংশীয় রাজপুত জাতির অন্তর্গত।[৬০] আদিতে তাদের প্রধান জীবিকা ছিল শবদাহ করা। কিন্তু পরর্বতী কালে কৃষি কাজ এবং অন্যান্য জীবিকাও গ্রহন করছে। এই নমঃশূদ্রদের প্রান পুরুষ হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামীরা হরিনাম সংকীর্তন নিয়ে মাতোয়ারা থাকতেন বলে পরবর্তী সময়ে এরা আবার মতুয়া নামেও অধিক পরিচিতি পায়।[৬১]

মাল: মাল তপশিলি জাতি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাংলা প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করে। তারা প্রধানত কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে বর্তমান প্রজন্মের মাল জাতির বহু মানুষজন অন্যান্য জীবিকা গ্রহণ করে সমাজে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ভারতীয় সমাজের জাত ব্যবস্থায় সামাজিকভাবে মালরা নিকৃষ্টতর জাতি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।[৬২]

পালিয়া: জাত ব্যবস্থার যে সমস্ত জাতি কৃষিকাজ করে জীবিকা ধারণ করে তাদের মধ্যে অন্যতম হল পালিয়া জাতি। এরা সাধারণত বাংলা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে। এই পালিয়ারা সমাজে কোচ জাতির মতই গণ্য হয়ে থাকত।[৬৩]

শুড়ি: ঔপনিবেশিক বাংলা প্রদেশের অপর একটি উল্লেখযোগ্য জাতি হল শুড়ি। বাংলা প্রদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতে এই শুড়ি জাতির আধিক্য দেখা যায়।এই শুড়িরা নেশাদ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিক্রি করে জীবিকা উপার্জন করে।[৬৪]

জেলিয়া কৈবর্ত : ভারতীয় জাত ব্যবস্থার যে সমস্ত জাতি মাছ ধরে এবং নৌকা চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করেচলেছে তারাই প্রধানত জেলিয়া কৈবর্ত নামে অধিক পরিচিত। এই জাতি ভারতের পূর্ব এবং উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে। প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যগুলিতে যেমন মহাভারত, মনস্মৃতি, ব্রহ্মবৈর্ত পুরান, দীর্ঘনিকায় এছাড়া অশোকের শিলালিপিতেও কৈবর্ত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৫] বাংলাতে পাল সাম্রাজ্যের সময়েও কৈবর্তদের কথা জানা যায়। এবং তারা বিদ্রোহেও সামিল হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলার মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাগুলিতে কৈবর্তদের বসবাস দেখা যায়।[৬৬]

১.৫.পর্যবেক্ষন: আলোচ্য অধ্যায় থেকে যে সমস্ত বিষয়ে অবগত হতে পেরেছি সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল। প্রথমেই ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জাত ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সমক্য ধারণা অর্জন করতে পেরেছি। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় জাতি ও বর্ণ যে সমার্থক শব্দ সে সম্পর্কেও উপলব্ধি করেছি। এছাড়া ঋকবেদে প্রথম বর্ণভেদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, ভগবতগীতা প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বাখ্যা দেয়া হয়েছে সেগুলিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীগণ যে তিনটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সেগুলি সম্পর্কেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান অধ্যায়ে দলিত বলতে কাদের বোঝানো হয় এবং ভারতবর্ষে কখন থেকে দলিত শব্দটি ব্যবহৃত হয়, কার দ্বারা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন অর্থে দলিত বলতে কি বোঝানো হয় সে সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এবং ঔপনিবেশিক বাংলায় তপশিলি জাতিগুলির জেলাভিত্তিক বাসস্থান তাদের জীবন জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। উপনিবেশিক পরবর্তীকালে কোন কোন জাতিগুলি তপশিলি জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সুজিত সেন (সম্পা): *'দলিত আন্দোলন : প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ',* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১৩), পৃ. ৫।

২. যতীনবালা: *'দলিত সাহিত্য আন্দোলন',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃ. ৬।

৩. Rup Kumar Barman: *'Partition of India and its Impact on Scheduled Castes of Bengal',* (New Delhi, Abhijeet Publications, 2012), পৃ. ৩৪।

৪. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৩৪।

৫. দেবী চ্যাটার্জী: *'মানবাধিকার ও দলিত',* (ভাষান্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৪), পৃ. ৩৩।

৬. স্বপন দাস (সম্পা): *'দলিত ভাবনায় প্রবন্ধ',* (কলকাতা, প্রয়াগ প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ১২০।

৭. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৬।

৮. অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়, ও দেবাশিস নন্দী: *'ভারতীয় রাজনীতি',* (কলকাতা, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, ২০১১) পৃ. ৮৯।

৯. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৬।

১০. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৩৬।

১১. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৩৬।

১২. দেবী চ্যাটার্জী: *'পতিত: ভারতের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণী দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান',* (ভাষান্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১), পৃ. ১৪।

১৩. দেবী চ্যাটার্জী: *'মানবাধিকার ও দলিত',* (ভাষান্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা, ক্যাম্প,২০১৪), পৃ. ১৮।

১৪. *তদেব,* পৃ. ১৮।

১৫. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩৭।

১৬. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়: *'জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ',* (কলকাতা, কে. পি. বাগচী, এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮১), পৃ. ২।

১৭. দেবী চ্যাটার্জী: *'পতিত: ভারতের জাতি বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণী দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান',* (ভাষান্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা - ক্যাম্প, ২০০১), পৃ. ১৮।

১৮. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮।

১৯. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৩৮।

২০. দেবী চ্যাটার্জী: *'মানবাধিকার ও দলিত',* (ভাষান্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৪), পৃ. ১৮।

২১. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮।

২২. দেবী চ্যাটার্জী, পতিত: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

২৩. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।

২৪. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৩৯।

২৫. Rup Kumrar Barman: *তদেব,* পৃ. ৪২।

২৬. সুজিত সেন (সম্পা): *'দলিত আন্দোলন: প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ',* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১০),পৃ. ১৭৪।

২৭. সুজিত সেন (সম্পা): *তদেব,* পৃ. ১৭৪।

২৮. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *'পলাশি থেকে পার্টিশান, আধুনিক ভারতের ইতিহাস',* (হায়দ্রাবাদ,ওরিয়েন্টলংম্যান, ২০০৬), পৃ. ৪০৪ ।

২৯. দেবী চ্যাটার্জী: *'মানবাধিকার ও দলিত',* (ভাষান্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৪), পৃ. ৩০।

৩০. *তদেব,* পৃ. ৩০।

৩১. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ৩০।

৩২. *তদেব,* পৃ. ৩১।

৩৩. সুজিত সেন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭৫।

৩৪. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২।

৩৫. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৪২।

৩৬. যূথিকা বর্মা: *'জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্‌মণ(১৮৯৮-১৯৮৮)ও তাঁর সমকালীন উত্তরবং',* (কলকাতা, সোপান, ২০২১), পৃ. ২৭।

৩৭. ভারতের জনগননা ,২০০১।

৩৮. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'আত্মচেতনার উন্মেষ : পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনে পত্র-পত্রিকার অবদান (১৯১০-১৯৭০)',* (বাংলা জর্নাল, খণ্ড-২১, ১৪২২), পৃ. ৭৯।

৩৯. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৯।

৪০. K.S. Singha: *'The Scheduled Castes, revised edition',* (Calcutta, Oxford University Press and Anthropological Survey of India, 1999), পৃ. ৪৮৫।

৪১. N.K Dutta: *'Origin and growth of Caste in India',* (Combined Volume) (Calcutta, Firma KLM Mukhpoadhyaya Pvt. Ltd., 1969), পৃ. ১২৮।

৪২. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ৪৪-৪৫।

৪৩. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৫১।

৪৪. ভারতের জনগণনার তথ্য ,২০০১।

৪৫. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬০।

৪৬. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৪৮।

৪৭. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ.৫।

৪৮. ভারতের জনগণনার তথ্য ,২০০১।

৪৯. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৭।

৫০. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৪৬।

৫১. Government of West Bengal, Short Note on Scheduled Castes of West Bengal,(Kolkata: Cultural Research Institute. Backward Classes Welfare Department, 2005), পৃ. ৬।

৫২. H.H. Risley: The Tribes and Castes of Bengal, Vol.1, reprint edn, (Calcutta: Firma Mukhopadhyay, 1981). পৃ. ১৩৩।

৫৩. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৯।

৫৪. Rup Kumar Barman: *তদেব,* পৃ. ৫১।

৫৫. Government of West Bengal, Short Note on Scheduled Castes of West Bengal, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৫৬. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৫।

৫৭. Census report of India in 2001.

৫৮. Census report of India in 1911.

৫৯. www.wikipedia-https://bn. Wikipedia.org.

৬০. www.wikipedia-https://bn. Wikipedia.org.

৬১.https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE.

৬২. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৫।

৬৩. Rup Kumar Barman: *তদেব*, পৃ. ৫৮।

৬৪. H.H. Risley: The Tribes and Castes of Bengal, Vol.2, পৃ. পৃ. ২৭৫-২৮০।

৬৫. N.K Dutta: *'Origin and growth of Caste in India', প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০।

৬৬. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(CHAPTER TWO)

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দলিত চেতনার বিকাশ

২.১.ভূমিকা: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল ভারতবর্ষের বহুবিধ সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র, ওই শতাব্দীতেই বাংলায় জ্ঞানদীপ্তির সূচনা হয়েছিল বলেই ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। যার অন্যতম ফলাফল ছিল নবজাগরণ বা রেঁনেসা (Renaissance)। আর তাতে রক্ষণশীল থেকে প্রগতিবাদী প্রায় সব ধরনের মতাদর্শের জন্মও হয়েছিল।[১] এবং তাতে বাংলার সমস্ত স্তরের মানুষদের আগ্রহ ছিল বিপুল। যদিও তার পূর্বে অষ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে জাতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মতাদর্শ প্রধানত অ-ধর্মীয় দাবীগুলোকে নিয়ে চর্চিত হতে থাকে। আসলে সেটা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আকার ধারণ করেছিল। নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য দলিত মানুষেরা তাদের অবদমিত ও অবহেলিত অবস্থার প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে তারা দাবী দাওয়া উত্থাপন করতে থাকে।[২] ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন নাগরিক জীবন, শিল্পক্ষেত্র এবং বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক শিক্ষা ইত্যাদি।

২.২. উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দলিত চেতনার বিকাশ

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় জনজীবনে যে জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম অংশ হিসাবে নিম্নবর্ণের মানুষরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। কেননা এতদিন পর্যন্ত নিম্নবর্ণের দলিত মানুষদেরকে ব্রাহ্মাণ্যবাদীরা দলন যা দমন করে এসেছিল। কিন্তু এখন থেকে তারা ওই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করতে গিয়ে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য শূদ্ররা প্রথমেই তাদের প্রধান অধিকার শিক্ষার কথা বিশেষ জোরালোভাবে ঘোষণা করেছিল। কারণ প্রায় কয়েকশ শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণরা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল, ফলে ওই শিক্ষাতে নিম্নবর্ণের মানুষদের কোন অধিকার ছিলনা এবং তা ছিল ধর্মীয় শিক্ষা। কিন্তু ব্রিটিশরা ঊনবিংশ শতকে আধুনিক ও উদারনৈতিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করেছিলেন ভারতীয় সমাজে। যদিও প্রাথমিক পর্বে ওই শিক্ষা উচ্চবর্ণীয় বা বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৩] মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষারগণ্ডি অতিক্রম করতে চাইত না। সেইজন্য তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেননি। অপরদিকে বিশাল সংখ্যক তথাকথিত অস্পৃশ্য, নিম্নবর্ণ, অবদমিত, দলিত শ্রেণীগুলি অর্থনৈতিক কারণে ও পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিরা তাঁদের জ্ঞান ও যুক্তি সম্মত ধারণাকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে কাজে লাগাতে থাকেন এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা তথা ভারতীয় সমাজের দরিদ্র নিপীড়িত নিম্নবর্ণের জাতিগুলির অবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং ওই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া।[৪]

উচ্চবর্ণীয়দের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের হৃদপিণ্ড ছিল বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ (১৮২৮) এবং মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজ (১৮৬৭) যদিও এই আন্দোলনের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তা সত্ত্বেও ওই আধুনিক শিক্ষার সুযোগ নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে কিছু পরিমাণে পৌঁছেছিল। এছাড়া ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হওয়ার পর যখন খ্রীষ্টান মিশনারীরা ওই শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব নিয়েছিল তখন নিম্নবর্ণ ও দলিত জাতিগুলির কাছে তা অনেকাংশে পৌঁছে ছিল বলে দাবি করা যায়।[৫] যার অন্যতম ফল জ্যোতিবাফুলে ও ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের মতো ব্যক্তিকে আমরা নিম্ন জাতির প্রতিনিধি হিসাবে পেয়েছিলাম।

নিম্নবর্ণের মানুষেরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল তখন থেহেই তাদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ লাভ করতে থাকে। ফলে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমূহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং নিজেদের দাবীগুলিকে তুলে ধরতে থাকে। এছাড়া জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রশ্ন করতে পেরেছিল কারণ তাদের আত্মসম্মানের বিষয়টি জড়িত ছিল এবং তার সঙ্গে ধর্মান্তরিত ব্যাপারটিও। সমগ্র ভারতের অসংখ্য নিম্নবর্ণের মানুষেরা ভারতের নানা প্রান্তে বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হওয়ার সাহসও তারা দেখিয়েছিল। যেমন মহারাষ্ট্রের মাহারদের সামাজিক ক্ষেত্রে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার, পুকুরের জল ব্যবহার ইত্যাদি কেরালার পুলায়া, তামিলনাড়ু নাদার, চান্নার, বাংলার নমঃশূদ্র জাগরণ প্রভৃতি।[৬] অস্পৃশ্য ও শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের মত সমান মর্যাদা ও অধিকারের আওয়াজ তুলতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই।

সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি নিম্নবর্ণের দলিত মানুষেরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আন্দোলনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। অস্পৃশ্য দলিত মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তারা ভারতে বর্ণপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে প্রস্ফুটিত করেছিল। আর ওই সমস্ত আন্দোলনে যোদ্ধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন -জ্যোতিবাফুলে (১৮২৭ - ১৮৯০), ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯ - ১৯৭৩), বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১ - ১৯৫৬), শ্রীনারায়ণ গুরু (১৮৫৫-১৯২৮) প্রমুখরা।[৭]

২.৩. সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত চেতনা এবং জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রীঃ)

ভারতে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য দলিত জনজাতিদের জাতিভেদ প্রথা অথবা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান হোতা ছিলেন - মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে।[৮] ১৮২৬ খ্রীষ্টাঙ্গে এক নিম্ন মালী (কুনবী) পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল সামান্য। তা সত্ত্বেও তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাহায্যে সমাজের নিচু জাতির মানুষদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে নিজেকে সমর্পিত করেন।[৯] জ্যোতিবা ফুলে জাতি ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে তাঁর আক্রমণের প্রধান বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। এবং ওইগুলির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী সঞ্চারও করেছেন তাঁর অন্যতম রচনা সম্ভার- ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্মনাঙ্গে কাসব" এতে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদেরকে কিভাবে শোষণ করে তার প্রতিচ্ছবি রয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে "দীনবন্ধু" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে অস্পৃশ্য, শূদ্রদের অধিকার গুলিকে তুলে ধরেন। এবং তাঁর বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থটি হল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "গুলামগিরি" সেখানেও প্রায় একই ধরনের ভারতের

ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের একাধিপত্যের কথাকে সমাজে তুলে ধরেছেন। এছাড়া "চাষীর চাবুক" গ্রন্থটি ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১০]

লেখনী ধারণের পাশাপাশি ফুলের সামাজিক আন্দোলনও সমান গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে তিনি মূলত দুটি ধারার শিক্ষা বিস্তার ও সত্যসাধক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর জনকল্যানকামী আন্দোলনকে তরান্বিত করেছিল। ফুলে প্রথমেই উপলব্ধী করেছেন যে নিম্নবর্ণের মানুষদের ওই দূরবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রথম দরকার তাদের মধ্যে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ। সেইজন্য তিনি প্রথম থেকেই সমাজের সার্বিক শিক্ষা প্রসার লাভে মনোনিবেশ করেছেন।[১১] তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে মহারাষ্ট্রের মাহার, মাঙ্গ, চামার প্রভৃতি মানুষজন তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য অস্পৃশ্য, শূদ্র, নিম্নবর্ণের মানুষ অশিক্ষায় নিমজ্জিত সেইজন্য তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ওই নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। ফুলে নিজ উদ্যোগে ১৮৫০ সালে বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৮৫২ সালে অস্পৃশ্য ছেলে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন।[১২]

নিম্ন সম্প্রদায়ের দলিত মানুষদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রথম সাহস দিয়েছেন ফুলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনগুলি ছিল প্রধানত শহর ভিত্তিক কিন্তু ফুলে উপলব্ধী করেছিল যে ওই আন্দোলন সমূহকে গ্রামের নিম্নবর্ণের অন্দরমহলে পৌঁছে দিতে হবে। তাই তাঁর 'সত্যসাধক সমাজ' আন্দোলন ছিল গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত অস্পৃশ্য মানুষদের জীবনযুদ্ধের সোপান।[১৩] ফুলে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য শূদ্র দলিত মানুষদের নায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এইভাবে তাঁর 'সত্যসাধক' আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। তাঁর সত্যসাধক সমাজ ছিল

প্রধানত ব্রাহ্মণদের সর্বজনিক বিরুদ্ধবাদী সমাজ বা সভা।[১৪] এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে ও সমানাধিকার প্রচার করতে চেয়েছিল। মহারাষ্ট্রের অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনের প্রধান সাধক ছিলেন ফুলে। ফলে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম ভারতের দলিতদের মধ্যে আত্মচেতনার শুরু হয়েছিল।[১৫]

ফুলে ছিলেন অস্পৃশ্য শ্রেণীভূক্ত আধুনিক ভারতের প্রথম বলিষ্ঠ নেতৃত্বস্থানীয় বুদ্ধিজীবি এবং গণতন্ত্রের পুজারী। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাত থেকে নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে রক্ষা করাই ছিল ফুলের জীবনের প্রধান উপজীব্য। যদিও তাঁর শিক্ষা প্রসার, সত্যসাধক আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলি তাঁর মৃত্যুর পর খুব বেশী প্রভাব ফেলতে পারেননি।

২.৪. সাবিত্রীবাঈ ফুলে (১৮৩১-১৮৯৩ খ্রীঃ)

উনবিংশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সার্বিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল। এবং উক্ত সময়েই ভারতে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার আর্বিভাব ঘটেছিল। যদিও প্রথমে তাছিল শাসকের প্রয়োজনে সাহায্যকারী হিসেবে।[১৬] ফলে মিশনারিদের হাত ধরেই ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় গুলিতে উচ্চ বর্ণীয় সন্তানদের প্রাধান্য ছিল অধিক মাত্রায়। সেখানে দলিত শূদ্র অস্পৃশ্য ছেলেদের স্থান ছিল নগণ্য আর নিম্নবর্নীয় দলিত মেয়েদের স্থান নেই বললেই চলে।[১৭] ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে জ্যোতিবা ফুলের পত্নী হিসাবেই বেশি

পরিচিতি পায়। জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন মহারাষ্ট্রের নিম্ন বর্ণীয় দলিত আন্দোলনের প্রধান হোতা। এই পরিচিতির বাইরেও সাবিত্রীবাঈ ফুলের নিজস্ব একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিচিত রয়েছে। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক,, শিক্ষাবিদ, ভারতীয় নারীদের সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী।[১৮] ভারতীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেলে দেখা যায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমূখরা যতটা স্থান দখল করে রয়েছে সেখানে জ্যোতিবা ফুলে, শ্রীনারায়ণ গুরু, বি আর আম্বেদকরের স্থান অনেক কম। আর সাবিত্রীবাঈ ফুলের সার্বিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস ঐতিহাসিক গ্রন্থে অতি সংকীর্ণ স্থান।[১৯] তাই বর্তমান সময়ে সঠিক ইতিহাস রচনার সময় এসেছে এবং সর্বসমক্ষে তুলে ধরার সময় হয়েছে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে নারী মুক্তির আন্দোলনে যে কয়েকজন মহিয়সী মহিলা অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে।

তারাবাহিক শিন্ধে, পন্ডিতা রমাবাই প্রমূখ তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। সাবিত্রীবাঈ ফুলে ছিলেন মহারাষ্ট্রের নিম্নবর্ণীয় মালি পরিবারের দলিত সন্তান। মহারাষ্ট্রের মালিদের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ ও ফুলের চাষ করা। তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা ছিল নিষিদ্ধ। তৎকালীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার নওগাঁতে ১৮৩১ সালের ২৩ শে জানুয়ারি সাবিত্রীবাঈ এর জন্ম হয়। তার পিতা ছিলেন খান্ডজি নেভেশে পাতিল মাতা ছিলেন লক্ষ্মীবাঈ।[২০] তাঁদের ছিল একমাত্র কন্যা সাবিত্রীবাঈ এবং আরো তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। তারা হলেন সিদুজি, সখা রাম ও শ্রীপতি। খান্ডোজি নেভেসে

পাটিলের পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও পরিচিতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২১] সাবিত্রীবাঈ ফুলের পিতা খান্ডজি পাটিল ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাদের সাতারাতে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তিনি সমাধান করতেন। দিন দরিদ্র নিম্ন বর্ণ অস্পৃশ্য মানুষদের তিনি সর্বদাই সহায়তা করতেন। তিনি ছিলেন বিশেষ পরিশ্রমী। তাই তার পরিবারে কোনদিন অর্থাভাব দেখা দেয়নি। তাদের পরিবার সচ্ছল স্বাচ্ছন্দেই কাটত।[২২] এতদসত্বেও সাবিত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কারণ তারা নিম্নবর্বণীয় এবং মেয়ে। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল লেখাপড়া শেখার।

একদা সাবিত্রী একটি ইংরেজি বই হাতে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন কিন্তু তার পিতা সেটি দেখতে পেয়ে তার উপর ক্ষুন্ন হয়েছিল। তাসত্ত্বেও সাবিত্রী জানত না যে তার লেখাপড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। সেই সময়কার সামাজিক প্রথা হিসেবে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সাবিত্রীর পরিবারও ১৮৪০ সালে যখন তার মাত্র ৯ বছর বয়স জ্যোতিবা ফুলে নামে ১৩ বছরের বালকের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল।[২৩] স্বামী জ্যোতিবা ফুলের বাড়িতে জ্যোতিবার নিজের কাছে সাবিত্রীবাঈয়ের শিক্ষা জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল। যদিও জ্যোতিবা ফুলেরও তখন প্রথাগত শিক্ষা খুব বেশি দূর ছিল না প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছিল মিশনারি স্কুলে। তা সত্ত্বেও স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলের শিক্ষায় আগ্রহ দেখে তারপর পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন।[২৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারীর শিক্ষা ছিল আকাশ কুসুম ভাবনা। তৎকালীন সময়ে “হিন্দুরা যেমন মনে করতেন কেতাবি বিদ্যা মেয়ের অকাল বৈধব্য ডেকে আনবে,

মুসলমানেরা ভাবতেন পর্দার খেলাফ হবে"।[২৫] তাই তিনি প্রথমে লুকিয়ে বিদ্যা চর্চা করতেন। সাবিত্রীবাঈ ফুলের লেখাপড়ার চর্চার খবর উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা জানতে পারলে তাকে সমাজ চ্যুত করা হবে। জ্যোতিবা ফুলে এই সব জানতেন তা সত্ত্বেও স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ স্কুলের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। ফলস্বরূপ তাদেরকে এক সময় পরিবার ও সমাজ চ্যুত হতে হয়েছিল। বহু বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাকে আশ্রয় করে এই ফুলে দম্পতির জীবন তরী এগিয়ে গিয়েছিল। একসময় পুণের মিসেস মিচেল এর নরমাল স্কুলে সাবিত্রী ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর আহমেদনগরের মিসেস ফারহার এর মার্কিন মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা করে শিক্ষিকা হওয়ার ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি আধুনিক ভারতের প্রথম শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[২৬]

নতুন ভারত গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় নারীদের সার্বিক উন্নয়ন। প্রাথমিক পর্বে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত কিছু ব্যক্তি নারী শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওই ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি তবে কিছু খ্রিস্টান মিশনারী ব্যক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচে ভারতে নারী শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[২৭] উনবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষার বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে নারী শিক্ষার বিস্তারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রধানত তিনটি গোষ্ঠীর মানুষ। প্রথমত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষীয় পুরুষ সমাজ সংস্কারক, এবং শিক্ষিত ভারতীয় নারীগণ।[২৮] ভারতীয় নারীদের মধ্যে যার নাম

সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। তার জীবন শিক্ষাব্রতী (নারী শিক্ষা সংস্কার), লেখিকা এবং সমাজ সংস্কারক রূপে অতিবাহিত করেছিলেন। তার এই শিক্ষিকা ও সমাজ সংস্কারক হয়ে ওঠার পেছনে যে দুজনের অনুপ্রেরণা ছিল সগুনাবাঈ ক্ষৌরসাগর এবং তার স্বামী জ্যোতিবা ফুলের।[২৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে যেখানে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার কথা চিন্তা করলেও বাস্তবায়িত করতে পারেনি। সেই সময় এক নিম্নবর্ণীয় মহারাষ্ট্রের দলিত নারী সাবিত্রীবাঈ ফুলে আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন। এটিকে একটি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।[৩০] সাবিত্রীর জ্যোতিবার হাত ধরে যেমন শিক্ষা গ্রহণ তেমনি শিক্ষিকা হিসাবেও জীবন শুরু করেছিলেন তার স্বামীর ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসাবে। পুনের বিশ্রাম বাগ ওয়াদাই তত্তসাহ ভিডে নামক ব্যক্তির গৃহে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি একটি বেসরকারি বিদ্যালয়। সূচনা লগ্নে নয় জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিলেন সকলেই ছিলেন নিম্নবর্ণীয় দলিত সন্তান। ওই বিদ্যালয়ের ওপর দুইজন শিক্ষিকা হলেন ফতিমা বিবি এবং সগুনাবাঈ।[৩১]

উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে তথা পুনেতে নারী ও শূদ্র জাতির শিক্ষাদানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ কাজ ছিল না। তাসত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে নারী ও শূদ্র জাতির শিক্ষা প্রসারে জ্যোতিবা ফুলে এবং সাবিত্রীবাঈ ফুলে অনেকটা সফলতা পেয়েছিলেন বলা যায়। তৎকালীন সময়ে বোম্বাইয়ের রাজর্ষি মামা পরমানন্দ জ্যোতিবা ফুলে এবং সাবিত্রীবাঈ ফুলের এই শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন সম্পর্কে উদ্ধৃতি

করেছিলেন যে "তারা উভয়ে ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী"।[৩২] সাবিত্রীবাঈ ফুলের শিক্ষা আন্দোলন ছিল তিনি নিজে ছাত্রী অপরদিকে শিক্ষিকা হিসাবে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার সেই আন্দোলনে বাধা ছিল পর্বত সমান। সাবিত্রীবাঈ ফুলে শত বাধা পেরিয়েও নিজে যেমন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তেমনি নিম্ন বর্ণের মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারের আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। সাবিত্রীবাঈ ও জ্যোতিবার উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে ৩রা জুলাই ১৮৫১, ১৭ ই নভেম্বর ১৮৫১, এবং ১৫ ই মার্চ ১৮৫২ সালে এই তিনটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওই তিনটি বিদ্যালয় গুলিতে প্রায় দেড়শ ছাত্রী পড়াশোনা করতেন। ক্রমান্বয়ে তাদের প্রচেষ্টায় স্কুলের সংখ্যা ১৮ টিতে পৌঁছেছিল। কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষা নয় নিচু জাতির শুদ্র এবং অতি শূদ্র সম্প্রদায়ের জন্যেও বিদ্যালয প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফুলে দম্পতি উপলব্ধি করেছিলেন যে নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। তখন জ্যোতিবা ফুলের সাথে সাথে সাবিত্রীবাঈ ফুলেও নিম্ন জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করেছিলেন।[৩৩]

সাবিত্রী দেবীর উপলব্ধি ছিল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান যেমন মানুষের মৌলিক চাহিদা। তেমনি শিক্ষাও মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। তিনি শিক্ষাকে পাঠ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে বন্দি রাখলেন না। যাতে মানুষের চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটতে পারে এবং চরিত্রবান হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়েও তৎপর ছিলেন। সেই জন্য তিনি ছাত্রীদের বাড়ির অভিভাবক অভিভাবিকা দের সাথেও সুসম্পর্ক তৈরি করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[৩৪]

ফুলে দম্পতি প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। তারা মনে করতেন শিশু বয়সে, সঠিক শিক্ষা দান করতে পারলে তাদের জীবন গঠনে সহজ হবে। জ্যোতিবা ফুলের মত সাবিত্রী দেবীও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ মানতেন না। ধর্ম জাতি লিঙ্গ তারা বিচার করতেন না। সবার মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে এটাই ছিল সাবিত্রী দেবীর প্রধান লক্ষ্য।

ফুলে দম্পতি নারী ও শূদ্র জাতির শিক্ষা বিস্তারে প্রধান অবদান ছিল। তাদের ওই অবদান একটি নতুন দর্শন কাজ করছিল। সেই দর্শনের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো এবং তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিবা ফুলে মন্তব্য করেছেন যে-

“বিদ্যা ছাড়া মতি নাই

মতি ছাড়া নীতি নাই

নীতি ছাড়া গতি নাই

গতি ছাড়া বিত্ত নাই

বিত্ত ছাড়া শুদ্র ভাই

বিদ্যা ছাড়া মুক্তি নাই”।[৩৫]

ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্কুল পালাতে না পারে এইদিকে সাবিত্রী দেবী প্রথম থেকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। নিম্ন সম্প্রদায়ের গরিব পরিবারের ছেলে মেয়েদের বৃত্তি প্রদানের

ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং পড়াশোনাতে যাতে ছেলেমেয়েরা মনোযোগ দিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি পাঠক্রম তৈরি করতেন।[৩৬]

শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি সাবিত্রী দেবী লেখিকা হিসাবেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং সেই সব লেখালেখির মাধ্যমে সমাজের সমস্ত বর্ণের মানুষকে শিক্ষা অর্জন করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে। "কাব্যফুলে" নামে কবিতার বই এখানে ৪১টি কবিতা রয়েছে। এগুলির বেশির ভাগই তাঁর জীবনী গ্রন্থ ইতিহাস ও সমাজের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত। এছাড়া এই গ্রন্থে সাম্য স্বাধীনতা ও মানবিকতার কথা এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন।[৩৭] তার লেখাগুলি প্রধানত মারাঠি ভাষায় রচিত। সেই সমস্ত লেখাগুলির মধ্যে সমাজে শিক্ষা কতটা প্রয়োজনীয় তা তিনি প্রকাশ করেছেন -

"যাও শিক্ষা নাও

স্বনির্ভর হও, পরিশ্রমী হও,

কাজ কর, শিক্ষা নাও, বৃত্তশালী হও।

বিদ্যা ছাড়া সব নষ্ট

জ্ঞানহীন মোরা পশু

কর্মহীন আর নয়, যাও শিক্ষা নাও।

শেষ কর দুঃখ কষ্ট বঞ্চিতজনের।

আছে শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ,

ভাঙ্গো জাতির শৃংখল।

ফেলে দাও ব্রাহ্মণের শাস্ত্র তাড়াতাড়ি”।[৩৮]

ওই সমস্ত লেখালেখির মধ্য দিয়ে সাবিত্রী দেবী তাঁর শিক্ষা আন্দোলনকে একটি দর্শনে পরিপূর্ণ করেছিলেন। যেমন তিনি মনে করতেন নিম্ন সম্প্রদায় তথা সার্বিকভাবে মানুষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে। এবং সেই জ্ঞান বাস্তববাদীমানুষ তৈরি করবে। তাঁর দর্শন ভারতবাসী তথা ভারতীয় সমাজকে নতুন সমাজ তৈরি করে নতুন ভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। এভাবেই সাবিত্রীবাঈ ফুলে দলিত সম্প্রদায় তথা সব সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জলন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই অবদান ভারতীয় শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে চির স্মরণীয়।

২.৫. শ্রীনারায়ন গুরু (১৮৫৫-১৯২৮ খ্রীঃ)

দক্ষিণ ভারতের কেরালায় সামাজিক সংস্কার ও মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিল এরাওয়ারা, যা পরবর্তী সময়ে সেখানকার কাম্মালার, চেরুমার, নায়াডির ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। এরাওয়ারা ছিল সবচেয়ে পশ্চাদপদ ও অস্পৃশ্য শ্রেণীভূক্ত। দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য দলিতদের সংগ্রামের পুরোভাগের প্রধান কান্ডারী ছিলেন শ্রী নারায়ণ গুরু (১৮৫৫-১৯২৮)। ১৮৫৫ সালে ত্রিবান্দ্রমের কাছে

তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত, তামিল ও মালায়ালম ভাষাগুলিকে বিশেষ দক্ষতার সাথে আত্মস্থ করেছিলেন।[৩৯] শ্রীনারায়ণও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পূর্বসূরীদের ন্যায় হাতে লেখনী ধারণ করেছিল। তাঁর রচনাগুলি রহস্যাত্মক ও নানান ধর্মীয় কাব্যগুণ দ্বারা পরিপূর্ণ। তিনি অস্পৃশ্য দলিত এরাওয়ারাদের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দের ন্যায় পরিভ্রমণ করে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। যদিও তাঁর সামাজিক আন্দোলনের তেমন কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা না থাকলেও দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য নিপীড়িত মানুষদের গণতান্ত্রিক চেতনা ও বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।[৪০]

শ্রী নারায়ণ গুরু মনে করেন সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনে দেবতা ও মন্দিরের সবিশেষ প্রভাব থাকে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে ভারতের অস্পৃশ্য জাতিদের মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ ছিল তাই তিনি তাদের ওই অধিকার ফিরিয়ে দিতে বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁর ওই কাজকে সুনজরে গ্রহণ করেননি। তিনি প্রধানত সমস্ত ধর্মের মূলগত এবং জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শ্রীনারায়ণ ছিলেন গভীর মানবতাবাদী । তিনি সম্প্রদায় বলতে কোন বিশেষ নির্দিষ্ট জাতকে বুঝতেন না তিনি বুঝতেন বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিকে। দক্ষিণভারতে এরাওয়ারা তথা সমগ্র অস্পৃশ্য অবদমিত জাতিকে সচেতন ও আত্মচেতনার বিকাশে বলীয়ান করে তুলতে শ্রীনারায়ণের অবদান ছিল অসামান্য।

২.৬. ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩ খ্রীঃ)

বর্ণ হিন্দুদের (ব্রাহ্মন্যবাদ) বিরুদ্ধে জ্যোতিবা ফুলে কর্তৃক পরিচালিত যে দলিত আত্মচেতনার সংগ্রাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ ভারতে তা এক বৃহত্তর রূপ ধারণ করেছিল। আর ওই সব সংগ্রামে একের পর এক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ই.ভি. রামস্বামী। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভূমিতে ভেল্লালারা শূদ্র হিসাবে বিবেচিত হত এবং সেখানেও তাদের উপর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বোঝায় ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সবকিছু ওই উচ্চবর্ণীয়দের দখলে ছিল সেইজন্য উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের সূচনাতে দক্ষিণ ভারতেও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। আর ওই ক্ষোভের প্রথম মাধ্যম ছিল ১৯১২ সালের 'দ্রাবিড় সমিতি' (Drabid Samiti) ও ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাস্টিস পার্টি (Justis Party)'।[৪১] পরবর্তীকালে ই. ভি. রামস্বামী দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্য শূদ্রদের কাছে মহামানব হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৮৭৯ সালে দক্ষিণ ভারতের পেরিয়ার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছিনেল এবং তামিল শূদ্রদের প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে তাঁর অবদান ছিল চিরস্মরণীয়।

ভারতের দরিদ্র নিপীড়িত, অস্পৃশ্য ও শূদ্রদের জন্য রামস্বামী সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তামিল শুদ্রদের উন্নতিকল্পে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতিকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ১৯২৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলনে যোগদান করেন।[৪২] তিনি সামাজিক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনকে একই সূত্রে গথিত করতে চেয়েছিলেন। রামস্বামী দক্ষিণ ভারতের নিম্নজাতিদের করুণ অবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ,কংগ্রেস ও হিন্দু ধর্মকে

একযোগে দায়ী করেছেন। এছাড়া তিনি অনেক সময় মূর্তিপূজা ও ইশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন।[৪৩]

২.৭. বি .আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রীঃ)

জ্যোতিবা ফুলের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অস্পৃশ্য নেতার মৃত্যুর পর ভারতীয় অস্পৃশ্যদের আত্মচেতনার তথা দলিত মুক্তি আন্দোলনের গতি কিছুটা পরিমাণে শ্লথ হতে থাকে যদিও বি.আর. আম্বেদকরের (১৮৯১-১৯৫৬) আবির্ভাবের ফলে ওই আন্দোলন পুরো মাত্রায় অক্সিজেন পেয়ে গতিময় হয়ে উঠেছিল। আধুনিক কালে ভারতের জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সর্বোচ্চ শিখরে আরহোন করেছিল বি.আর.আম্বেদকরের নেতৃত্বে।অস্পৃশ্যরা আম্বেদকরের মধ্যে এমন একজন সংগ্রামী মানবতাবাদী সাধককে খুঁজে পেলেন যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্ণ বিদ্বেষী আন্দোলনে তাঁর প্রধান হাতিয়ার হল একদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধি এবং অপরদিকে জাত ব্যবস্থার দ্বারা নিজের জীবনের লাঞ্চিত হওয়ার তপ্ত করুন অভিজ্ঞতা।[৪৪] ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নানাপর্বে এই প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল তার এক উল্লেখযোগ্য পথিকৃত হলেন বি.আর. আম্বেদকর। তাঁর এই চিন্তাভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে যে তিনজন মহামানবের প্রভাব সর্বাধিক তাঁরা হলেন গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩-৪৮৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং কবির (১৩৯৮ - ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)।[৪৫]

এছাড়া পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক ধারনার সংমিশ্রণের মাধ্যমে আম্বেদকরের চিন্তা ভাবনার বিকাশ লাভ করেছিল। বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রেও আম্বেদকর পশ্চিমী জন ডিউই, এডউইন রবার্ট এ্যন্ডারসন, জন মেনার্ড নিনেস, বাট্রান্ড রাসেল ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৪৬]

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দার্শনিক প্রভাবে আম্বেদকর তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনকে একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজ দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত বিচারের উপর সমস্ত বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা এবং অযৌতিক অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলক কুসংস্কার গুলিকে পরিত্যাগ করা।[৪৭] এইভাবে আম্বেদকর ১৯১৯ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে পদার্পন করেন, যদিও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর বৃহত্তর উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল ১৯২৭ সালে 'মাহার সত্যাগ্রহ'[৪৯] বিভিন্ন মতাদর্শে উদ্বেলিত আম্বেদকরের মহারাষ্ট্রের মাহার অস্পৃশ্য তথা সমগ্র ভারতের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে মুক্ত করার জন্য "তিনি উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে—ঐ অযৌক্তিক প্রাচীন জাত ব্যবস্থা চিরকাল সমাজে স্থায়ী হতে পারে না। কারণ এই পৃথিবীতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, কোন কিছুই বিবর্তনের উর্দ্ধে নয়। তিনি বলেন –"There is nothing fixed nothing eternal, nothing sonatan, that everything is changing, that change is the law of life for individuals as well as for society"[৪৯] এই ধারণার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে একটি আর্দশ ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার প্রধান ভিত্তি হবে, স্বাধীনতা, সাম্য সৌভাতৃত্ব।এর থেকে বোঝা যায় যে অস্পৃশ্য,দলিত ও অবহেলিত

সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নতির জন্য আম্বেদকর ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। এছাড়া তিনি বলেন 'জাতির স্বরাজের চেয়ে আমাদের নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি ছিল প্রধান লক্ষ্য।[৫০]

আম্বেদকর ছিলেন প্রবল সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী। তিনি প্রথমেই সমস্ত অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা অনুভব করেছিলেন সেইজন্য তিনি বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা করতেন এবং আম্বেদকরও অন্যান্যদের মতো হাতের কলমটিকে আমৃত্যু শানিত করেছিলেন। তিনি 'মূক নায়ক' (১৯২০), 'বহিস্কৃতভারত (১৯২৭), 'জনতা', 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি প্রকাশ করতেন। 'বোম্বাই পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি' (১৯৪৫), 'ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি' (ILP) (১৯৩৬) ইত্যাদি এইসব কার্যকলাপের ফলে অস্পৃশ্যতা এবং আর্থসামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের দ্বারা আম্বেদকর ভারতের দলিতদের মানবিক দাসত্ব ও হাত থেকে মুক্তি দিতে তিনি ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট।[৫১] আম্বেদকরের জীবনে সবচেয়ে মহত্তম ও বৃহত্তম আন্দোলন পালন হল ১৯২৭ সালে 'মাহার সত্যাগ্রহ'। এটি ছিল মাহার দলিতদের সচেতন ও স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রাম। এখানে তিনি মনুস্মৃতি গ্রন্থটি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ এটি ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শে পরিপূর্ণ গ্রন্থ। ১৯৩৪ সালে আম্বেদকর মন্দিরে প্রবেশের নিষ্ফলতার ব্যাপারে নাসিকের অস্পৃশ্য সত্যাগ্রহীদের অবহিত করেছিলেন। তিনি বলেন ভারতীয় হিন্দু সমাজ ও ধর্মীয় দর্শনকে পুরোপুরি নব-রূপ দিতে হবে এবং আম্বেদকর অস্পৃশ্য দলিতদেরও বলেন তারা যেন তাদের শক্তি ও সম্পদকে রাজনীতি ও শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত করে।[৫২] আম্বেদকর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি জাতি আধিপত্যের তত্ত্বকে খন্ডন করতে এবং শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের উৎপত্তি ও বিকাশের কথা তুলে ধরতে বহু গ্রন্থ রচনা

করেন। যেমন -'শূদ্র কারা ' (১৯৪৬), 'অস্পৃশ্য কারা এবং তারা কেন অস্পৃশ্য হল '(১৯৪৮), 'জাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি' ইত্যাদি ভারতের অস্পৃশ্যদের সংগঠিত করে সংগ্রামের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের কাছেও অস্পৃশ্যদের সমস্যাগুলি উদথাপন করেন এবং তাদের সঠিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীগুলি আদায় করতে সচেষ্ট হন। সংবিধান সভাতে তিনি যেমন সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের প্রতিভার পরিচয় রাখেন তেমনি আবার ভারতের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা হিসাবেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম তা সর্বজনবিদিত।[৫৩]

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ মানবিক অধিকার অর্জন এবং আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আম্বেদকর ভারতের অস্পৃশ্য, শূদ্র, দলিতদের মানসিক দাসত্বের বন্ধন ও জাত ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি দিতে অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন।

২.৮. বাংলার দলিত চেতনায় উল্লেখযোগ্য মনীষীগন

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আগমন এবং শাসক হিসাবে তাদের স্থায়ীত্বলাভ ভারতীয় সমাজ জীবন, আর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সার্বিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় আন্দোলন, বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন এবং দলিত মুক্তি আন্দোলনকেও প্রবলভাবে তরান্বিত করেছিল। এবং তার উত্তাল হাওয়া বাংলার প্রত্যন্ত স্তরেও যেখানে অস্পৃশ্য, দলিত নিম্নজাতির মানুষেরা বসবাস করত।[৫৪] নিম্নবর্ণের মানুষেরাও ঐ বায়ুতে প্রাণ ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। ইংরেজরা যেমন ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা

করেছিল ব্রাহ্মণরাও তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী নিম্নবর্ণ অস্পৃশ্য শূদ্রদের উপর 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' কে চাপিয়ে দিয়েছিল যাকে আমরা 'জাতিভেদ প্রথা' রূপ মান্যতা দিয়ে আসছি।[৫৫] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দলিত আন্দোলন খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও জাতিগত অবমাননার বিরুদ্ধে আত্ম চেতনার বিকাশকে প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাতেও দলিত আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে।[৫৬] তবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে জাতিগত আন্দোলনও সংগঠিত হতে থাকে। যেমন- প্রধানত নমঃশূদ্র আন্দোলন, পৌণ্ড্র, রাজবংশী ইত্যাদি জাতির মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার সমূহকে প্রতিষ্ঠা করতে তারা তৎপর হয়েছিলেন।

২.৯. হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮):

আনুমানিক দেড় হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে হাজার খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আর্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই ধর্মে যাগযোগ্য এবং পৌতলিকতা ও আরম্বর সর্বস্বতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ ওই ধর্মের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিবাদী আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। ফলস্বরূপ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত বর্ষ জুড়ে বহু প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান ঘটেছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম আজীবক ধর্ম ইত্যাদি।[৫৭]

এই ধর্ম গুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম। এই দুই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। তারা কেউই ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র মানতে রাজি ছিলেন না। প্রাচীন ভারতে গৌতম বুদ্ধই প্রথম হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা তথা বর্ণভীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যদিও তার ধর্ম খুব বেশিদিন ভারতবর্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি।[৫৮] এর বহু পরবর্তীকালে মধ্যযুগের বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৮)। তিনি তৎকালীন দলিত, নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ নাম এবং প্রেম ভক্তি প্রচারের মধ্য দিয়ে সারা বাংলায় আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তার আন্দোলনের উপরেও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের অত্যাচার নেমে এসেছিল।[৫৯] সেই সময় বাংলার অসংখ্য অত্যাচারিত মানুষজন খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রায় ৪০০ বছর পরে আধুনিক ভারতের দলিত অত্যাচারিত নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজনকে ধর্মান্তরের হাত থেকে রক্ষা করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর।[৬০] হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বে যে সমস্ত মনীষীগণ অবিভক্ত বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা প্রধানত ব্যক্তি সাধনা বা ব্যক্তি মুক্তির কথা প্রচার করেছিলেন। বাংলার অসংখ্য অত্যাচারিত মানুষের বা সমষ্টিগত মুক্তির কথা প্রচার করেননি। যেমন গৌতম বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যদেব এরা নিজেদের মুক্তির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলার অসংখ্য নিপীড়িত মানুষজনকে সংসারের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি মুক্তি বা ব্যক্তি সাধনার কথা প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনি নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি হরিনাম সংকীর্তন এর মধ্যে দলিত মানুষজনকে মুক্তির পথ

দেখিয়েছিলেন বা মাতোয়ারা করে তুলেছিলেন। সেজন্যই তার প্রচারিত ধর্ম পরবর্তীকালে মতুয়া ধর্ম নামে পরিচিতি পায়।[৬১]

ইতিহাস পাঠের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানত দুইটি রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা শুনে থাকেন। ইতালির নবজাগরণ তথা ইউরোপীয় নবজাগরণ এবং বাংলার নবজাগরণ। যদিও শিক্ষক এবং গবেষক শ্রী দিলীপ গায়েন মহাশয় তাঁর "*ভারতীয় মূলনিবাসী বহুজন সমাজে নবজাগরণ আন্দোলনের অগ্রদূত হরিচাঁদ ঠাকুর*"[৬২] গ্রন্থে ভারত তথা বাংলায় প্রধানত তিন ভাবে তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক তথা ব্রিটিশ ভারতে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে বেদ ও বেদান্ত কে অবলম্বন করে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তা হিন্দু নবজাগরণ নামে অতি পরিচিত। এই আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে ছিলেন বাংলার বাঙালি সন্তান রাজা রামমোহন রায়।[৬৩] একইভাবে ভারতীয় মুসলমান সমাজেও রেনেসাঁর অগ্রদূত ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ এবং সৈয়দ আহমেদ খান প্রমুখ। এবং ভারতবর্ষের আদি নিবাসী দলিত তপশিলি বহুজন সমাজে নবজাগরণ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর।[৬৪] নবজাগরণ আন্দোলনের প্রধান মানদন্ড হিসেবে আমরা জানি যুক্তিবাদী জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাস প্রসার। সেই জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলার অসংখ্য অশিক্ষিত নিপীড়িত দলিত মানুষের মধ্যে যে ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেছিল অচিরেই তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। আর সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাকে তিনি এই বহুজন সমাজে প্রসার করতে চেয়েছিলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক সময়ে যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম আন্দোলন প্রচারের সঙ্গী ছিলেন তারা অবিভক্ত বাংলার ওড়াকান্দি তার পাশাপাশি অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে দিতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের "বারো জন সঙ্গীকে একত্রে হরিচাঁদের পার্ষদ বা দ্বাদশ পাগল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে"।[৬৫] এই বারো জন হলেন গোলক, মৃত্যুঞ্জয়, তারক, দশরথ, মহানন্দ, হীরামন, বদন, লোচন, রামচাঁদ, গোবিন্দ, বুদ্ধিমন্ত এবং জয়চাঁদ। এরাই হরিচাদের ভাবাদর্শ এবং ধর্মমত নাম সংকীর্তন এর মাধ্যমে প্রচার করতেন।[৬৬] যদিও হরিচাদের নেতৃত্বে সেই সময় শিক্ষা বিস্তার খুব একটা হয়নি। কারণ তিনি পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং সমাজের মধ্যে বৈষম্য দূর করার উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার নিম্ন বর্ণের মানুষদেরকে বলতেন "হাতে কাম, মুখে নাম "। এছাড়াও অতি নিয়ে আরো বারোটি নিয়মবিধি পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই ১২ টি পালনীয় বিধি হল১) সত্য বলিবে ২) সৎ পথে চলিবে ৩) পিতা মাতাকে সম্মান করো ৪) ভাই বোন স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকো ৫) এক স্বামী বা এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো ৬) সব মানুষকেই আত্মীয় বিবেচনা কর এবং কারো প্রতি কোনো বৈষম্য করো না ৭) গাহস্থ জীবনে মনোযোগ দাও সন্ন্যাস অবলম্বনে কোন প্রয়োজন নেই ৮) দীক্ষা নিও না ৯) কোন গুরুর প্রয়োজন নেই ১০) তীর্থস্থানে যেওনা ১১) অপরের দুঃখ দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করো ১২) সব জীবের প্রতি সদয় হও।[৬৭] এই তালিকায় গুরুচাঁদ ঠাকুর তিনি বেশ কিছু বিধি নিয়ম যুক্ত করেছিলেন যেমন১) শিক্ষা বিস্তার ২) সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ৩) জাতিভেদ সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ৪) গণস্বাস্থ্য ও পরিবেশ

রক্ষা ৫) স্ত্রী শিক্ষা ও নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি ৬) ধর্মীয় ও বিবাহের রীতিনীতি সংস্কার।[৬৮]

২.১০. গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭):

ঔপনিবেশিক অবিভক্ত বাংলায় ফরিদপুরের গুরুচাঁদ (১৮৪৬-১৯৩৭) ঠাকুর ছিলেন দলিত আত্মচেতনা ও সমাজ জাগরণের প্রাণপুরুষ। বাংলার নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্র (চণ্ডাল) কাপালী, পৌন্ড্র, মালো ও মুচিদের নিয়ে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মতুয়া আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, যদিও ওই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল নমঃশূদ্ররা।[৬৯] গুরুচাঁদ ঠাকুরের পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) কর্তৃক প্রবর্তিত এই মতুয়া আন্দোলনকে একটি ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে মনে হলেও এই আন্দোলনে প্রধান উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক,সাস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।[৭০] ১৮৪৬ সালে ফরিদপুর বর্তমানের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর এই আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব গুরুচাঁদের উপর অর্পিত হয়েছিল। এইজন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বাংলার দলিত রেনেসাঁ বা দলিত আত্ম জাগরণের জনক বলে চিহ্নিত করা যায়।[৭১] হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর নিম্নবর্ণের মানুষদের উন্নতিসাধনে প্রথমে শিক্ষাবিস্তার এবং কতকগুলি উপদেশ পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। গুরুচাঁদের উদ্যোগেই ১৮৮১ সালে খুলনাতে প্রথম নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে নিম্নবর্ণের মানুষের উপস্থিতি ছিল সর্বাধিক তাদের অগ্রগতির জন্য তিনি বলেন শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান হতে। নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্রদের পূর্বের চণ্ডাল পরিচয় থেকে মুক্তি

পাওয়ার জন্য তারা উচ্চ অবস্থানের ক্ষেত্রে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ওই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন গুরুচাঁদ। এই আন্দোলনের তীব্রতার ফলে ১৯১১ সালে আদমসুমারীতে তাদের নমঃশূদ্র হিসাবে সরকারী সিলমোহর দেওয়া হয়েছিল।[৭২] দলিত নমঃশূদ্রদের মর্যাদাবোধ বিকাশ লাভে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং সভা সমিতিরও বিশেষ অবদান ছিল। যেমন ১৯১০ সালে 'নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র সংস্থা', ১৮৯৫ সালে বিভিন্ন সম্মেলন হয়েছিল। বাংলার নানা প্রান্তে। ১৯২২ সালে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকাটিও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭৩]

নমঃশূদ্র সমাজের বিভিন্ন জনকল্যাণকামী কাজ বাংলার অন্যান্য নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য, শূদ্র, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে তুলতে থাকে। ফলে বাংলার বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের চিন্তা নায়কদের আবির্ভাব হয়েছিল। যেমন- পৌণ্ড্র সমাজের শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ (১৮৬৩-১৯০৭), বেণীমাধব হালদার (১৮৫৮- ১৯২৩), রাইচরণ সরদার (১৮৭৬-১৯৪২), মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬-১৯২৮) এবং রাজবংশী সমাজে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা (১৮৬৬-১৯৩৫), উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭৪] প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ব্রাক্ষণ্যবাদীদের রক্ষণশীল মনোভাবকে অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক আধুনিক কালের শিক্ষা আমাদের সমাজের সমস্ত বর্ণের ও বর্গের মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকে। সেই সূত্রে পৌণ্ড্র সমাজের মানুষজনও বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে তারা শিক্ষার আলোতে বিকশিত হতে থাকে। যেমন- পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম প্রবেশিকা পাস ব্যক্তি হলেন শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ। তিনি ওইজাতির উন্নয়নে নিজে বিশেষ আগ্রহহী হয়ে হাতে লেখনী ধারণ করেন। তাঁর

রচিত গ্রন্থগুলি ‘জাতিচন্দ্রিকা’ (১৮৮৭), ‘ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়' (১৮৮৭) প্রভৃতি। গ্রন্থগুলিতে পৌণ্ড্রদের অবজ্ঞাসূচক ‘পোদ’ নামকরণ থেকে মুক্তির জন্য উক্ত গ্রন্থগুলি রচনা করেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ত্ব পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন।[৭৫]

পৌণ্ড্রদের আত্মচেতনাতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার পৌণ্ড্রদের সমাজ পিতা হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ঠ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বেণীমাধব প্রথমেই পৌণ্ড্রজাতির ইতিহাস রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। সেই জন্য ১৮৯৩ সালে 'জাতি বিবেক' রচনা করেন।[৭৬] 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি'ও স্থাপন করেন। ওই সমস্ত গ্রন্থ সভা সমিতির দ্বারা তিনি পৌন্ড্রদেরকে শিক্ষার আলোকবর্তিকা গ্রহণ করতে বলেন এবং তাদেরকে আত্মমর্যাদা বোধে উন্নীত হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান করেন।

নিম্নবর্ণের অনুন্নত পৌণ্ড্রজাতির আত্মচেতনার জাগরণে এক অন্যতম বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হলেন মহেন্দ্রনাথ করন (১৮৮৬-১৯২৮)। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শ্রীকরণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন পৌণ্ড্রদের জন্য তারমধ্যে পৌণ্ড্রদের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্য লেখেন- *'A short History and Ethnology of the Cultivating Pods (1919),' 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ' (১৯২৮)* এছাড়া বহুগান ও কবিতা রচনা করেন।[৭৭] যেগুলি পৌণ্ড্রদেরকে তাদের জাতিত্ব সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলেছিল। উক্ত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় আশীর্বাদধন্য হয়ে নিজ নিজ সমাজের অশিক্ষিত মানুষকে ন্যায্য সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা বা আন্দোলন

শুরু করেছিলেন তাকে আমরা 'Self Respect Movement' বলে চিহ্নিত করতে পারি।[৭৮]

একইভাবে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রাজবংশীদের সামাজিক আত্মোন্নয়ন আন্দোলনের পথ প্রদর্শক রূপ গণ্য হয়ে থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–"যে জাতি তাঁর অতীত ঐতিহ্যের ইতিহাস জানে না। তারা সামনে এগিয়ে চলার পথ হারিয়ে ফেলে"।[৭৯] এই বাণীটিকে স্মরণ করেই বোধহয় নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, রাজবংশী, বাগদী, কৈবর্ত্য, মালো, ভুঁইমালী ইত্যাদি অস্পৃশ্য দলিত জাতিগুলির বিশিষ্ট শিক্ষিত মানুষেরা তাঁদের সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে আত্মচেতনা, সমাজচেতনায় বলীয়ান হতে তারা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে উচ্চবর্ণীয় কাছ থেকে আদায় করতে সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন।

২.১১. পর্যবেক্ষন: উপরিউক্ত তথ্যসমূহের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে উনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কিভাবে প্রবেশ করেছিল সে সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যদিও প্রথমে ঐশিক্ষা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার উচ্চবর্ণীয় ও উচ্চবৃত্তের হস্ত গত ছিল। আলোচ্য পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা যৎসামান্য পরিমাণে নিম্নবর্ণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। যদিও তা ইংরেজ সরকার এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের সহায়তায়। আধুনিক ভারতে জাত ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন এবং নিম্নবর্নীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে জ্যোতিবা ফুলে সবার প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা

করা হয়েছে। জ্যোতিবা ফুলের সাথে সঙ্গ দিয়েছিলেন তার স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে সে সম্পর্কেও আমরা তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আন্দোলনে গতিসঞ্চার হয়েছিল। যেমন কেরালাতে শ্রী নারায়ণ গুরু তামিলনাড়ুতে ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রে বি. আর. আম্বেদকর প্রমুখরা নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং দলিত বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলেছিল সে সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশিক বাংলায় দলিতদের আত্মচেতনার উন্মেষে যে সমস্ত দলিত মনীষীরা অবদান রেখেছিলেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন নমঃশূদ্র সমাজের হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর রাজবংশীদের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মন পৌণ্ড্র সমাজের মহাত্মা রাইচরণ সরদার প্রমুখদের অবদানের কথা কেউ তুলে ধরা হয়েছে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. দেবী চ্যাটার্জী: *‘পতিত, ভারতের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণী দন্দ্বের উৎস সন্ধান’,* (ভাষাত্তর সন্তোষ রাণা), (কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১), পৃ. ১১৬।

২. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ১৯১।

৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *'পলাশি থেকে পার্টিশান, আধুনিক ভারতের ইতিহাস',* (হায়দ্রাবাদ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬), পৃ. ৪০৮।

৪. দেবী চ্যাটার্জী: পতিত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯২।

৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *প্রাগুক্ত,* প. ৪১৩।

৬. *তদেব,* পৃ. ৪১৪।

৭. সুজিত সেন (সম্পা): *'দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ',* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১৩), পৃ. ১৬৬।

৮. Gail Omvedt: *'Dalits and the Democratic Revolution',* (New Delhi, Sage Publications, 1994), পৃ. ২৩।

৯. দেবী চ্যাটার্জী: পতিত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৫।

১০. *তদেব,* পৃ. ১৩৫।

১১. *তদেব,* পৃ. ১৩৮।

১২. *তদেব,* পৃ. ১৩৮।

১৩. সুজিত সেন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬৬।

১৪. দেবী চ্যাটার্জী: '*পতিত', প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৯।

১৫. সুজিত সেন (সম্পা): *'দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ',* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১৩), পৃ. ১৭৯।

১৬. দেবী চ্যাটার্জী: '*সাবিত্রীবাঈ ফুলে- জীবন ও মনন',* পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, কলকাতা জেলা কমিটি, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৭।

১৭. *তদেব,* পৃ. ৮।

১৮. *তদেব,* পৃ. ৫।

১৯. প্রদীপ রায়: '*নারী মুক্তির প্রথম নেত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে',* বহু জন সাহিত্য প্রকাশনী, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৯৭, পৃ. ৭।

২০. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯।

২১. প্রদীপ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮।

২২. *তদেব,* পৃ. ৯-১০।

২৩. *তদেব,* পৃ. ১৪।

২৪. *তদেব,* পৃ. ১৬।

২৫. গৌতম রায় (সম্পা): *'রোকেয়া রচনাসংগ্রহ',* দেজ পাবলিশিং কলকাতা, পৃ. ৬ ২০১৮।

২৬. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪।

২৭. অতুল চন্দ্র রায়: '*ভারতের ইতিহাস',* মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২২।

২৮. সিদ্ধার্ত গুহ রায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়: '*আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭ - ১৯৬৪, প্রথম খণ্ড',* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৮৩১।

২৯. প্রদীপ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬।

৩০. বর্তমান পত্রিকা।

৩১. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৩২. প্রদীপ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২।

৩৩. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭।

৩৪. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ১৭।

৩৫. প্রদীপ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪।

৩৬. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৩৭. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ২৩।

৩৮. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ২৩।

৩৯. দেবী চ্যাটার্জী : *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৩।

৪০. সুজিত সেন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬৭।

৪১. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৩।

৪২. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ১৬৪।

৪৩. সুজিত সেন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬৭।

৪৪. যতীন বালা: *'দলিত সাহিত্য আন্দোলন',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২), পৃ. ৩৫।

৪৫. সুজিত সেন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ.২৩-২৫।

৪৬. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫১।

৪৭. শ্যামল কুমার প্রামাণিক: *'বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ও তাঁর সমাজ দর্শন,স্মরণে-মননে আম্বেদকর বিশেষ সংখ্যা',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ২০১৪), পৃ.৮৭।

৪৮. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫১।

৪৯. মনোহর মৌলি বিশ্বাস: *'এনাইহিলেশন অব কাস্ট' ও বি. আর আম্বেদকর, স্মরণে-মননে আম্বেদকর বিশেষ সংখ্যা',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ২০১৪), পৃ. ৩১।

৫০. আলোক নারায়ণ চৌধুরি : *'ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা',* (কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২), পৃ. ২৪৪।

৫১. যতীন বালা: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ৩৫-৩৬।

৫২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *'পলাশি থেকে পার্টিশান, আধুনিক ভারতের ইতিহাস',* (হায়দ্রাবাদ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬), পৃ.পৃ. ৪১৫-১৬।

৫৩. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৫২-১৫৮।

৫৪. যতীন বালা: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২।

৫৫. সুজিত সেন (সম্পা): *'দলিত আন্দোলন: প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ',* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১৩), পৃ.পৃ. ২৪ -২৫।

৫৬. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪১৪।

৫৭. রাম শরণ শর্মা: 'প্রাচীন ভারত', (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১), পৃ.পৃ. ৬৪-৬৫।

৫৮. বিশুদ্ধ নন্দন কবিরাজ: *'দলিতের দুর্দশায় শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর',* (কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০২১), পৃ.পৃ. ১৩-১৪।

৫৯. বিশুদ্ধ নন্দন কবিরাজ: *তদেব,* পৃ. ১৪।

৬০. বিশুদ্ধ নন্দন কবিরাজ: *তদেব,* পৃ. ১৪।

৬১. বিশুদ্ধ নন্দন কবিরাজ: *তদেব,* পৃ. ১৫।

৬২. দিলীপ গায়েন: *'ভারতীয় মূলনিবাসী বহুজন সমাজে নবজাগরণ আন্দোলনের অগ্রদূত হরিচাঁদ',* (দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রকাশক বৌদ্ধদর্শন পাঠচক্র, ২০২১)।

৬৩. দিলীপ গায়েন: *তদেব,* পৃ. ২৮।

৬৪. দিলীপ গায়েন: *তদেব,* পৃ. ২৮।

৬৫. মনোশান্ত বিশ্বাস: *'বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনিতি,'* (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ৮১।

৬৬. মনোশান্ত বিশ্বাস: *তদেব,* পৃ. ৮১।

৬৭. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭।

৬৮. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ৩৭।

৬৯. দেবী চ্যাটার্জী: *তদেব,* পৃ. ৩৭।

৭০. যতীন বালা: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২।

৭১. *তদেব,* পৃ.পৃ. ২২-২৩।

৭২. দেবী চ্যাটার্জী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮।

৭৩. যতীন বালা: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৩-২৪।

৭৪. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'আত্ম চেতনার উন্মেষ: পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনে পত্র-পত্রিকার অবদান (১৯১০-১৯৭০)',* (বাংলা জর্নাল, খণ্ড-২১, ১৪২২), পৃ .পৃ. ৮০-৮৩।

৭৫. *তদেব,* পৃ. ৮১।

৭৬. সনৎ কুমার নস্কর (সম্পা): *'পৌণ্ড্র মণীষা',* (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, ২০১২),পৃ.পৃ. ১১৫ ১২০।

৭৭. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *প্রাগুক্ত,* পৃ .৮৩।

৭৮. শ্যামল প্রামাণিক: *'পুন্ড্র দেশ ও জাতির ইতিহাস',* (কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম. ২০১০), পৃ. ১১৫।

৭৯. যতীন বালা: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭ ।

তৃতীয় অধ্যায়

(CHAPTER THREE)

পৌণ্ড্রসমাজ জাগরণে রাইচরণ সরদারের (১৮৭৬-১৯৪২) ভূমিকা

৩.১.ভূমিকা: ভারত ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী জ্ঞানদীপ্তির অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত। এই জ্ঞানদীপ্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নির্ভর সামাজিক সব কিছুকে গ্রহন করা। ফলে উনবিংশ শতকে ভারতের বহুবিধ স্থানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যদিও প্রাথমিক পর্বে এই সমস্ত আন্দোলন ভারতীয় জাত ব্যবস্থার উর্দ্ধে অবস্থানকারী উচ্চবর্ণ তথা উচ্চবর্গের মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন ঔপনিবেশিক বাংলার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রমুখের সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লর্ড মেকেলের “ক্রমনিম্ন পরিস্রুত তত্ত্ব”[১] (Downword Filtration Theory) অনুযায়ী বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নির্ভর আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাজের নিম্নবর্ণীয় দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছিল। সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যেমন জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০), সাবিত্রীবাঈ ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭), শ্রীনারায়ন গুরু (১৮৫৬-১৯২৮), ই. ভি.

রামস্বামী (১৮৭৯-১৯৭৩), বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) প্রমুখরাও বিবিধ সংস্কার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাংলার সামাজিক সংস্কারে নিম্নবর্ণীয় পৌণ্ড্র, রাজবংশী, নমঃশুদ্র, বাগদি, নাপিত, কৈর্বত্য ইত্যাদি জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও সামাজিক এবং শিক্ষা সংস্কারেও অগ্রসর হয়েছিলেন। ঐ সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত জাত ব্যবস্থার বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে গুলোকে যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনি তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক সংস্কারে অগ্রসর হয়েছিলেন। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলার নিম্নবর্ণীয় দলিত সম্প্রদায়ের পৌণ্ড্র জাতির মনীষা মহাত্মা রাইচরণ সরদারের (১৮৭৬-১৯৪২) জীবন সংগ্রাম, শিক্ষা বিস্তার সামাজিক সংস্কার আন্দোলন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.২. বংশ পরিচিতি এবং শিক্ষা লাভ

পৌণ্ড্র সমাজের নবজাগরনের অগ্রদূত ছিলেন রাইচরণ সরদার। তিনি ১৮৭৬ সালের ১৮ ই মার্চ অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার মগরাহাট থানার অন্তর্গত বনসুন্দরিয়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। পিতা ছিলেন গদাধর সরদার ও মাতা ছিলেন লক্ষী দেবী।[২] তাঁদের ছিলেন তিনটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান। তাদের মধ্যে রাইচরণ ছিলেন সব থেকে ছোট সন্তান। তাঁর পিতা মাতার ধর্মীয় সারল্য ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য তখনকার গ্রামীন সমাজের মানুষজন সম্মান প্রদর্শন করতেন। রাইচরণের পরিবার ছিল বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিপূর্ণ। পিতা মাতার কাছ থেকে রাইচরণ রামায়ন এবং মহাভারত পাঠের গুরুত্ব উপলব্ধী

করেছিলেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছিলেন যে ঐ দুই মহাকাব্য তাঁর বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৩]

খুব ছোট বেলা থেকেই রাইচরণ তাঁর পিতার কাছেই প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রাষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সে বনসুন্দরিয়া গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেই বিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। এবং ১৮৮৮ সালে রাইচরণ বারো বৎসর বয়সে নিম্ন প্রাথমিক পরিক্ষাতে দক্ষতার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। আলোচ্য সময়ে তাঁর স্কুলের শিক্ষক ব্যক্তিগত কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের কাজের ভার বালক রাইচরণের হাতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই রকম পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন নাহলে তিনি আরো দুই বছর আগে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষাতে উত্তীর্ন হতেন।[৪] পরবর্তী কালে ১৮৮৯ সালে ধামুয়ার বানিবেড়ে গ্রামে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তী হয়েছিলেন। তৎকালীন সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী পিতা মাতার অনুমতিক্রমে ১৮৮৯ সালে আট বছরের এক কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৫] তাঁর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে গোপাল চন্দ্র গড়গড়ী নামে একজন শিক্ষকের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমকালীন সময়ে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল বৈশম্য মুলক। সামাজিক ক্রমোচ্চ স্তরে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের চেয়ে নিম্নবর্ণীয় পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, বাগদি, নাপিত, শুড়ী, মেথর, ধীবর, জোলা, কৈবর্ত্য ইত্যাদি দলিত অস্পৃশ্য জাতি সমূহের অবস্থান ছিল নিচের স্তরে।[৬]

পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ছেলে রাইচরণকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে দেখে উচ্চবর্ণীয় মানুষেরা তাঁকে বিভিন্ন ভাবে ব্যঙ্গোক্তি করতে থাকেন। যেমন কেউ বলেন "সে রাস্তায় ছাপ দিতে পারিবে", কেউ বলেন "সে খ্রীষ্টান হইবে" ইত্যাদি।[৭] যদিও ঐ ব্যঙ্গোক্তি, কটূক্তি ছিল তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক বাধা স্বরূপ। এছাড়াও তাঁকে সমগ্র জীবনে আরো পাহাড় প্রমান বাধা ও আঘাত অতিক্রম করতে হয়েছিল। তার ফল স্বরূপ রাইচরণ বাংলার প্রথম দলিত পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির মর্যদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮]

শিক্ষা গ্রহনে রাইচরণ ছিলেন অদম্য জেদী, সেই জন্য তিনি তাঁর নিজ গৃহ ত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। আর্থিক অভাব অনটনে মাঝে মধ্যে কয়েক বছর তাঁর শিক্ষায় ছেদ পড়েছিল। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বোড়াল গ্রামে অবস্থিত উচ্চ ইংরেজি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তী হয়েছিলেন।[৯] বিবিধ কারনে রাইচরণের লেখাপড়া দুই এক বছর বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। যেমন কখনো অর্থনৈতিক দারিদ্র বা কখনো সামাজিক কারনে। তৃতীয় শ্রেনীতে পড়া কালীনও তাঁর শিক্ষা জীবনে ছেদ পড়েছিল। সবশেষে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার হরিনাভি গ্রামের অ্যাংলো সংস্কৃত উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তী হয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীতে, যা বর্তমান সময়ে দশম শ্রেণীর সমতুল্য। এবং বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রথম শ্রেণীতে অবর্তীন হলেন।[১০]

এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে উর্ত্তীন হওয়ার পরে তিনি কর্মের সন্ধানে বাস্তব পরিস্থির সম্মুখীন হলেন। ঐ সময়ে দলিত নিম্নবর্ণীয় অস্পৃশ্যদের কাছে সরকারী চাকরি ছিল আকাশ

কুসুম ভাবনা। এতদস্বতেও তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ.এ. (F.A.) পরীক্ষাতে তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন।[১১] রাইচরণের প্রবল অর্থনৈতিক সংকট থাকা স্বত্তেও কলকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সাহায্যে ১৮৯৭ সালে বি.এ. (B.A.) ক্লাসে ভর্ত্তী হয়েছিলেন। এবং ১৯০০ সালে তিনি বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করলেন। রাইচরণ ছিলেন বাংলার পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম উচ্চ শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ব্যক্তি। এছাড়া অসংখ্য বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনিই প্রথম ১৯০৬ সালে বি.এল. (B.L.) পাশ করেছিলেন।[১২]

৩.৩. জীবন যুদ্ধে জয়ী যোদ্ধা রাইচরণ

সংগ্রামের নাম পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের প্রথম স্নাতক মহাত্মা রাইচরণ সরদার, তিনি ছিলেন সংযমী, স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব। শিক্ষার প্রতি তাঁর যে প্রবল অনুরাগ, সমাজের অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ এবং পরিবারের প্রতি যে সহনশীল তা রাইচরণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। সমকালীন সময়ে তিনি নিজে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বাংলার সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিলেন। কারন তিনি সমাজের উচ্চবর্ণীয়দের কাছ থেকে যেমন অসংখ্যবার মানসিক ভাবে প্রত্যক্ষ আঘাত অনুভব করেছিলেন। ঠিক একই ভাবে তিনি নিজের সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছ থেকেও একাধিক বার মানসিক ভাবে ব্যাথা পেয়েছিলেন। তার মধ্যে আলোচ্য অংশে একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন তিনি সর্ব্বেশ্বর পালধী ভট্টাচার্যের সঙ্গে কলকাতায় পড়াশোনা শিখতে এসেছিলেন তখন মগরাহাট থানার একজন ধনী তপশিলি ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর পালধী মহাশয়কে বলেন “কেন আপনি পোদের ছেলেকে

লেখাপড়া শেখাতে কলকাতা নে গেছেন ? পোদের ছেলে লেখাপড়া শিখলে দেশ জ্বালিয়ে মারবে”।[১৩] এই সব আঘাত কিন্তু তাঁকে শিক্ষার স্পৃহা থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

দলিত নিম্নবর্ণীয় পরিবারে জন্ম গ্রহন করেও রাইচরণ যে জ্ঞানের আলোক বর্তিকার সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন তা আমরা তাঁর শিক্ষা জীবনের ক্ষেত্রে উপলব্দ্ধী করতে পারি। তিনি শিক্ষা ও কর্মজীবনে নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেও সমাজে নিজের অস্তিত্ব বোঝায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং পৌণ্ড্র সমাজ থেকে প্রথম বি.এ (B.A.) ও বি.এল (B.L.) ডিগ্রি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৪] ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনে এদেশের উচ্চবর্ণের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জাত ব্যবস্থার শিকল, পরিবারের অর্থনৈতিক দারিদ্র এবং শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি বাধা সমূহ তাঁর মেধার বিকাশ থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়নি। উপরোক্ত বাধা সমূহকে জয় করেই উচুজাত এবং নীচুজাতের মেধার মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই তা রাইচরণ সরদার জাত ব্যবস্থার সমর্থনকারী দের ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৫]

১৯০০ সালে রাইচরণ যখন বি এ পাশ করলেন তখন পরিবারে প্রবল আর্থিক সংকট। ফলে ঐ বছরেই তিনি কোন ক্রমে একটি সরকারী ক্লার্কের চাকরি পেয়েছিলেন আলিপুর কালেক্টরিতে।[১৬] তিনি তাতেই কোন ভাবে সংসার প্রতিপালন করতেন। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে আবার জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। ঐ চাকরিটি ১৯০২ সালে অফিসের বড়ো বাবুর আদেশে চলে যায়। যদিও রাইচরণ হেরে যাওয়ার পাত্র নয়, পুনরায় চাকরির সন্ধান করতে শুরু করলেন। এবং ১৯০৩ সালে

ত্রিপুরাতে কাশীনগর রাধাকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারি প্রধান শিক্ষকের চাকরি অর্জন করলেন। এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হয়েছিলেন।[১৭] ফলে তিনি যে সংগ্রামী জয়ী যোদ্ধা তা আবার প্রমান করলেন। তবে মানুষ চিরকাল প্রকৃতির দাস তা আজও প্রমাণিত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ত্রিপুরার কাশীনগরে প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্জয় দেখা দেয় সেই কারনে রাইচরণ সেখান থেকে চাকুরি ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন। কিন্তু সংসারে অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য তাঁর আবার চাকরির সন্ধান শুরু হল। এডুকেশন গ্যাজেটে বিজ্ঞাপন দেখে চট্টগ্রামের উত্তর রাউজান রামগতি রামধন ইন্সটিটিউসন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন ১৯০৫ সালের জুন মাসে।[১৮] যদিও এখানে উল্লেখ উক্ত শিক্ষকতার চাকরি গুলো সবই বেসরকারি অত্ত্বাবধানে। তৎকালীন সময়ে রাইচরণ একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়েও কোন সরকারি চাকরি অর্জন করতে পারেন নি। তার প্রধান কারন হল ভারতীয় জাত ব্যবস্থা। তিনি ছিলেন অস্পৃশ্য পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের দলিত সন্তান।[১৯] কিন্তু রাইচরণের সংগ্রাম থেমে থাকেনি। তাঁর অসম্পূর্ন বি এল পড়া তিনি শেষ করে ১৯০৬ সালে বি এল ডিগ্রি লাভ করলেন। এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি ডায়মন্ড হারবার মুনসেফ আদালতে ওকালতির কাজ শুরু করলেন।[২০]

জীবন যুদ্ধের এই জীবিকার ক্ষেত্রেও রাইচরণকে উচ্চবর্ণীয় ব্রাক্ষন্যবাদী জাত ব্যবস্থার সমর্থনকারীদের আক্রমনের মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু কোন বাধাই তাঁর

জীবন সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।[২১] সেই জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে নিজেকে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত আইনজীবী হিসাবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩.৪. শিক্ষার প্রসারে রাইচরণ সরদারের অবদান

পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে রাইচরণ যে সব গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলোর প্রসার ঘটানো। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তথা বাংলাতে যে নবজাগরণ ও আত্মচেতন বোধ শুরু হয়েছিল তার প্রধান এবং প্রথম মানদণ্ড ছিল বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর শিক্ষা বিস্তার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন পর্যন্ত ঐ আধুনিক শিক্ষাতে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি বাংলার জাত ব্যবস্থার নিম্নে অবস্থিত অস্পৃশ্য দলিতদের। যদিও তার প্রধান কারন ছিল ব্রাহ্মন্যবাদী উচ্চ বর্ণের মানুষদের অমানসিক অত্যাচার ও অমানবিক ব্যবহার।[২২] ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিইয়া কোম্পানির এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কালে বাংলার রাজধানী কলকাতা মহানগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সেই সব বিদ্যালয়ে পৌণ্ড্র তথা অস্পৃশ্য দলিতদের লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে শিক্ষার অভাবে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক একথায় সার্বিক দিক থেকে দলিতরা অনগ্রসর ছিলেন। এই অনগ্রসরতা দূর করার জন্য রাইচরণ সরদার পথ পদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন।[২৩]

রাইচরণ বাবু ভালোভাবে উপলব্দ্ধী করেছিলেন যে কোন দেশ বা কোন জাতির উন্নতির প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একাধিক বাধা সত্ত্বেও তিনি

শিক্ষা থেকে দূরে থাকেন নি। ফলে তাঁর নিজের শিক্ষা গ্রহনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধার মুখোমুখী হয়েছিলেন তা যেন পরবর্তী প্রজন্মকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়, সেই জন্য তিনি শিক্ষা প্রসারে মনোনিবেশ করলেন ১৯০৮ সাল থেকে।[২৪]

রাইচরণ বাবু তাঁর জন্ম স্থান দিয়েই এই কাজের সূচনা করেছিলেন। বনসুন্দরিয়া গ্রামে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য একটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষদের অক্ষর জ্ঞান পরিচয় করার তাগিদে তিনি একটি রাত্রি কালীন বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা করেন।[২৫] উক্ত বিদ্যালয় দুটি নিজের অর্থে চালাতেন এবং সমাজ থেকেও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তা বিদ্যালয়ে ব্যয় করতেন। কিন্তু কিছু অসৎ ব্যক্তি রাইচরণের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ঐ বিদ্যালয় দুটি কয়েক বছরের মধ্যে সমাজ থেকে তুলে দিয়েছিলেন।[২৬]

শিক্ষা প্রসারে যুক্ত অপর একটি অঙ্গ হল হোস্টেল বা ছাত্রাবাস। তাঁর সমকালীন ছাত্রাবাসের যে চরম সংকট সেই ভাবনা থেকেই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করলেন। কলকাতার ১৪৪ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রিটে বেশ কিছুজন পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ছাত্রদের নিয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাবের ২৩ শে মার্চ 'আর্য পৌণ্ড্রক ব্রম্ভচর্য আশ্রম' নামে একটি ছাত্রাবাস তৈরি করেন।[২৭] ঐ ছাত্রাবাসের খরচের জন্য তিনি প্রতি মাসে ২ টাকা সাহায্য করতেন। এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষার উপদেশ দিয়েছিলেন রাইচরণ সরদার নিজেও ঐ ভিক্ষা যাত্রাতে অংশ নিতেন।[২৮] তিনি একাধিক জেলাতে যেমন দক্ষিন ২৪ পরগনা, কলকাতা ও হাওড়া জেলাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভিক্ষা যাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন।[২৯]

শুধুমাত্র পৌণ্ড্র জাতির জন্য নয় রাইচরণ সমাজের প্রতিটি জাতির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে তৎপর ছিলেন। তাঁর নিজ উৎসাহে এবং সমাজের আরো কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষা বিস্তারে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। যেমন ডায়মণ্ড হারবার থানার গোবিন্দপুর গ্রামের কালীচরণ কয়াল ছিলেন তৎকালীন ধনী ব্যক্তি।[৩০] কালীচরণ বাবুর সাহায্যেও রাইচরণ গোবিন্দপুর গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন **১৯৩১** সালে।[৩১]

১৯২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাইচরণ সরদার নিজ গ্রামে আবার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত জুন মাসে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। বনসুন্দরিয়া গ্রামের মানুষদের সাহায্যে **১৯২৫** সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টির পঠন পাঠন সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীদের অসহযোগিতায় সেটি বন্ধ হয়েগিয়েছিল।[৩২]

বর্তমান পৌণ্ড্র সমাজ আন্দোলনের অগ্রগন্য বিশিষ্ট নেতা ও গবেষক ধূর্জটি নস্করের ভাষায় শ্রীরাইচরণ ছিলেন শিক্ষা প্রসারের ভিক্ষাযাত্রী এবং দক্ষ সংগঠক।[৩৩] তিনি একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার মধ্যে বন্ধও হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে চলেছিলেন। **১৯২৫** খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চব্বিশ পরগনার মন্দির বাজারে সিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেছিলেন নিজে উদ্যোগ নিয়ে। **১৯২৭-১৯৩৮** সাল পর্যন্ত রাইচরণ ঐ স্কুলের সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।[৩৪] **১৯২৭** খ্রীষ্টাব্দে সিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সিতিকন্ঠ নস্কর এবং রাইচরণ বাবুর যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল।[৩৫]

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত রাইচরণ সরদার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের এক জনপ্রিয় হৃতকারী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর উৎসাহে মোট পাঁচটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠেছিল।[৩৬] এই ভাবে রাইচরণ এক অশিক্ষিত কুসংস্কারে নিমজ্জিত নিম্নবর্ণের পৌণ্ড্র সমাজকে শিক্ষার আলো দেখাতে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

৩.৪.১. সমাজ গঠনে সাংগঠনিক দক্ষতা

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে বাংলায় যে সমাজ গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল তা কেবল উচ্চবর্ণীয় তথা উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা সমাজের প্রান্তিক স্তরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী গুলোকেও সমান ভাবে প্রভাম্বিত করেছিল। আলোচ্য সময়ে বাংলার নিম্নবর্ণীয় নমঃশূদ্র, রাজবংশী, কৈর্বত্য, বাগদি প্রভৃতি জাতি গুলো তাদের সামাজিক দাবী গুলি আদায়ের জন্য সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেছিল। তাতে বাংলার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ও একই ভাবে অংশ গ্রহন করেছিল।[৩৭]

সমাজ জাগরণের মনীষীরা পুরাতন শাস্ত্র ভিত্তিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের জাতির আত্মমর্যদা বা ক্ষত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিবিধ কর্মসূচী নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর পারম্ভিক কাল হতে তাঁর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত জাতি সংগঠন স্থাপন, সভা সমিতি গঠন ও পত্র পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেছিলেন।[৩৮] পৌণ্ড্র জাতি গঠন বা সমাজ গঠনে রাইচরণ সরদার পথ প্রদর্শক হিসাবে পেয়েছিলেন বেণীমাধব হালদার(১৮৫৮-১৯২৩) এবং শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষন(১৮৬৩-১৯০৭) মহাশয়কে।[৩৯] আলোচ্য অংশে রাইচরণ সরদারের সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

অশিক্ষিত, লাঞ্ছিত, অসংগঠিত পৌণ্ড্র সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সমাজ পিতা বেণীমাধব হালদার ও শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষনের প্রয়াস ছিল ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই প্রয়াসকে রাইচরণ বৃহত্তর ভৌগলিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে থাকেন। শুধু চব্বিশ পরগনা নয় বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছিলেন।[৪০] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রির্পোটে পৌণ্ড্র জাতিকে পোদ বলে উল্লেখ করা হয়। সেই জন্য বেণীমাধব হালদার ও শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষন পোদ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমানের জন্য ব্রাত্য ক্ষত্রিয় লেখার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁদের সেই আবেদনপত্র গ্রহন করা হয় নি। কারন ব্রাত্য ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা কোণ এক বিশেষ জাতিকে নির্দেশ করে না।এটি একটি অপ্রচলিত গন বাচক শব্দ।[৪১] তখন থেকেই পৌণ্ড্র মনীষীরা সহ রাইচরণও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় প্রমানে বদ্ধপরিকর। সে জন্য পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের কল্যানে রাইচরণ সরদার, মধুসূদন সরদার, রামতারন নস্কর, নন্দলাল মণ্ডল ও গোপালচন্দ্র দত্তের সহায়তায় ১৯০৯ সালে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। রাইচরণ ছিলেন ঐ সমিতির সভাপতি এবং গোপালচন্দ্র দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৪২]

জয়নগর, মথুরাপুর, কুলপি, মগরাহাট প্রভৃতি অঞ্চলে সমিতির অধিবেশন আহুত হয়েছিল। ফলে পৌণ্ড্র সমাজে শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কার দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতির কর্মকাণ্ড সারা বাংলা প্রদেশে প্রসারের জন্য ১৯১০ সালের ১ লা মে থেকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ডায়মন্ড হারবার থেকে। রাইচরণ ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।[৪৩]

জয়কৃষ্ণ মণ্ডল ছিলেন কোটালপুর কুন্দরালি গ্রামের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। **১৯১৭** খ্রীষ্টাব্দের ২ রা ডিসেম্বর তাঁর সভাপতিত্ত্বে নিজ গৃহে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত বৈঠকে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, খুলনা জেলার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভাতে প্রায় ২০০ জন ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। ঐ সভাতেই সবার অনুমতি নিয়ে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি "সর্ববঙ্গ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতি" নামে পরিচিত হয়।[৪৪] উক্ত সভাতে যে প্রস্তাব গুলি গৃহীত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক ভাবে সহায়তা করার জন্য চাঁদা আদায় করা এবং নিজ জাতির সংবাদ পত্র প্রকাশিত করা।[৪৫] রাইচরণ বিবিধ ভাবে নিজ সম্প্রদায়ের হিতসাধনে চেষ্টা করেছিলেন।

৩.৪.২. সমাজ সংস্কারে রাইচরণ

বাংলার পৌণ্ড্র সমাজের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হল তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বাদশাহ অশৌচ পালন, উপনয়ন বা উপবীত ধারন ইত্যাদি আচরন বিধি গ্রহন করা। পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় যিনি পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন তিনি হলেন শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ। তিনি মনে করেন পৌণ্ড্ররা ক্ষতিয়, শূদ্র হতে পারে না। তাই শ্রীমন্ত বাবু উপবীত ধারনের কথা বলেছিলেন। এবং বারো দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কর্ম যজ্ঞ পালন শুরু করেছিলেন।[৪৬] কিন্তু ঐ সংস্কারকে বৃহত্তর পৌণ্ড্র সমাজে ব্যপক ভাবে প্রচলন এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন আর একজন বিশেষ খ্যাতনামা আইনজীবী ও পৌণ্ড্র দের প্রথম স্নাতক শ্রী

রাইচরণ সরদার। এই আন্দোলন সমূহের এক অদ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করা।[৪৭]

১৯২৮ সালে যখন রাইচরণ সরদারের জ্যৈষ্ঠ্য ভ্রাতা পরলোক গমন করলেন তখন তিনি স্থির করলেন যে বারো দিনে অশৌচ বিধি বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। এবং তখন ঐ অনুষ্ঠানে উপবীত গ্রহনও করেন। উক্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রাইচরণ বাবু সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন দিগিন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য মহাশয়কে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরে উপবীত গ্রহনের সভা আয়োজন করা হয়েছিল। দিগিন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য ঐ উপবীত ধারন অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং শ্রী ভট্টাচার্য বলেন পৌণ্ড্ররা হলেন ক্ষত্রিয় জাতি।[৪৮] রাইচরণ সরদার বলেন "ছয় লক্ষ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে সে সময় কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ শূদ্রত্বের পরিচয় ছেড়ে দ্বাদশ অশৌচ পালন করেছিলেন"।[৪৯] শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন যে 'পোদ' বলে কোন জাতির নাম আমাদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ নেই।

অনুষ্ঠানে দিগিন্দ্রনারায়ন বাবুর সভাপতির ভাষনের শেষে রাইচরণ সহ ৫৬ জন পৌণ্ড্র উপবীত গ্রহন করেন। এই উপবীত গ্রহন অনুষ্ঠানে পুরোহিত হিসাবে মনিমোহন মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্ত কুমার আচার্য, শরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।[৫০] উপবীত ধারনকারী সমস্ত ব্যক্তি মুণ্ডক ছেদন এবং গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেছিল (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনে উপবীত ধারণকারী ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানার তালিকা সংযোজনীতে দ্রষ্টব্য)। রাইচরণের উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান 'ব্রাত্যস্টোম যজ্ঞ' নামে পরিচিত। এই ভাবে রাইচরণ

পৌণ্ড্রদের উপবীত ধারন করে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় হিসাবে অভিহিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

উপরোক্ত উপবীত বা উপনয়ন সংস্কার আন্দোলন ছাড়াও রাইচরণ সরদার শিক্ষা প্রসার, বাল্য বিবাহ রোধ, পণপ্রথা ত্যাগ ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক সংস্কার কার্য্যে অংশ গ্রহনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের আহ্বান করেছিলেন।[৫১]

৩.৫. বাংলা দলিত সাহিত্যের পথপ্রর্দশক

আধুনিক ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রথাগত দলিত সাহিত্যের ও দলিত সংস্থার সূচনা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীর্য়াদ্ধে ১৯৭২ সালে দলিত প্যান্থার সংগঠনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এর বহু দশক পূর্বে জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৬-১৮৯০), বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) প্রমুখের লেখা গুলিও দলিত সাহিত্য ও দলিত ইতিহাসের আমূল্য সম্পদ হিসাবে গ্রহন যোগ্য। বাংলা দলিত সাহিত্য এবং দলিত সংস্থার প্রথাগত ভাবে সূচনা হয়েছিল বিংশ শতকের শেষ দশকে। বস্তুত বাংলার দলিত জাতি সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে প্রথা বহির্ভুত ভাবে বাংলা দলিত সাহিত্যের জন্ম শত বর্ষ পূর্বেই হয়েছিল, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের এবং পৌণ্ড্র সমাজের মহাত্মা রাইচরণ সরদারের হাত ধরেই।[৫২] সাহিত্যের বিবিধ ধারা যেমন কবিতা গল্প উপন্যাসের মতো অন্যতম হল আত্মজীবনী বা জীবন চরিত। রাইচণের জীবন ইতিহাস চর্চা করে জানা যায় যে তিনি ছিলেন পৌণ্ড্র সমাজের

প্রথম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও তিনি কোন সরকারি চাকরি অর্জন করতে পারেননি। যদিও তার অন্যতম প্রধান কারন ছিল তখন ভারতে তথা বাংলাতে ব্রাম্ভন্য বাদী জাত ব্যবস্থার ব্যপক প্রচলন। ফলে তাঁকে জীবন সংগ্রামে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তা তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৫৩] তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল *‘দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা’* (১৯৫৯) এটি রাইচরণের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ। গ্রন্থটির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল *‘শ্রীমন্মমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্য্যপুণ্ড্র’* (১৯৪১) এবং *‘পৌণ্ড্রক্ষতিয় সমস্যা’*।[৫৪] গ্রন্থ গুলির পৌণ্ড্রদের সমাজ ও ইতিহাস রচনায় জীবন্ত দলিল হিসাবে গন্য হয়ে থাকে। এছাড়াও রাইচরণ বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সে গুলিও বাংলা দলিত সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

অস্পৃশ্য দলিত মানুষদের রচিত দলিত সাহিত্য লেখা এবং সাহিত্যের দ্বারা দলিতদের মুক্তির সংগ্রামে গতি সঞ্চারের জন্য আম্বেদকরের রচনা ও তার সংগ্রাম উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু আম্বেদকরের থেকে প্রায় পনেরো বছরের বড়ো শ্রীরাইচরণের রচনা ও বিবিধ আন্দোলনের দ্বারা বাংলার দলিত এবং পৌণ্ড্রদেরকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল। সেই অর্থে তিনি বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক হিসাবে চিহ্নিত।[৫৫]

এছাড়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে অন্তজ্য অস্পৃশ্য দলিতদের লিখিত সাহিত্য গুলো যখন থেকে দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে তারও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে দলিত সন্তান রাইচরণের লেখা গুলো প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাকে

বাংলা দলিত সাহিত্যের পথ প্রদর্শক বলা যায়।[৫৬] শুধুমাত্র বাংলা দলিত সাহিত্যের ইতিহাসে নয় আধুনিক ভারতের মারাঠী ও কন্নড় ভাষার দলিত সাহিত্যিকরা যেমন শংকর রাও খরাট, দয়া পাওয়ার, শান্তাবাই কাম্বলে, সোন কাম্বলে, শরণ কুমার লিম্বালে প্রমুখরা যখন সাহিত্য প্রকাশ করেছেন তাঁদেরও বহু দশক আগে রাইচরণ তাঁর গ্রন্থ গুলি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন।[৫৭] ফলে সার্বিক ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে শ্রীরাইচরণ সরদারকে বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক হিসাবে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না।

৩.৬. বাংলার তপশিলি জাতির প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাইচরণ

দলিত প্রতর্ক (Discourse) প্রচলন হওয়ার আগে সমাজ বিজ্ঞানে, ইতিহাসে এবং সাহিত্যে অন্তজ্য, প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্ণীয়, নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য শূদ্ররা চিরকালই বঞ্চিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতিগত আত্মজাগরণ আন্দোলনের (Self Respect Movement) সূচনা হলে তাতে বাংলার নিম্নবর্ণীয় তপশিলি জাতিরাও সরাসরি অংশ গ্রহন করতে থাকে। যেমন বাংলার পৌণ্ড্র সমাজ, এই সম্প্রদায়ের রাইচরণ সরদার ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণের ক্ষেত্রে অস্ত্র হিসাবে তাঁর তীক্ষ্ণ কলমটিকে সর্বদা সচল রেখেছিলেন। রাইচরণ কলমটিকে ব্যবহার করেই 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকাতে একাধিক গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। উক্ত রচনা গুলি বাংলার দলিত সাহিত্য সম্ভারের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তার মধ্যে রাইচরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ "দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা"। গ্রন্থটির সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব পৌণ্ড্র

সমাজের কাছে অপসরসীম। এই গ্রন্থটি ছিল বাংলার প্রথম তপশিলি জাতির বা নিম্নবর্ণের রচিত আত্মজীবনী।[৫৮]

কোন ব্যক্তি যখন নিজের জীবন কাহিনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন তখন সেটি আত্মজীবনী রূপে বিবেচিত হয়। যদিও আত্মজীবনী লেখা সহজ সাধ্য নয়। ফলে দিনলিপি লেখা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু আত্মজীবনী মূলক রচনা সীমিত। আলোচ্য অংশে আব্রাহাম কলির বক্তব্য বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। তাঁর বক্তব্যের ভাষান্তর নিম্নরূপ -

" কোণ লেখকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্তির কথা বলতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকদের কাছে কর্ণপীড়া দায়ক"। [৫৯]

শ্রীরাইচরণ পেশাগত দিক থেকে বিশিষ্ট শিক্ষিক এবং আইনজীবী তাসত্ত্বেও তিনি লেখনীর সাহায্যে তাঁর পৌণ্ড্র সমাজের মুক্তির জন্য বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। তিনি উদাত্ব কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন-

"দিনের বেলায় কাস্তে ধরো, রাত্রে ধরো কলম"।[৬০]

কলম ব্যতিত কোন দেশ বা জাতির সংকট জনক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় না। সেই জন্য রাইচরণ রচিত আত্মজীবনী *"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা"* গ্রন্থটি পাঠক সমাজে অধিক গ্রহন যোগ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র সনৎ কুমার বর্মন ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশ করেছিল ক্যানিং টাউন, চব্বিশ পরগনা থেকে।[৬১] উক্ত

গ্রন্থটি মোট চারটি খণ্ডে বিভক্ত দুটি গ্রন্থে বিধৃত। প্রথম বইটি (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)। উদ্ধার করেন ২০05 সালে অধ্যাপক সন্দীপ কুমার মণ্ডল সোনারপুর গ্রামের সুধীর কুমার মণ্ডলের গ্রন্থাগার থেকে। দ্বিতীয় বইটি (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে) আবিস্কার করেন পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের অন্যতম তিন সেনাপতি শ্রীহারানচন্দ্র সরকার, স্নেহাংশু শেখর মণ্ডল এবং দিলীপ গায়েন মহাশয়। দক্ষিন চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দির বাজার থানার জগদীশপুর গ্রামের শ্রী রাধাকৃষ্ণ নস্করের কাছ থেকে।[৬২]

ক) জন্ম থেকে বিদ্যাভ্যাস পর্ব, প্রথম খণ্ড।

খ) ওকালতি, শিক্ষা প্রসার, সমাজ সংস্কার, উপনয়ন গ্রহণ অনুষ্ঠান ও জগদীশপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রসঙ্গ নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড।

গ) তপশিলিভুক্ত জাতিদের সমস্যা সমাধান নিয়ে তৃতীয় খণ্ড।

ঘ) স্মৃতিঅর্ঘ্য, আসিবার কালে এবং যাইবার কালে ও পরিশিষ্ট লইয়া চতুর্থ খণ্ড।

রাইচরণের ‘দীনের আত্মকাহিনীতে’ রয়েছে তাঁর জীবনে যে পর্বত শঙ্কুল বাধার উদাহরণ। এছাড়া রয়েছে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপট। একই সাথে সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবন কাহিনী এবং সেই সময়ের সামাজিক চিত্র স্থান পেয়েছে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারে আবদ্ধ এক নিম্নবর্নের পৌণ্ড্র জাতিতে আবির্ভুত হয়েও রাইচরণ শিক্ষা গ্রহনে দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। দীনের আত্মকাহিনী হল তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশর, ছাত্রাবস্থার এবং কর্মজীবনে ঘটে যাওয়া অতিমর্ম স্পর্শী ইতিহাস সমৃদ্ধ বিস্তৃত বিবরন। তৎকালীন

সমাজে নিম্নবর্ণীয় শূদ্রদের শিক্ষার দ্বার প্রায় বন্ধ করে রেখেছিল উচ্চবর্ণীয় ব্রম্ভন্যবাদীরা।[৬৩] ঐরকম একটি প্রতিকুল পরিবেশে রাইচরণ শিক্ষা গ্রহনে অগ্রসর হয়েছিল। ফলে তাঁকে সমাজের সব স্তর থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের স্বীকার হতে হয়েছিল। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তনা, তাই তিনি পরিবার থেকেও শিক্ষার জন্য কোন অর্থনৈতিক সাহায্য পাইনি। ফলে তাঁকে নিজের মেধার উপরে নির্ভর করতে হয়েছিল এছাড়া রাইচরণ নিজে শারীরিক পরিশ্রম করতেন এবং সমাজের কিছু সহৃদয় ব্যক্তিরও সাহায্য লাভ করেছিল। রাইচরণ সব রকমের সামাজিক প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে তাঁর জীবন তরী এগিয়ে নিয় চলেছেন। এখানে তাঁর লেখাপড়ার জীবনে ঘটে যাওয়া দুই চারটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

রাইচরণের জীবনে যে সমস্ত বেদনাময় দুঃখ জনক ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিশেষ স্মরণ যোগ্য। তিনি যখন ১৮৯১ সালে ধামুয়াতে থাকাকালীন মধ্য ইংরেজি পরীক্ষাতে দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম হয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্সিতে মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল, ঐসময় তিনি ভারত তথা বাংলাতে প্রচলিত জাত ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভূবনমোহন চক্রবর্তী ধামুয়া গ্রাম নিবাসী গিরীশচন্দ্র পতিতুণ্ড মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। ঐ প্রধান শিক্ষকের আদেশক্রমে রাইচরণ প্রতিদিন দুই ঘণ্টা তাহাঁর কাছে অবৈতনিক ভাবে লেখাপড়া করতেন। এছাড়া রামকমল নামেও আরো একটি বালক পড়তে আসতেন। তারা দুই জন বসার আসন হিসাবে একটি ছিন্ন মাদুর খণ্ড পেয়েছিল গিরীশ বাবুর বাড়িতে। একদিন অজ্ঞাত কারনে মাদুরটি বাড়ির ব্রাম্ভন বালকের মাদুরের সঙ্গে

স্পর্শ করে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাইচরণকে তীব্র কটূবাক্য শুনতে হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন-

"৩রা ভাদ্র তারিখে (বাংলা ১২৯৮ সন) ঘটনাক্রমে আমার ঐ আসন তাহাঁদের বাটীর ছেলেদের আসন স্পর্শ করিয়াছিল ইহা তাহাঁর বিধবা ভগিনীর (সম্ভবত তাহাঁর নামা বামাসুন্দরী) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইহা দেখিবা মাত্র তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি কটু ভাষায় তিরস্কার করিলেন। লজ্জায় অবনত মস্তকে আমি তাহা শুনিলাম, কিন্তু আমার কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না; বরং ভগবানের দয়ায় জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করিলাম"।[৬৪]

রাইচরণের উক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জেদ তৈরি করেছিল এবং লেখনী ধারনের প্রতি উৎসাহিত করেছিল। সর্বোপরি নিম্নবর্ণীয়দের উপর উচ্চ বর্ণীয়দের যে সামাজিক অন্যায় অবিচার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রশ্ন সংগঠিত করতে শক্তি অর্‌জন করেছিল।[৬৫]

নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য দলিত পরিবারের সন্তান হিসাবে ঘৃন্য জাত-পাত ব্যবস্থার আঘাত তাঁর জীবনে অজস্র আছে। যেমন তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন সর্বেশ্বর পালধী ভট্টাচার্য নামে একজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য পেয়েছিল, উচ্চ শিক্ষার জন্য ঐ ব্যক্তি রাইচরণকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। তখন মগরাহাট থানার এক উচ্চ বৃত্ত সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন –

"কেন আপনি পোদের ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে কলকাতায় নে গেছেন? পোদের ছেলে লেখা পড়া শিখলে দেশ জ্বালিয়ে মারবে"।[৬৬]

রাইচরণের পড়াশোনা এবং অর্থ উপার্জন করা যাতে সুবিধা হয় তার জন্য তিনি কলকাতায় আশ্রয় নেওয়ার মনস্থির করেন। কিন্তু তাঁকে থাকার বাসা ভাড়া নিতে গিয়েও জাত বৈশম্যের তীরে বিদ্ধ হতে হয়। ১৯০১ সালে বি এল পড়ার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। রাইচরণ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনে যে ঘরটিতে থাকতেন সেখানে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের এক ব্রাম্ভনও থাকতেন। একই চৌবাচ্চার জল ব্যবহারকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রবল বাক বিতণ্ডা তৈরি হয়েছিল। ফলে তিনি তখন অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। সেখানে দুই জন ব্যক্তি তার জাতিগত পরিচয় নিয়ে প্রবল আপত্তি করেন। উচ্চবর্ণীয়রা নিম্নবর্ণীয় মানুষদেরকে মানুষ বলে ভাবতেন না।[৬৭] এইসব উচ্চ বর্ণীয়দের অমানবিক আচরণের ঘটনাকে রাইচরণ তাঁর দীনের আত্মকাহিনী নামক আত্মজীবনীতে স্থান দিয়েছেন। ঘটনা গুলোকে আত্মপোলবদ্ধী করলে তৎকালীন সামাজিক চিত্রের ভয়াল রূপটি অনুধাবন করা যায়।

রাইচরণ সরদারের জীবনের অসংখ্য হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ শিকারের ঘটনা আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আরো একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯০২ সালে যখন অফিসের আমলা কর্তৃক আদেশে চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়েছিল, তখন সংসারের অর্থ উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় লক্ষন ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি রাইবাবু কে চাকরি পেতে সহায়তা করেছিল। লক্ষন বাবু রাইচরণকে শিয়ালদহ ই বি রেলওয়ে অফিসের প্রধান ক্লার্কের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন রাইচরণ ঐ

অফিসারের কাছে একটি চাকরি দাবী করেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে বর্ণ বৈশম্যের শিকলে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। প্রথমেই ঐ অফিসার রাইচরণের জাত সম্পর্কে জানতে চান, এবং শুনে তিনি রণমূর্তি ধারন করে বলিলেন –

"কেন তোমার কি হাল নেই? হাল চাষ করে খেত পার না? আমি ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলাম আমার কোন আশা করা বৃথা। তাহলে এই কথার প্রকৃত উত্তর দেওয়া উচিৎ ভাবিয়া বলিলাম,-'আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন আমার একখানি নয়, দুইখানি হাল আছে, তবে চাকরিতে আমাদের অংশের কিছু পাবার আশায় এসেছি'। ইহা শুনিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন ও ক্রুদ্ধ হইয়া জিঞ্জাসা করিলেন-'তোমাদের বংশ কি রকম ? আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম আমরা হিন্দু শ্রেণীভুক্ত, মোছলমানদের সহিত চাকরির অনুপাত হিসাব করিবার সময় আমাদিগকে হিন্দু গণনা করা হয় এবং সেই অংশ হতে আমি কিছু পাবার দাবী করি। ইহা শুনিয়া তিনি অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমার ক্ষমতা থাকে আদায় কর"।[৬৮]

এই ভাবে উচ্চবর্ণীয় ব্রাক্ষন্যবাদীরা সমাজে জাত ব্যবস্থাকে সচল রেখে সরকারি চাকরি গুলোকে নিজেদের সম্পতি হিসাবে গণ্য করত। নিম্নবর্ণীয় অস্পৃশ্য দলিতদের চাকরি পাওয়া বা না পাওয়া তৎকালীন বর্ণবাদীদের উপরে যেন নির্ভর করত।

উপরিউক্ত ঘটনা গুলি রাইচরণের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণকামী মনোভাব বাড়িয়ে তুলেছিল। তাই তো আমরা সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রসারে দক্ষ নেতা হিসাবে হিসাবে তাকে দেখতে পেয়েছি। যেমন তাঁর পূর্বসুরির প্রচেষ্টায় পৌণ্ড্র সমাজে বারো দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতি চালু হয়। তবে সেই

রীতি বা নিয়মকে সমাজে ব্যপক প্রচলন করেন রাইচরণ সরদার। তিনি তাঁর সমাজের ক্ষতিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাক্ষনদের মত উপনয়ন গ্রহন অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। এই ভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় পৌণ্ড্র সমাজে সংস্কার আন্দোলন দ্রুত গতি লাভ করেছিল।[৬৯] তাই বর্তমান বাংলার পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনের কাণ্ডারি ও পৌণ্ড্র জাতি সংক্রান্ত গবেষক শ্রী ধূর্জটি নস্কর বলেছেন-

"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর তৃণমূল স্তর থেকে সামাজিক জাগরণের ক্ষেত্রে রাইচরণ ছিলেন পণ্ডিত বেনীমাধব ও শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণের সুযোগ্য উত্তর সাধক। ১৯০৭ সালে ডায়মণ্ড হারবার মুনসেফবারে যোগদানের পর থেকে বেণীবাবু ও শ্রীমন্ত বাবু পুঁথিগত সাধনা, ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে সচেতনতা, উপবীত গ্রহণে উদ্দীপনা, দ্বাদশহ অশৌচবিধি পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি রাইবাবুকে কেন্দ্র করে একটা সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের রূপ পায়"।[৭০]

ইতিহাস এবং আত্মজীবনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্য ঘটনাকে তুলে ধরা। এছাড়া আত্মজীবনী সত্য ঘটনা ও সত্য কথার উপর নির্ভর করে রচিত হয়। রচয়িতার সঠিক ঘটনা সত্যদর্শন আত্মজীবনীকে সার্থবহ করে তুলবে। সত্যরূপে নিজে প্রকাশ করবেন। এই সত্যদর্শনের স্বরূপ আলোচনা করে সোমেন বসু লিখেছেন "কোনো বিশেষ আদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে রচনাকার যখন অবলীলায়, অসংকোচে সেই বিশ্বাসের আদর্শের রূপ চিত্রন করেন তখনই তা সত্যমূল্য অর্জন করে"।[৭১] রাইচরণের আত্মজীবনীতে ঠিক ঐ রূপ সত্যমূল্য ধরা পড়েছিল। তিনি জীবনে যেমন উচ্চবর্ণীয়দের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন তেমন কিছু সাহায্যও পেয়েছিল। একই ভাবে রাইচরণ

বাবু নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকেও অসংখ্য সাহায্য সমর্থন পেয়েছেন, তবে তাদের দুই এক জনের কাছ থেকে আঘাতও পেয়েছেন। যা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানেও আর একটি উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি যখন এফ এ (F.A.) ক্লাসে পড়তেন সেই সময় কলকাতা থেকে হরিনাভি গ্রামে এসেছিলেন। ফেরার সময় গাড়িতে তাঁতিহাটি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র আচার্য রাইচরণকে কাছে ডেকে পরিচয় করেন এবং ঐ আচার্য মহাশয় তাঁর সম্পর্কে প্রশংসা সূচক বিশেষণ ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁদের সামনেই পূর্ব পরিচিত স্বজাতির এক ধনী ব্যক্তি বসেছিলেন তিনি কিন্তু একটি কথাও বললেন না ঐ দীর্ঘ যাত্রা পথে। কি ভাগ্যের পরিহাস ঐ ধনী ব্যক্তি রাইচরণকে দেখে বিরক্তভাব প্রকাশ করলেন, এবং রক্তিম চোখে দেখতে থাকেন। উক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক স্বভাব পরিবর্তন করার জন্য রাইচরণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।[৭২] অর্থাৎ রাইচরণ তাঁর আত্মজীবনীতে সমস্ত সত্য ঘটনাকেই বর্ণনা করেছেন। আর এখানেই আত্মচরিতের স্বার্থকতা।

দীনের আত্মকাহিনীর দ্বিতীয় গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ‘স্মৃতিঅর্ঘ্য’ র বিষয়টি সমকালীন মহৎ ব্যক্তি বর্গের জীবনপঞ্জি। এই অংশে মহাত্মা রামজীবন খাঁ এবং মহাত্মা বিনোদবিহারী রায়ের উল্লেখ আছে। রামজীবন খাঁ ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সৎ ব্যক্তি। তিনি ধাড়া নগরের ক্ষত্রিয় রাজার দেওয়ান ছিলেন। খাঁ সাহেব সাধারন মানুষের জন্য একটি দীঘি তৈরি করেছিলেন।[৭৩] অপর দিকে বিনোদবিহারী বাবু ছিলেন বিখ্যাত বীর সেনাবাহিনীর প্রধান। তিনি ছিলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির শ্রেষ্ট নিদর্শন। তাঁর সম্পর্কে রাইচরণ

বলেছেন –“তুমি এই জাতির আদর্শস্থল। তুমি স্বরূপ বিস্তৃত এই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণকে ক্ষত্রিয়াচারে অনুপ্রাণিত কর। মর্যদাঞ্জানে প্রতিষ্ঠা কর”।[৭৪]

বিনোদবিহারী রায় সম্বন্ধে রাইচরণ সরদার আরো লিখেছেন যে - “আর বিনোদবিহারী! তুমি এই জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের শেষ নিদর্শন। তুমি, আমার তথা এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির পূজ্য। তোমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারায়, তোমার স্মৃতিচিহ্ন পরিস্ফুট করিতে পারিলাম না।..............তুমি এই জাতির আদর্শস্থল। তুমি স্বরূপ বিস্তৃত এই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণকে ক্ষত্রিয়াচারে অনুপ্রাণিত কর। মর্যদাঞ্জানে প্রতিষ্ঠা কর”।[৭৫]

শ্রীরাইচরণ তাঁর ‘দীনের আত্মকাহিনীতে নিজ সম্প্রদায়ের পূর্বসুরি এবং উত্তরসূরিদের সম্পর্কেও মহার্ঘ্য দান করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা পৌণ্ড্র সমাজের হিত সাধনেও যে যুক্ত ছিলেন তা আমরা প্রমাণ পাই রাইচরণের এই আত্মজীবনী মূলক রচনা থেকে। বেণীমাধব হালদার ছিলেন পৌণ্ড্রদের সমাজ পিতা। তিনিই প্রথম পৌণ্ড্র সমাজের সংস্কারে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি পৌণ্ড্র জাতি সম্পর্কে ‘জাতিবিবেক’ এবং ‘ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়’ নামে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থের অবতারণা করেছিলেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ সমুহের দ্বারা রাইচরণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই রাইচরণ বাবু বেণীমাধব হালদার সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিঅর্ঘ্যে লিখেছেন-

“হে দেব! এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির উন্নতিকল্পে তুমি লীলাময়ের দ্বিতীয় লীলাপাত্র।........তোমার ন্যায় নিরভিমান নিঃস্বার্থ পরহিতকারী মহানুভব শিক্ষিত ব্যক্তি

এই সমাজে অতি বিরল। তোমার আদর্শ চরিত্র অনুকরণীয়। তোমার 'জাতি বিবেক' ও 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় পরিচয়' তোমার অসাধারণ মেধাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক"।[৭৬]

তিনি আরো বলেন আপনার গ্রন্থদ্বয় এক অনন্য সাধারণ বুদ্ধিশক্তি এবং জ্ঞাণী ব্যক্তির নিদর্শন স্বরূপ।

রাইচরণ সরদার কবিবর শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে বলেন যে আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল ১৯০২ সালে। আপনি আমার সাথে পরিচয় করেছিলেন এবং দ্বাদশহ অশৌচ নিয়ম বিধি পালনের কথা প্রথম প্রস্তব দিয়েছিলেন। শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ 'জাতি চন্দ্রিকা' লিখে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকে জোরালো করেছিলেন। সেই জন্য রাইচরণ সরদার তাঁর দীনের আত্মকাহিনীর স্মৃতিঅর্ঘ্যে মন্তব্য করেছেন –

"তোমার জাতিচন্দ্রিকা একাধারে তোমার প্রগাঢ় সাহিত্যজ্ঞান এবং আদর্শ কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। তোমার অকাল মৃত্যুতে কেবল এই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতি নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ একটি আদর্শ পুত্র হারাইয়াছেন"।[৭৭]

শ্রী রাইচরণ বাবু কেবল মাত্র তাঁর পূর্বসুরিদের নয়, তাঁর উত্তরসুরি অনুজ ভাতৃপ্রতিম শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬-১৯২৮) সম্পর্কেও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এই মহেন্দ্রনাথ করণ ছিলেন মেদিনীপুর নিবাসী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, লেখক, বাগ্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী।[৭৮] পৌণ্ড্র সমাজের হিত সাধন করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তিনি পৌণ্ড্র জাতি সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থের অবতারণা করেন। যেমন *'A short History and Ethnology of the Cultivating Pods'* (1919)

পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় (১৯২৭), *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ* (১৯২৮) ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থে তিনি নানান যুক্তি ও তথ্য প্রমাণের সাহায্যে বলেন যে পৌণ্ড্ররা শূদ্র হতে পারে না, তারা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়।[৭৯] এই রকম একজন গুণী ও প্রতিভাধর ব্যক্তি সম্পর্কে রাইচরণ সরদার লিখেছেন –

"তোমার সাহিত্য সাধনা, স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি, ঐতিহাসিক গবেষণাশক্তি এবং অধ্যাবসায় অসাধারণ। 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধবে', 'প্রতিজ্ঞায়' এবং 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচারে' প্রকাশিত তোমার প্রবন্ধ, তোমার সাহিত্য সাধনার পরিচায়ক এবং ঐ তিন পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত কবিতা ও তোমার সমাজ রেণু' তোমার স্বাভাবিক মাতৃ ভাষায় কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।[৮০]

রাইচরণের দীনের আত্মকাহিনীর দ্বিতীয় গ্রন্থের শেষ পর্বে লিখেছেন 'আসিবার কালে ও যাইবার কালে'। এই অংশটি তাঁর পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে রচিত। এটি প্রধানত উপদেশ মূলক বাণী। তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জাতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে, নিজের সমাজের প্রতি যাতে দ্বায়বদ্ধ হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু বাণী উদ্ধৃতি করেগিয়েছেন।

আত্মজীবনী রচয়িতা সবসময় যে কালিক পারম্পপর্য মেনে চলবে তা নাও হতে পারে। স্মৃতিশক্তির ভাণ্ডার কালিক পারম্পপর্য বোঝায় রাখে না। স্মৃতিশক্তির উপর ভর করেই আত্মচরিত রচয়িতা তাঁর অতীত ও বর্তমানকে ব্যক্ত করেন। আত্মজীবনী লিখনে দুর্বলতা থেকে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাই লেখককে সর্বদা সাবধান থাকতে হয়।[৮১] তাই আমরা মহাত্মা রাইচরণ সরদারের দীনের আত্মকাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার

বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে তিনি একজন সংযমী সাবধানী আত্মজীবনী রচয়িতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কোনো কিছুকে আত্মগোপন করেন নি। আবার কোনো বিষয়কে অতিরঞ্জিত করেন নি। ফলে তাঁর রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি নিজেকে তাঁর গ্রন্থে একাধিক বার দীনসেবক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, সাফল্য ব্যর্থতাকে সহজ সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই অর্থে রাইচণের দীনের আত্মকাহিনী একটি স্বার্থক জীবনী গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

৩.৭. রাইচরণ সরদারের অন্যতম "শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র" গ্রন্থে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমানের প্রচেষ্টা

রাইচরণ সরদার তাঁর এই ৬৩ বছর জীবতকালের মধ্যে প্রায় ৪৭ বছর নিজ আত্মকাহিনী লিখে অতিবাহিত করেছিলেন। এছাড়া তিনি তার জীবনের অনেকটা সময় এই পৌন্ড্র জাতির সেবাকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারণ এই জাতির প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। যার প্রমাণ ১৯৩৭ সালে যখন মুরারি মোহন সরকারের "বঙ্গে ক্ষত্রিয় পুন্ড্রজাতি" নামক গ্রন্থটি হাতে পেয়েছিলেন। তখন তিনি জীবনের শেষ লগ্নে এসে হাতের লেখনীটি এবং মনোসিদ্ধান্তকে অন্য পথে চালিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ পোদ সম্প্রদায় কে পুণ্ড্র অথবা পৌন্ড্র উপাধিতে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ১৯৪১ সালে রচনা করলেন *"শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র"*।[৮২] রাইচরণের পূর্ববর্তী লেখকদ্বয় শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ (১৮৬৩-১৯০৭) ও বেনীমাধব হালদার (১৮৫৮-১৯২৩) তাঁদের *"জাতি চন্দ্রিকা"* এবং *"জাতি বিবেক"* গ্রন্থ গুলিতে এই

জাতিকে 'আর্য পৌণ্ড্র কুলউদ্ভব' বলে প্রমাণ করেছেন।[৮৩] কিন্তু রাইচরণ উক্ত দুইজন লেখকদের চেয়ে আরো একধাপ এগিয়ে অবস্থান করেন। কারণ তিনি তাঁর "দীনের আত্মকাহিনীতে" বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন বাল্যকাল থেকেই পিতা-মাতার আদেশে তিনি রামায়ণ ও মহাভারত দুই মহাকাব্য পড়তে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং ওই দুইটি কাব্য তাঁর মধ্যে ক্ষত্রিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী করে তুলেছিল।[৮৪] সেই জন্য রাইচরণ পোদ জাতিকে 'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এছাড়া তিনি *'শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র'* গ্রন্থের পূর্বাভাসে ব্যক্ত করেছেন যে "আমি যদি মানুষ হই তাহা হইলে এই জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা হয় কিনা দেখব"।[৮৫]

"বঙ্গে ক্ষত্রিয় পুণ্ড্র জাতি" গ্রন্থে মুরারী মোহন সরকার মহাশয় দেখিয়েছেন যে 'পুন্ড্র' শব্দটি পোদ শব্দের অপভ্রষ্ট হবে না। সেই জন্য অনেকে বলেন যে পুণ্ড্র বাচক পৌন্ড্রক শব্দ অপভ্রষ্ট হয়ে আগে পুন্ডরিক হবে এবং পরবর্তী সময়ে পুন্ডরীকের অর্থ পদ্‌ম হবে। ফলে ওই পদ্ম শব্দ থেকে পোদ ও পদ্মরাজ শব্দের উৎপত্তি।[৮৬] অতএব পদ্ম শব্দ থেকে পোদ শব্দের সৃষ্টি হলে পোদ শব্দ কোনো সময় পদ্মরাজ রূপে ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তা নেই। এছাড়া ও মুরারী মোহন বাবু তাঁর গ্রন্থে পৌন্ড্রদেরকে পুড়োজাতির এক বিশেষ ভাগ পুলিন্দ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাতেও আমরা দেখতে পাই 'পুড়ো' ও 'পোদ' আলাদা দুটি জাতি। সেই জন্য কেউ কেউ পুণ্ড্র থেকে পুড়ো এবং পৌন্ড্র বা পৌণ্ড্রিক থেকে পোদ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে আলাদা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তবে স্মৃতি পুরাণে পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌন্ড্র বা পৌণ্ড্রিক শব্দ গুলি

একাত্মবোধক হিসেবেই ব্যবহৃত। ফলে প্রমাণিত হয় যে পোদ শব্দ পুণ্ড্র বা পৌন্ড্র থেকে সৃষ্টি নয়।[৮৭]

রাইচরণ প্রথমেই উপলব্ধী করলেন পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে। ১৯০১ সালে জনগণনায় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পৌন্ড্র জাতিকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতি' বলে চিহ্নিত করেছিল। এই আখ্যাটি সঠিক নয় বলে মনে করেন রাইচরণ ও বেনীমাধব হালদার মহাশয়। সেই জন্য উহারা সরকারি নথিপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এবং তৎকালীন সেনসাসের কর্তৃপক্ষ তাদের বললেন যে পোদগণ নিজেদেরকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন।[৮৮] এইভাবে যখন ১৯১১ সালে জনগণনা আসিল তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে অন্যান্য কয়েকটি জাতি 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের' আবেদন জানায় সেন্সাস কর্তৃপক্ষের কাছে। ওই সেন্সাসে কিছু জাতি পদ্মরাজ এবং কিছু জাতি পোদ বলে গণনাকারীদের কাছে নথিবদ্ধ করতে থাকে। উচ্চ বর্ণীয় গণনাকারীগণ ওই এদের ক্ষত্রিয় হিসাবে সহ্য করতে না পেরে এবং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় লিখতেও অসমর্থক হয়েছিল। এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই পোদ বা পদ্মরাজ শব্দ যুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তখন জনমতের অভাবে শিক্ষার অভাবে এর কোন বিরোধিতা হয়নি। তবে সরকারি পক্ষ বুঝলেন যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় শব্দটি কোন একটি জাতিকে নির্দেশ করেনা গণবাচক শব্দও নয়। ফলে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হতে থাকে এবং পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন।[৮৯]

রাইচরণ তার নিজ জাতির ক্ষত্রিত্ব প্রমাণের জন্য নানা ঘটনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। তার মধ্যে অধিক জনপ্রিয় হল যে সৌর্য তেজ ধৃতি দাক্ষ যুদ্ধে অপলায়ন দান এবং ঈশ্বরভাব - শ্রী ভগবান ক্ষত্রিয়দের এই সাতটি কাজের কথা বলেছেন।[৯০] রাইচরণ নিজে জাতির মধ্যেও সৌর্য তেজ ধৃতি দাক্ষ যুদ্ধে অপপলায়ন এই পাঁচটি কাজকে একে অপরের সঙ্গে জড়িত প্রবল পরিস্ফুট। তিনি উল্লেখ করেছেন যে যখন আমি দশ বছর বয়সের বালক তখন আমার পাড়াতে একটি শিবালয়ের জমি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। যার একপক্ষ্যে এই জাতির দশজন লাঠিয়াল এবং অন্য পক্ষে মুসলমান ও অন্যান্য জাতির ২০০ থেকে ৪০০ জন লাঠিয়াল ছিল। দুই পক্ষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন যুদ্ধ হওয়ার পর পুন্দ্র জাতির ১০ জন লাঠিয়াল জয়লাভ করে ওই জমি উদ্ধার করেছিল। ওই দশজনের মধ্যে তার প্রিতামহের এক কন্যার দৌহিত্র ছিল আর ওই ব্যক্তি হরিনাম গানও করত। তিনি লক্ষ্য করলেন যে ওই ব্যক্তি যেমন হরিনাম গান করত তেমনি আবার কখনো দুর্বলকে রক্ষা করতো। সেই থেকে তিনি এই জাতির চরিত্র সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং তার ক্ষত্রিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতেও আগ্রনী হয়েছিলেন।[৯১]

৩.৮. রাইচরণ সরদারের লেখার প্রধান কারন কি ছিল?

ইংরেজ শাসনাধীন ঔপনিবেশিক বাংলার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের মনীষা স্বরূপ ছিলেন রাইচরণ সরদার। সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তাঁর সার্বিক সাফল্যের একটি অতীত সামাজিক ইতিহাস ছিল। যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আর সেটা হল জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমাহীন সামাজিক কৃত্রিম বাধা। যদিও সাফল্যের

মানদণ্ড হিসাবে সঠিক কোনো সংজ্ঞা নেই। এবং তা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তার স্বাদ এবং স্বরূপ আলাদা হয়ে থাকে। আমাদের এই মানব সমাজে সব মানুষই তাঁর নিজের পরিসরে সফল। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে সমাজের সব সফল ব্যক্তি তাঁদের নিজের আত্মজীবনী লিখতে পারেনা। খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি নিজে লিখে এছাড়া কিছু ব্যক্তির আত্মজীবনী তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ গুণীজন লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। যেমন প্রাচীন ভারত ইতিহাসে রাজা বা সম্রাটদের জীবনচরিত রচনা করতেন তাঁদের সভাকবি বা সভাসদগন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বাণভট্ট রচিত *হর্ষচরিত*। এটি থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭) জীবন বৃতান্ত। বিলহন লিখিত *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত*। গ্রন্থটি চালুক্য রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের আত্মজীবনী। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *রামচরিত*। এখানে পাল রাজা রামপালের সম্পর্কে বর্ণনা আছে।[৯২] রাইচরণ কিন্তু নিজে আত্মজীবনী লিখেছিলেন।

বাংলার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের তথা দলিত জাতিদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা হলেন মহাত্মা রাইচরণ সরদার। তাঁর জীবন দর্পনে শত বাধা ছিল। তা সত্ত্বেও কেন তিনি কলমকে হাতে তুলে নিয়েছিলেন আত্মজীবিনী লিখতে। এবং তাঁর লেখা সমূহের গুরুত্ব কতখানি ছিল সে বিষয়ে আমরা আলোকপাত করবো।

প্রথমত: রাইচরণ নিম্নবর্ণীয় পৌণ্ড্র জাতির কৃষক পরিবারের সন্তান হয়ে যখন ইংরেজি মাধম বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন সেই সময় গ্রামের ব্রাক্ষন কায়স্ত বিভিন্ন উচ্চবর্ণীয় জাতির ছেলেরা তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মূলক কথা বলত। তাই তিনি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা গুলো যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে। এবং ভারতীয় জাত ব্যবস্থার

উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলতে পারে সেই জন্য তিনি কলমকে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছিলেন।[৯৩] যার ফল স্বরূপ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত তাঁর *'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা'* গ্রন্থটি।

দ্বিতীয়ত: রাইচরণ কেবল মাত্র বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তা নয়। ১৮৯১ সালে পনেরো বছর বয়সে তাঁর মধ্যে একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজে দলিত অস্পৃশ্য জাতির সঙ্গে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সামাজিক মেলামেশা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়েও প্রত্যেকের বসার আসন ছিল পৃথক। এপ্রসঙ্গে রাইচরণের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একদিন অবৈতনিক পাঠশালাতে তাঁর বসার মাদুর উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ ছেলের আসন স্পর্শ করেছিল। সেই জন্য তখন তাঁকে অশ্রাব্য কটূবাক্যও শুনতে হয়েছিল। এখানেই রাইচরণ প্রথম বর্ণব্যবস্থার শিকার হয়েছিল। সেই জন্য তিনি নিজ জাতির আত্মমর্যদা প্রতিষ্ঠা করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তৎক্ষণাৎ তিনি সমাজে সর্বিক ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ তৈরির প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন।[৯৪]

তৃতীয়ত: পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার পৌণ্ড্র তথা বিভিন্ন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে জাগরিত করতে এছাড়া জাতপাত ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তিনি তাঁর হাতের লেখনীটিকে ব্যবহার করেছিলেন।[৯৫]

চতুর্থত: রাইচরণ একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাসত্ত্বেও তাঁকে একাধিকবার সরকারি চাকরির পরীক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন বর্ণবাদী মানুষরা। সেই সব কথা সেই সব ঘটনা যাতে সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিগণ উপলবদ্ধী করতে পারেন সেই জন্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর *'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা'* নামক গ্রন্থে।[৯৬]

পঞ্চমত: দলিত নেতা আম্বেদকর ভারতের অস্পৃশ্য মাহারদের মুক্তি সূর্য ছিলেন। রাইচরণ তার আগে জন্মগ্রহণ করে অস্পৃশ্যদের মুক্তির জন্য শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। জাত ব্যবস্থার কারণে সমাজের শুদ্র তথা দলিত জাতিগুলিকে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে রেখেছিলেন উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ। তাই রাইচরণ শিক্ষা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারের হাত থেকে অস্পৃশ্য দলিত সম্প্রদায়কে মুক্ত করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলিদ্রা প্রতিরোধ প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল। ওই সমস্ত ক্ষেত্রে তারা যাতে সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেই জন্য তিনি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন।[৯৭] এবং রাইচরণ নিজে জাতির দলিতদের কে সমাজ গঠনে অগ্রসর হওয়ার আহবান করেছেন।

ষষ্ঠত: রাইচরণ বাবু নিজে ছোটবেলায় যাত্রা অবস্থায় যে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল সামাজিক বাধার মুখে পড়েছিল তা আমরা তার রচিত দিনের আত্মকাহিনী পর্যালোচনা করে বুঝতে পেরেছি। তাই তিনি পরবর্তী সময়ে নিজের কিছু রোজগারের টাকা এবং সমাজের কিছু সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গরীব অস্পৃশ্য দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয় ও হোস্টেল তৈরি

করেছিলেন।এছাড়া সামাজিক সংস্কার মূলক কার্যাবলীও করে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে একটি নিদর্শন তুলে ধরতে পেরেছিলেন।[৯৮]

সপ্তমত: রাইচরণ সর্দার জীবনব্যাপী যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার মূলক কাজ করেছিল তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন। সমাজকে পিছিয়ে রাখার একটি অন্যতম অস্ত্র হল জাতিভেদ প্রথা এই প্রথাকে বন্ধ করার জন্য তিনি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলনকে গতিময় করতে তিনি শুধু একা অংশগ্রহণ করেননি। সেই সময়কার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও ওই আন্দোলনে তিনি সামিল করতে পেরেছিলেন। যেমন তার বন্ধু স্বরূপ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কেও ওই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে পেয়েছিলেন।[৯৯]

অষ্টমত: রাইচরণ শুধুমাত্র জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন করেননি। তার সাথে পৌণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় পরিচয় দানের জন্য ক্ষত্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালে তার মৃত্যুর পর পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের আত্মজাগরণ আন্দোলন বা ক্ষত্রিয় আন্দোলন বেশ কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাইচরণের লেখা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থকে আত্মস্থ করে তার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় স্বাধীনতার পরেও। এই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনে অগ্রসর হলেন পতিরাম রায় এবং শান্তি সরকার।[১০০]

নবমত: প্রকৃতপক্ষে রাইচরণ সরদার সমকালীন বাংলার পৌন্ড্র সমাজের একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি তার আত্মজীবনী লিখেছেন। তার দিনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা গ্রন্থটি সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার তথা বাংলার সমাজ সাহিত্য

সংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণার একটি অন্যতম অমূল্য জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত।[১০১]

দশমত: আধুনিক ভারতবর্ষে যখন থেকে দলিত সাহিত্য ও দলিত ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচিত হচ্ছে তার অনেক আগেই বাংলার পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের রাইচরণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই তাকে আধুনিক ভারতের মারাঠি কন্নড় তামিল প্রভৃতি ভাষার শঙ্কররাও খরাট, সোন কাম্বলে, লক্ষণ মানে, বেবিতাই কাম্বলে, অর্জুন দাঙ্গলে, ড. অরবিন্দ মালাগাত্তি প্রমুখ ও দলিত লেখকদের পূর্বসুরি হিসাবে এবং পথপ্রদর্শক এর ভূমিকাই অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাইচরণ। এছাড়া বাংলা দলিত সাহিত্যেরও জনক হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা যায়। তাই তাঁর জীবনের লিখিত গ্রন্থ গুলি সার্থক হয়ে উঠেছে বাংলার দলিত সমাজের কাছে।[১০২]

একাদশতম: কোন কবি লেখক বা ঐতিহাসিকের আত্মজীবনী তখনই একটি সত্যিকরের সাহিত্য বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা পায় যখন লেখকের দোষ ত্রুটি ভালো-মন্দ সমস্ত বিষয় তিনি সুন্দরভাবে তার লেখনীতে তুলে ধরেন। ঠিক যেমন আমরা দেখতে পাই মুঘল সম্রাট বাবর এর রচিত *‘তুজুক ই বাবরি বা বাবরনামা’* গ্রন্থে বাবর ভারতবর্ষ সম্পর্কে বাস্তব সত্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন   তাই সেটি একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। একইভাবে রাইচরণ সরদারও তার দিনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা নামক গ্রন্থে ভালো-মন্দ সমস্ত কিছুকে তিনি স্থান দিয়েছেন। কারণ তাকে আমরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করতে দেখছি তা নয় সমান ভাবে তিনি তাঁর উচ্চ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি

হওয়ায় উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কাছ থেকে প্রধানত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অনেক সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্যও পেয়েছিলেন। সেই কথাও তিনি তার আত্মজীবনীতে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এবং তিনি ওই সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার রচিত দিনের আত্মকাহিনীতে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভুবন মোহন চক্রবর্তী, প্রতাপচন্দ্র ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কেদারনাথ ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য, গোপাল চন্দ্র গড়গড়ি, তারকনাথ দত্ত, নবীনচন্দ্র ঘোষ, রাজা বিনয় কৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ।[১০৩] উপরিউক্ত সহৃদয় ব্যক্তিরা রাইচনের শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

দ্বাদশতম: ভবিষ্যৎ পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের এবং সমগ্র বাংলার দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মন্ত্র স্বরূপ তাই রাইচরণ বিশেষ দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন স্মরণ রাখিও তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি প্রাকিত সংস্কৃত হিন্দি উর্দু আরবী ফারসি তামিল তেলেগু উড়িয়া গুজরাটি কানারা আসামি চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে।[১০৪] তিনি আরো বলেন যে মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তি বল। প্রলোভনে বঞ্চিত হয়ো না আত্ম বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও।[১০৫] ইত্যাদি। এভাবেই রাইচরণ সারা জীবন তার হাতের কলমটিকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩.৯.তৎকালীন সময়ের পশ্চিমবাংলা এবং বর্তমান সময়ের পশ্চিমবাংলাতেও রাইচরণ সরদার বঞ্চিত কেন?

পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা আন্দোলনের জনক হলেন রাইচরণ সরদার। তিনি জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আন্দোল, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন বিবিধ ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভার অবদান রেখেছেন। এতদস্বত্তেও তিনি সমকালীন পশ্চিমবাংলাতে পৌন্ড্র সম্প্রদায় তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। দলিত পৌণ্ড্রদের মধ্যে তখন শিক্ষার অভাব ছিল তাই তারা তাদের যোগ্যতম নেতা কে তারা সঠিক সম্মান দিতে পারেনি। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা পৌঁছালেও তারাও সঠিক সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেননি।

উনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ তথা বাংলা ছিল বর্ণবৈষম্য ও জাতি বৈষম্যে পরিপূর্ণ। ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাত ব্যবস্থা প্রকট হয়ে উঠে ছিল। এবং সামাজিক মেলামেশা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও ছিল জটিল। এইরকম পরিবেশে রাইচরণ তাঁর শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করেছিল বিবিধ বাধা থাকা সত্ত্বেও যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন জাতব্যবস্থার নিম্নস্তরে অস্পৃশ্য দলিত সম্প্রদায়ের সন্তান। সেই জন্য তিনি তার নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষার প্রদীপে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

উচ্চবর্ণীয় অদলিত সম্প্রদায়ের কাছে ছিলেন বঞ্চিত অবহেলিত লাঞ্ছিত। তার কারণ স্পষ্ট রাইচরণ ছিলেন জাতব্যবস্থার নিম্নস্তরে শূদ্র দলিত সন্তান। সেই জন্য উচ্চ বর্নীয়দের কাছে সঠিক সম্মান পায়নি। তার শিক্ষার প্রসার, সমাজ সংস্কারক আন্দোলন ভালোভাবে গ্রহণ করেননি উচ্চবর্ণীয়রা এবং প্রতিষ্ঠা করতেও চায়নি।[১০৬]

অদলিত সন্তান রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখের বিশিষ্ট সংস্কার আন্দোলনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তাদেরকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। এছাড়া ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান দিয়েছেন।[১০৭] ব্রাহ্মণ্যবাদী জাত ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকগণ তাকে চাকুরী থেকেও বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু তলা থেকে ইতিহাস রচনার ইতিহাস শুরু হতে বিবিধ রচনাবলী তার শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন সামাজিক আন্দোলন গুলো ইতিহাসে স্থান করে নিতে শুরু করেছে।

রাইচরণ সরদার তার নিজের সমাজের কাছেও সঠিক সম্মান পায়নি। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ তথা বাংলা ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে। বিশেষত দলিত পৌণ্ড্র সমাজ ছিল অশিক্ষার আবর্তে। পৌণ্ড্র সমাজ তাদের সমাজের প্রথম স্নাতক ব্যক্তি রাইচরণকে অনুভব করতে পারেনি।[১০৮]

আমরা জানি শিক্ষা আনে মানুষের মধ্যে চেতনা যেহেতু সমকালীন বাংলার পৌণ্ড্র সমাজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল সেই কারণে তাদের মধ্যে সচেতনতার উদয় হয়নি। ফলে তারা তাদের সমাজের প্রথম বি এল পাস ব্যক্তি কে যোগ্য সম্মান দিতে পারেনি।[১০৯]

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বৃহত্তম তপশিলি পৌণ্ড্র জাতি রাইচরণের সময় ছিল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই তারা রাইচরনের শিক্ষা সংস্কার সামাজিক আন্দোলন থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। যদি তারা তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারতো তাহলে আজকের পৌণ্ড্র সমাজ শিক্ষা, চাকুরী সংস্কৃতিতে অনেক এগিয়ে থাকতো।[১১০]

এতদসত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে পৌণ্ড্র সম্প্রদায় এর কিছু কিছু ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলার দলিত আন্দোলনকে বর্তমানেও সচল ভাবি এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ধূর্জটি নস্কর, শ্রীগোবর্ধন দাস, রাধাকৃষ্ণ নস্কর, ননীগোপাল মন্ডল, গৌতম মন্ডল, হরষিত সরকার, কৃষ্ণকুমার সরকার প্রমুখ।

তারা রাইচরণ সরদার প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করে চলেছেন এবং রাইচরণ সরদার যাতে যোগ্য সম্মান পাই তার দাবি তুলেছেন। এবং সঙ্গে আক্ষেপে করেছেন। রাইচরণ ছিলেন শিক্ষা প্রসারক সমাজ সংগঠক ঐতিহাসিক তা সত্ত্বেও বর্তমান সময় পর্যন্ত তার নামাঙ্কিত কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়নি সমগ্র পশ্চিম বাংলাতে। এবং দক্ষিণবঙ্গের কোনো স্থানেও।[১১১] অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলায় কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বর্তমানে দলিত আন্দোলনের নেত্রী বর্গ রাইচরণের নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালো করেছেন।[১১২]

এছাড়া ডায়মন্ড হারবার ওমেন্স ইউনিভার্সিটি কে মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে ঘোষণা করার জন্য বিবিধ আলোচনা সভাতে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট জনেরা।[১১৩]

৩.১০.পর্যবেক্ষন: শ্রী রাইচরণ সরদার ছিলেন একজন প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। সমাজ সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, দলিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। স্বভাবে তেজী কিন্তু বিনয়ী। তিনি নিজ জীবনে বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কোন ছুঁৎমার্গ বিশ্বাস করতেন না। সর্বধর্ম ও সর্ববর্ণের মানুষকে অকৃত্রিম ভালবাসতেন। এমনই এক

সহজ সরল ব্যক্তি রাইচরণ ১৯৪২ সালের ২৪শে জানুয়ারি মাত্র ৬৬ বছর বয়সে প্রান্ত্যাগ করেন।[১১৪] ধর্ম বিষয়ক এবং জাতি পরিচিতি বিষয়ে বিবিধ তত্ত্ব থাকলেও তাদের প্রধান পরিচয় পৌন্ড্র। তাদের মধ্যে অন্যতম জ্যোতিষ্ক হলেন দিন সেবক মহাত্মা রাইচরণ সরদার। তৎকালীন সময়ে রাইচরণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও গ্রামে গঞ্জের অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তবে তিনি তার পৌণ্ড্র জাতির উন্নতি কল্পে সমাজে উঁচু তলার গান্ধীজী প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখতেন।[১১৫] তার ব্যক্তিগত জীবনে একদিকে ছিল চরম সংকট এবং উত্তরণের পরীক্ষা। এছাড়া অন্যদিকে ছিল পৌন্ড্র সম্প্রদায় তথা সকল সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। যা আমরা তার বিবিধ কার্যকলাপে উপলব্ধি করতে পেরেছি। যেমন শিক্ষা বিস্তার সমাজ, সংস্কার, সমাজ সংগঠন সবেতেই তার অবদান ছিল অকৃত্রিম।

উনবিংশ শতকে পিছিয়ে থাকা দলিত সমাজের পৌণ্ড্র সম্প্রদায় কে এগিয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিতে যে সমস্ত বিভিন্ন গুণাবলীর এবং অধ্যাবসায় প্রয়োজন রাইচরণ বাবু তিনি তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১৬] রাইচরণ যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি সেই সময় বা যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই জন্য তিনি নিজে সম্প্রদায়কে আধুনিক যুগের উপযুক্তভাবে গড়ে তৈরি করা ছিল তার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। পৌণ্ড্র সমাজকে আধুনিক করে তুলতে রাইচরণ তার অগ্রজ শ্রী বেণীমাধব হালদার মহাশয় কে এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে পেয়েছিলেন মেদিনীপুর নিবাসী ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করন মহাশয় কেও।[১১৭] রাইচরণ সরদার তার জীবদ্দশায় বহু শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, বহু পত্রপত্রিকা, অসংখ্য সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তার নিজ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ কে ওইসব প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক পদে অলংকৃত করেছেন। কিন্তু নিজে প্রচারের আলোয় আসেননি। এটি তার উদার মনোভাবের পরিচয়ক। এই সমস্ত কিছুর প্রধান কারণ ছিল তার নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা। তাই রাইচরনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রবন্ধকার শ্রী শশাঙ্ক শেখর মৃধা তার "মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও সমাজ উন্নয়ন" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে রাইচরণ বাবু একজন সমাজ বিপ্লবের জ্যোতিষ্ক। এই জ্যোতিষ্কের কিরণ থেকে আমাদের আলো নিতে হবে। তাঁর কর্ম প্রেরণা তাঁর সমাজ উন্নয়নের ধারা। আমাদের উত্তাপ দেবে আমাদের সমৃদ্ধ করবে।[১১৮]

এতদসত্বেও পৌন্ড্র সমাজের অগণিত মানুষজন বর্তমান সময়েও মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামের সহিত তাঁর কর্মজীবনের সহিত পরিচিত হতে পারেনি। পৌণ্ড্র সমাজ তথা সমগ্র দলিত সমাজের কাছে এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আরো পরিতাপের বিষয় হল যে এইরকম একজন মহান মহৎ ব্যক্তির নামে বাংলা তথা তাঁর নিজের জেলাতে আজ পর্যন্ত তার নামে কোনো রাস্তার নাম বা কোন প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয়নি। কিন্তু তা সত্বেও ভবিষ্যৎ আশার আলো প্রস্ফুটিত হচ্ছে। কারণ বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে দলিত আন্দোলন তথা পৌন্ড্র সম্প্রদায় বিবিধ আন্দোলন জোরদার করছে। আর তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে কিছু প্রবীণ এবং নবীন গবেষক শিক্ষক এবং আরো অন্যান্য পেশার ব্যক্তিবর্‌গ। এছাড়া পৌন্ড্র মহাসংঘ, পৌন্ড্র সমাজ পরিচয়, পৌন্ড্র দর্পণ সহ বিবিধ পত্রিকা এবং সংগঠন। বিবিধ সভা সমিতি ও

সংগঠনে রাইচরণের নামে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোরালো আবেদন উঠছে। এবং তা ভবিষ্যতে পূরণ হবে আমরা তা আশাবাদী।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. জীবন মুখোপাধ্যায়: '*ইতিহাস শিক্ষক*', (কলকাতা, স্কলার বুকস, ২০০৯), পৃ. ১৩৩।

২. দিলীপ গায়েন (সম্পাদনা): '*মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ*', (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, ২০১১), পৃ. ২৯।

৩. বিমলেশ মান্না: '*ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত চেতনা: রাইচরণ সরদার ও অদ্বৈত মল্লবর্মনের একটি তুলনামূলক আলোচনা*', অপ্রকাশিত এম. ফিল গবেষণা সন্দর্ভ, (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, ২০১৬), পৃ. ৬১।

৪. মনোহরমৌলি বিশ্বস ও শ্যামল কুমার প্রামানিক (সম্পাদনা): '*শতবর্ষের বাংলা দলিত সাহিত্য*', (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০১১), পৃ. ৫৭।

৫. ধূর্জটি নস্কর: '*বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক রাইচরণ সরদার*', (দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, দেবলা প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ৯।

৬. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদনা): '*পৌণ্ড্র মনীষা*', (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, ২০১২), পৃ. ২৫৫।

৭. *তদেব*, পৃ. ২৫৫।

৮. ড. সনৎকুমার নস্কর: *'পৌণ্ড্রগৌরব তিন মনীষীর জীবন ও সাধনা'*, চতুর্থ বার্তা, অক্টোবর ২০২২ ও মার্চ ২০২৩, সুধাংশুকুমার সরকার (সম্পাদক), (কলকাতা, ২০২৩), পৃ. ৩৬।

৯. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

১০. *তদেব*, পৃ. ১০।

১১. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮।

১২. *তদেব*, পৃ. পৃ. ২৬৯-২৭৯।

১৩. *তদেব*, পৃ. ২৭০।

১৪. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১৫. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫।

১৬. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

১৭. *তদেব*, পৃ. পৃ. ১৩-১৪।

১৮. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত*, পৃ. পৃ. ২৭৭-২৭৮।

১৯. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

২০. *তদেব*, পৃ. পৃ. ১৫-১৬।

২১. *তদেব*, পৃ. ১৬।

২২. ড. সনৎকুমার নস্কর: *‘পৌণ্ড্রগৌরব তিন মনীষীর জীবন ও সাধনা’, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০।

২৩. ড. সনৎকুমার নস্কর: *তদেব,* পৃ. ৪০।

২৪. *তদেব,* পৃ. ৪০।

২৫. ধূর্জটি রায় লশকর: *‘পুণ্ড্র পৌণ্ড্র জাতি ও সভ্যতার ইতিহাস’,* (দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, দেবলা প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ. ৬৬।

২৬. কৃষ্ণপদ গায়েন: *‘পৌণ্ড্র দর্পণ’,* কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৪।

২৭. ধূর্জটি রায় লশকর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭১।

২৮. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫।

২৯. দিলীপ গায়েন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭।

৩০. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫।

৩১. দিলীপ গায়েন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৩২. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১৮।

৩৩. সাক্ষাৎকার: ধূর্জটি নস্কর, বয়স ৭৭, দক্ষিন বারাসাত, চব্বিশ পরগনা। (এ জি বেঙ্গলের প্রাক্তন আধিকারিক, বর্তমান পৌণ্ড্রসমাজ আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা, বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও গবেষক)। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮/০২/২০১৬।

৩৪. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫।

৩৫. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা': বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী',* Literature, Culture And Society, (সম্পাদক অরেন্স মহলদার ও দেবদীপ ধীবর), (কলকাতা, মহাবোধী বুক আজেন্সি, ২০১৫), পৃ. ২৪৩।

৩৬. *তদেব,* পৃ. ২৪৩।

৩৭. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'পৌণ্ড্র জাতির জাতিসংগঠন ও কার্যক্রম: একটি আলোচনা (১৮৭২-১৯৪৭)',*ইতিহাস প্রবন্ধমালা, সংখ্যা ১৭, (সম্পাদক অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা), (ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২২), পৃ. ২৭৮।

৩৮. *তদেব,* পৃ. ২৮৫।

৩৯. *তদেব,* পৃ. ২৮২।

৪০. ড. সনৎকুমার নস্কর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮।

৪১. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০।

৪২. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'পৌণ্ড্র জাতির জাতিসংগঠন ও কার্যক্রম: একটি আলোচনা (১৮৭২-১৯৪৭)', প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮৫-২৮৬।

৪৩. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১।

৪৪. প্রকাশচন্দ্র রায়: *'পুড়ো-পোদ্দরাজ তথা পৌণ্ড্র জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস',* (উত্তর প্রদেশ, নীলশিখা প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৩০।

৪৫. ধূর্জটি রায় লশকর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭১।

৪৬. উৎপল বিশ্বাস (সম্পা): '*গনমুক্তি',* ১০ ম উদ্যোগ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংখ্যা, (ঢাকা, বি এস প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৯), পৃ. ৫৬।

৪৭. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১।

৪৮. *তদেব,* পৃ. ৩১।

৪৯. রাইচরণ সরদার: '*স্মৃতি-অর্ঘ্য মহাত্মা শ্রীমন্তচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (কবিবর)। 'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা'* র সপ্তম অধ্যায়ে (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের) বিবৃত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সনৎ কুমার নস্কর (সম্পা) পৌণ্ড্র মনীষা , (কলকাতা, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ , ২০১২), পৃ. পৃ. ৪৪২-৪৪৫।

৫০. কৃষ্ণপদ গায়েন: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩২।

৫১. কৃষ্ণ কুমার সরকার: '*দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা': বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী', প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪২।

৫২. মনোহরমৌলি বিশ্বস ও শ্যামল কুমার প্রামানিক (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ১৬-১৭।

৫৩. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭।

৫৪. বিমলেশ মান্না: *প্রাগুক্ত* পৃ. ৬৫।

৫৫. ধূর্জটি রায় লশকর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৭।

৫৬. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭।

৫৭. *তদেব,* পৃ. ১৭।

৫৮. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪।

৫৯. হীরেন চট্টোপাধ্যায়: *'সাহিত্য প্রকরন',* (কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১), পৃ. ২৭।

৬০. দিলীপ গায়েন (সম্পাদনা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭।

৬১. দিলীপ গায়েন (সম্পাদনা): *'পৌণ্ড্রসমাজ পরিচয়',* (কলকাতা, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১০), পৃ. ৫৯।

৬২. *তদেব,* পৃ. ৫৯।

৬৩. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা': বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী', প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩৬।

৬৪. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদনা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫৮।

৬৫. রূপ কুমার বর্মন: *'হ্যাঁ নিম্ন বর্ণীয়রা লিখতে পারে',* বাংলা জর্নাল, ২১শ সংখ্যা, ইকবাল করিম হাসনু (সম্পাদক), (কানাডা , টইটুম্বর, ২০১৫), পৃ. ৬০।

৬৬. ধূর্জটি লশকর: *'পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ সভ্যতা',* (কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ২০০৮), পৃ. ৫৩।

৬৭. কৃষ্ণ কুমার সরকার: '*দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা': বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী', প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩৭।

৬৮. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৭৫-২৭৬।

৬৯. শুভঙ্কর দে (সম্পা): *'ভারতের সামাজিক ইতিহাস অনূর্দ্ধ ৩০ এর কলমে',* (কলকাতা, আবিষ্কার, ২০১৬), পৃ. ১৩৯।

৭০. ধূর্জটি নস্কর: *'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৬), পৃ. ৪৫।

৭১. সোমেন বসু: *'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী',* (কলকাতা, রবীন্দ্রচর্চা ভবন, ১৯৯৩), পৃ.পৃ. ৬-৭।

৭২. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৭০।

৭৩. দিলীপ গায়েন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০।

৭৪. *তদেব,* পৃ. ৪০।

৭৫. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৩৫।

৭৬. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪৩৬-৪৩৯।

৭৭. *তদেব,* পৃ. ৪৪৫।

৭৮. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *‘আত্মচেতনার উন্মেষ: পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনে পত্র পত্রিকার অবদান(১৯১০-১৯৭০)’*, বাংলা জর্নাল, ২১শ সংখ্যা, ইকবাল করিম হাসনু (সম্পাদক), (কানাডা, টইটুম্বর, ২০১৫), পৃ. ৮৩।

৭৯. মহেন্দ্রনাথ করণ: *‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুল-প্রদীপ’*,১৯২৮ (কলকাতা, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, পুনর্মুদ্রণ ২০০১), পৃ. ১৯৮।

৮০. কৃষ্ণ কুমার সরকার: ‘*দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা’: বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী’, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪৪।

৮১. লাল্টু মাইতি: *‘দলিত লেখকের আত্মজীবনীঃ প্রসঙ্গ মনোরঞ্জন ব্যাপারী’*, চতুর্থ বার্তা, অক্টোবর ২০২২ ও মার্চ ২০২৩, সুধাংশুকুমার সরকার (সম্পাদক), (কলকাতা, ২০২৩), পৃ. ২৩৫।

৮২. ধূর্জটি নস্কর: ‘*বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক রাইচরণ সরদার’*, (দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, দেবলা প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ২০।

৮৩. রাইচরণ সরদার: *‘শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র* (বারুইপুর, সরস্বতী প্রেস, ১৯৪১), পৃ পূর্বাভাস দ্রষ্টব্য।

৮৪. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯১।

৮৫. রাইচরণ সরদার: *‘শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র ’, প্রাগুক্ত,* পৃ. পূর্বাভাস দ্রষ্টব্য।

৮৬. *তদেব,* পৃ. ২।

৮৭. *তদেব,* পৃ. ৩।

৮৮. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯২।

৮৯. *তদেব,* পৃ. ২৯২।

৯০. রাইচরণ সরদার: *প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড,* পৃ. ৪৯।

৯১. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪৯-৫০।

৯২. অঞ্জন গোস্বামী: *'ভারত অনুসধান প্রথম খণ্ড',* (কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০৪), পৃ. ১০।

৯৩. বিমলেশ মান্না: *প্রাগুক্ত* পৃ. ৭৭।

৯৪. *তদেব,* পৃ. ৭৮।

৯৫. শান্তি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক): *'অনন্য সাহিত্য পত্রিকা',* (বারুইপুর , ২০১১), পৃ. ৯।

৯৬. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১।

৯৭. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৮-১৯।

৯৮. *তদেব,* পৃ. ২০।

৯৯. শান্তি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১।

১০০. কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'পোদ থেকে পৌণ্ড্র: বাংলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক আলোচনা',* ডঃ সুধাংশু কুমার সরকার (সম্পাদক), ((কলকাতা, চতুর্থবার্তা, ২০১৫), পৃ. ৭২।

১০১. শান্তি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০।

১০২. বিমলেশ মান্না: *প্রাগুক্ত* পৃ. ৯৫ ।

১০৩. ধূর্জটি নস্কর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২।

১০৪. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪৫৬-৪৫৭।

১০৫. *তদেব,* পৃ. ৪৫৬।

১০৬. সাক্ষাৎকার: কৃষ্ণকুমার সরকার, বয়স-৩৮, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন'স কলেজ, মেদিনীপুর। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫/০৭/২০২৩।

১০৭. সাক্ষাৎকার: কৃষ্ণকুমার সরকার, বয়স-৩৮, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন'স কলেজ, মেদিনীপুর । সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫/০৭/২০২৩।

১০৮. সাক্ষাৎকার: গোর্বদ্ধন দাস, বয়স- ৮৭, ভাঙ্গাগড়া, মহিষাদল, পুর্বমেদিনীপুর। সাবডিভিশনাল অফিসের ক্লার্ক। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৯/০৭/২০২২।

১০৯. সাক্ষাৎকার: দিলীপ গায়েন, বয়স- ৫৮, সোনারপুর, দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, শিক্ষক, নলতা মহাজাতি হাইস্কুল ফর বয়েজ, দমদম, উত্তর চব্বিশ পরগণা। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০/০৮/২০২৩।

১১০. সাক্ষাৎকার: হরষিত সরকার, বয়স- ৪৮, অশোক নগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক।

১১১. ধূর্জটি রায় লশকর: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৪।

১১২. *তদেব,* পৃ. ৭৫।

১১৩. *তদেব,* পৃ. ৭৫।

১১৪. শশাঙ্কশেখর মৃধা: 'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও সমাজ উন্নয়ন', দিলীপ গায়েন (সম্পা): *'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ',* (কলকাতা, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১১), পৃ. ৫২।

১১৫. দিলীপ গায়েন: 'পৌণ্ড্রসমাজ জাগরণ-আন্দোলন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও মহাত্মা রাইচরণ সরদারের ভূমিকা', দিলীপ গায়েন (সম্পাদনা): *'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ',* (কলকাতা, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১১), পৃ. ৫৮।

১১৬. ড. সনৎকুমার নস্কর 'পৌণ্ড্রগৌরব তিন মনীষীর জীবন ও সাধনা', ডঃ সুধাংশু কুমার সরকার (সম্পাদক): *'বিশেষ সংখ্যা দলিত মনীষী ও দলিত লেখক',* ((কলকাতা, চতুর্থবার্তা, মার্চ,২০২৩), পৃ. ৪১।

১১৭. *তদেব,* পৃ. ৪১।

১১৮. শশাঙ্কশেখর মৃধা: 'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও সমাজ উন্নয়ন', দিলীপ গায়েন (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫২।

চতুর্থ অধ্যায়

(CHAPTER FOUR)

বাংলার দলিত চেতনায় মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের (১৯০৪-১৯৬৮) অবদান

৪.১. ভূমিকা: আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি ট্র্যাজেডি খুবই ভয়ংকর যার মধ্যে একটি ঘটেছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রহ এবং আরেকটি ১৯৪৭-এ দেশভাগ। আর এই দুটি ঘটনা একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। মাঝখানে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাকাব্য যদিও সে সংগ্রামের পরিণতি মহাকাব্যিক হয়নি, হয়েছে ট্র্যাজিক। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্টে যে ঘটনাটা ঘটল আপাতদৃষ্টিতে তা ছিল প্রায় অসম্ভব এবং পুরোপুরি অকল্পনীয়। কেউ ভাবেনি এমনটি ঘটবে। স্বাধীনতার নামে যে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাওয়া যাবে এবং ভারতবর্ষ যে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো ডমিনিয়ন হয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভেতরেই রয়ে যাবে এটা মোটামুটি জানা ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এ ব্যাপারে সম্মত ছিল কিন্তু দেশভাগ ঘটবে বাংলা ও পাঞ্জাব দু-টুকরো হয়ে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অংশ হবে—এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।[১]

মুসলিম লীগ যা চেয়েছিল সেটা হল মুসলমানদের অন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি তার জন্য যে দেশভাগ প্রয়োজন হবে এটা তারা কেউই ভাবেনি। অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তারা যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি সহজ সরল কেন্দ্রের অধীনে তিনটি ভৌগোলিক গ্রুপ তৈরির ধারণাটাকে গ্রহণ করেছিল, তার পেছনে এই বোধ কার্যকর ছিল এর বেশি পাওয়া যাবে না। কংগ্রেস সেটা মানতে রাজি হয়নি। কারণ তাদের বক্তব্য ছিল ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ এবং তাকে কোনো রকমেই বিভাজিত করা চলবে না। তবে দুই পক্ষই আবার এই ব্যাপারে একমত ছিল যে প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাবে না রাষ্ট্র থাকবে এককেন্দ্রিক। তবে বিরোধটা ছিল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা কীভাবে ভাগ করা যায় তা নিয়ে। আর সমস্যা হল যে জওহরলাল নেহরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেউই প্রাদেশিক নেতা হতে চাননি চেয়েছেন সর্বভারতীয় নেতা সর্বোপরি সর্বভারতীয় প্রশাসক।[২]

যদিও এক জাতির দেশ বলে দাবি করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষের দিকের বিভিন্ন সময়ে কিন্তু তাঁর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সাতচল্লিশের দেশভাগের বীজ। কারণ এক জাতির দেশ বলার অর্থ দাঁড়িয়েছিল হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য আলাদা আলাদা দেশের কথা বোঝানো হচ্ছিল উহ্য ভাবে। আসলে ভারতবর্ষ তো কখনোই এক জাতির দেশ ছিল না, ছিল বহু জাতির দেশ। আর সে জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম নয়, ভাষা। তাই একদেশ এক জাতি মানেই অন্যান্য জাতির থেকে বিচ্ছিন্ন করা। সে হিসাবে ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষে একটি-দুটিও নয়, সতেরোটি জাতি ছিল। ভারতবর্ষের মানুষের জন্য প্রধান সমস্যাটা ছিল শ্রেণীগত।[৩] কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ কেউই শ্রেণি সমস্যার সমাধান চায়নি। দুই দলই ছিল বিত্তবানদের সংগঠন। তারা চেয়েছে ইংরেজ শাসকেরা তাদের কাছে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবে। এবং তারা গদিতে

বসে পড়ে ঠিক সেভাবেই দেশ শাসন করবে যেভাবে ইংরেজরা করেছে। শাসন মানে আগের মতোই দাঁড়াবে শোষণ। শ্রেণী বিভাজনের সমস্যা সমাধান করতে হলে সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল সেটা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউ চায়নি ইংরেজরা তো চায়ইনি। ইংরেজরা চেয়েছে তাদের আনুকূল্যে তৈরি বিত্তবান তাঁবেদার শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাবে যাতে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে।[৪]

৪.২. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার প্রাথমিক পরিচয়

দেশভাগ হয়েছে এই তিন পক্ষের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। মেহনতি মানুষের ধারেকাছেও ছিল না। বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের দর-কষাকষি চলেছে। জিন্নাহ ও নেহরুর সঙ্গে বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। নেহরুর সঙ্গে তো সম্পর্কটা বন্ধুত্বের পর্যায়েই চলে গিয়েছিল। এই বন্ধুত্ব বড়লাটের স্ত্রী পর্যন্ত গড়িয়েছিল। নেহরু-জিন্নাহর কলহটা ছিল পৈতৃক সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মতো। বাগ্বিতণ্ডা চলল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই ভাই-ই মেনে নিলেন যে ক্ষমতার ভাগটা দেশভাগ ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে গেল যেখানে কোনও ক্ষতি বিত্তবানদের হয়নি। ক্ষতি হয়েছে সাধারণ মানুষের। সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি, তবে ধারণা করা হয় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ শরণার্থী হয়েছে। দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে কমপক্ষে ৫ লাখ।[৫] এত বিপুল সংখ্যক মানুষের দেশত্যাগের ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ক্ষতিটা অপূরণীয়। সাংস্কৃতিক ক্ষতির হিসাব করা যায়নি যাবেও না, অথচ মূল যে সমস্যা সেটা হল শ্রেণী বিভাজনের তার কোনো সমাধান ঘটল না । ধনী

গরীব এর পার্থক্য আগের মতোই রয়ে গিয়েছিল। উন্নতি যা হয়েছিল তা কেবল মাত্র বিত্তবানদের সেই উন্নতির বাহক হয়ে থাকল মেহনতি মানুষ, আগে যেই তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল দুই দিকের দুই জাতীয়তাবাদী দলের হাতে। শ্রেণী সমস্যার সমাধানের চেষ্টা সমাজতন্ত্রীরা করেছিলেন। তাঁরা সংগ্রামে ছিলেন। কিন্তু নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল দুই দিকের দুই জাতীয়তাবাদী দলের হাতে। যারা ছিল পুঁজিবাদে দীক্ষিত এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী। বস্তুত দেশভাগে তড়িঘড়ি সম্মত হওয়ার পেছনে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা তো ছিলই আরও বড় করে ছিল সমাজবিপ্লবের ভয়।[৬] হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার একটা মীমাংসা সম্ভব কিন্তু বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটলে সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে—আটি তো যাবেই আমও হাতছাড়া হবে। অতএব যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভালো।[৭] অস্পষ্টভাবে হলেও নেহরু-জিন্নাহরা জানতেন ইংরেজের সঙ্গে দর-কষাকষি সম্ভব কিন্তু মেহনতিরা উঠে এলে কোনো আলাপই চলবে না। তাঁরা জানতেন ইংরেজ তাঁদের শত্রু বটে, তবে আরও বড় শত্রু হচ্ছে স্বদেশি মেহনতি মানুষ।[৮] এর প্রমাণ সুন্দরভাবে পাওয়া গেছে ‘স্বাধীনতা’র পরে। ভারতে কংগ্রেস বিরোধী মুসলিম লীগ নিষিদ্ধ হয়নি যেমন পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়নি মুসলিমলীগ বিরোধী কংগ্রেস। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রেই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি।[৯]

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সময় বাংলায় জাতি গত সমস্যা মাথা তুলে দাড়িয়েছিল, যদিও এটি অনেক আগে থেকেই সমাজের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।[১০] তবে একথা উল্লেখ্য শ্রেণী সমস্যা আড়াল করার জন্যই কিন্তু জাতি সমস্যাকে প্রধান করে তোলা

হয়েছিল। এবং জাতীয়তার মূল ভিত্তি যে ভাষা সেটাকে অস্বীকার করে ধর্মকে নিয়ে আসা হয়েছিল সামনে।[১১] ফলে সম্প্রদায় জাতি হয়ে গেল জাতি রয়ে গেল আড়ালে। কংগ্রেস বলল দেশটা এক জাতির, মুসলিম লীগ বলল সেটা সত্য নয়, দেশ দুই জাতির। এক ও দুইয়ের হট্টগোলে সতেরো জাতি হারিয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টি সতেরোটি জাতির কথা বলেছিল, কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ তৎপরতার কারণ ওই সত্যটিকে সামনে নিয়ে আসতে পারেনি।[১২] বহু জাতিত্বের সত্যটাকে অস্বীকার করার পেছনে পরস্পরের শত্রু দুই দল এক হল কেন? এক হল এই জন্য যে দুই দলই ধর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে। কংগ্রেস যতই নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করুক তাদের 'বন্দে মাতরম' রণধ্বনি মুসলমানদের কাছে টানেনি, বরং 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ তুলতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ধর্মকে সামনে নিয়ে আসাতে আরও একটি সুবিধা হয়েছে।[১৩] তা হল মেহনতিদের শ্রেণী সচেতনতাকে ভোঁতা করে দেওয়া। গরিব হিন্দু ও গরিব মুসলমান যে ভাই ভাই এবং তারা উভয়েই যে ধনীদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে—এই চেতনা যদি সজীব থাকে তাহলে হিন্দু ধনী ও মুসলমান ধনী দুজনেরই বিপদ। তাই হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলমানের মুসলিম লীগ দুই দলই মেহনতিদের তাদের গরিব পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়কে প্রধান করে তুলতে চেয়েছে। এবং পেরেছেও। নইলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হবে কেন?[১৪]

জাতি প্রশ্নের সমাধান জাতীয়তাবাদী দুই পক্ষের কোনো পক্ষই চায়নি। তাদের ভেতর অকথিত চুক্তি ছিল যে ধর্মের প্রশ্নটিকে তারা জিইয়ে রাখবে শ্রেণী প্রশ্নটি

ঠেকানোর জন্য। কংগ্রেস বলেছিল ভারতকে খণ্ডিত করাটা তারা কিছুতেই মেনে নেবে না, মুসলিম লীগ বলেছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলার পুরোটাই তাদের চাই। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন দ্বিখণ্ডীকরণ মেনে নিল, মুসলিম লীগইবা কেন 'কীট-দষ্ট' পাকিস্তানে সম্মত হল? নানা কারণের কথা আমরা জানি।[১৫] যেমন কংগ্রেস ভাবছিল লীগ যখন কিছুতেই তাদের দাবি ছাড়বে না তখন কিছুটা ছাড় দিয়ে বড় অংশটা নিয়ে নেওয়া যাক। তা ছাড়া তাদের ধারণা ছিল যে খণ্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাব নিজেরা টিকিয়ে রাখতে পারবে না এবং ১০ কি ২০ বছর পরে ভারতের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়ে যাবে। ভাগাভাগিটা তাই সাময়িক মাত্র। সম্মত হওয়ার পেছনে আরেকটি বিবেচনার কথাও জানা যায় যা স্বয়ং নেহরু স্বীকার করেছেন।[১৬] সেটা হল তাঁদের বয়স হয়ে যাচ্ছিল এবং জেল খাটতে খাটতে তাঁরা ক্লান্ত বোধ করছিলেন। জিন্নাহকে অবশ্য জেল খাটাখাটনির বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি, কিন্তু বয়স তাঁরও হয়েছিল। এবং অন্যরা জানত না বটে, তবে তিনি জানতেন যে তাঁকে ক্ষয়রোগে ধরেছিল। যার দরুন হাতে বেশি সময় ছিল না নষ্ট করার মতো। কিন্তু মেহনতিদের অভ্যুত্থানের ভয়টা তাঁদের সবারই ছিল। সেটাই ছিল অস্বীকৃত চালিকাশক্তি। অভ্যুত্থানের লক্ষণ তো দেখাও যাচ্ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের প্রতি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ সমর্থন, নৌবিদ্রোহ (১৯৪৬)[১৭], সামরিক বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের ভেতর অসন্তোষ, সর্বোপরি শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি—সবকিছুই বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আভাস দিচ্ছিল। এই ধরনের অভ্যুত্থানের আশঙ্কাতে ইংরেজরাও উদ্বিগ্ন ছিল।[১৮]

এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৫৭-এর সিপাহি অভ্যুত্থান দেখে ইংরেজরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[১৯] সিপাহি অভ্যুত্থানে মধ্যবিত্ত যে যোগ দেয়নি এটা ছিল ইংরেজদের জন্য একটা বড় ভরসা। ভবিষ্যতের কোনো অভ্যুত্থানে যদি মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ মেহনতিদের বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে তাকে দমন করা যে সম্ভব হবে না এটা তারা বুঝে নিয়েছিল। তাই তাদের চেষ্টা ছিল কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও মধ্যবিত্তকে আরও কাছে টেনে নেওয়া। এর জন্যই কংগ্রেস গঠনে উৎসাহদানে তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্তের একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থাকবে সেখানে তারা অভাব-অভিযোগের কথা বলবে এবং আবেদন-নিবেদন করবে, অর্থাৎ 'স্টিম' ছাড়তে পারবে। মেহনতিদের সঙ্গে মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত দূরত্বকে আরও গভীর করার লক্ষ্যেই মধ্যবিত্তকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গড়তে উৎসাহিত করা হয়েছিল।[২০] তবে শ্রেণিবিভাজনের চেয়েও বেশি ভরসা ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ওপর। কেননা ধর্মীয় উন্মাদনা অন্য চেতনাকে কমিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে এবং ওই উন্মাদনা পারে না এমন কাজ নেই।[২১]

ধর্মীয় বিভাজনকে উসকে দিয়ে 'ভাগ করো ও শাসন করো নীতির' বাস্তবায়নের চেষ্টা চতুর ইংরেজ শুরু থেকেই করে এসেছে। সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ায় তারা প্রথমে কংগ্রেসের এবং পরে মুসলিম লীগ গঠনের উৎসাহ জোগাল। সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে দেখানোটা আগেই শুরু করেছিল পরে এসেছে পৃথক নির্বাচন।[২২] হিন্দুরা ছিল প্রতিষ্ঠিত, মুসলমানরা ছিল উঠতি—এই দুইয়ের বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে সাম্প্রদায়িক রূপদানে ইংরেজের

তৎপরতা বাড়তেই থাকল। উল্লেখ্য ইংরেজ আগমনের আগে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ছিল কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা তৈরি হয়েছে ইংরেজ আগমনের পরে এবং তাদের প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ উসকানিতে।[২৩] সাম্প্রদায়িকতার এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। ধর্মকে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই ব্যবহার করেছে এবং ইংরেজ তাতে হাওয়া দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এবং সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে—দেশভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই।[২৪]

তবে এই দেশভাগ সকল নেতৃবৃন্দ যে মেনে নিয়েছিল তা কিন্তু একেবারেই নয়। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুগে যুগে শত শত দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ ও মহা মানবের আবির্ভাব হয়েছে, তার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লেখা রয়েছে। এই রকম এক দেশ প্রেমিক যিনি দেশ বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হওয়া উৎবাস্তু সমস্যার কি সমাধান করা যায়, তাই নিয়ে তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছিলেন, যেখানে অন্যান্যরা ক্ষমতা ভোগ করতে ব্যাস্ত ছিলেন। তাই এক কথায় বলা যায় উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত স্বদেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদ জন্মগ্রহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহাপ্রান যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪-১৯৬৮)।[২৫] যার জন্ম ভারতের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণে হয়েছিল আর তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ভারত স্বাধীনতার প্রায় দুই দশক পর। স্বদেশের জন্য বলিপ্রদত্ত ঐ মহা মানবদের অবদান চিরস্মরনীয় এবং দেশের জনগনের কাছে সর্বদা তাঁরা বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন অনান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতই। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন তাঁদের মধ্যে

অন্যতম যিনি অবিভক্ত বাংলা তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রান।[২৬] প্রাধানত তিনি ছিলেন ভারতের অস্পৃশ্য জাতির সমানাধিকার রক্ষায় একনিষ্ঠ ব্যক্তি।[২৭] ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সূচনা পর্ব থেকেই চতুর্থ বর্ণের অস্পৃশ্য মানুষেরা ছিলেন সার্বিক অধিকার থেকে বঞ্চিত যেটা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে বার বার নাড়া দিচ্ছিল।[২৮] তাই মহাপ্রান যোগেন্দ্রনাথ বলীষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন যে "ব্রাক্ষনের পদধূলি গ্রহন এবং মন্দিরে প্রবেশের দ্বারা আপনাদের কোনও উপকার ও দুঃখ-কষ্ট লাঘব হইবে না। কে আপনাদের দুঃখ-কষ্টের অবসান করিবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে"।[২৯]

বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় সমাজের সংস্কার দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং সংস্কারে যোগদান করার জন্যই বোধহয় মহাপ্রান যোগেন্দ্রনাথের আর্বিভাব হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্ভুক্ত মৈস্তারকান্দি গ্রামে ১৯০৪ সালের ২৯ শে জানুয়ারি তিনি জন্ম গ্রহন করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন কৃষিজীবি নমঃশূদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার নাম ছিল রামদয়াল মণ্ডল ও মাতা ছিলেন সন্ধ্যা দেবী। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার ছয় সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।[৩০] বাল্যকাল থেকেই স্বাধীনও দৃঢ়চেতা মননের অধিকারী ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। ফলে তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই একটু বেশি বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। যদিও বাড়িতে তাঁর সম্পূর্ণ অক্ষর জ্ঞান তৈরি হয়েছিল। পারিবারিক আর্থিক দারিদ্র এবং বহুবিধ সমস্যাকে

সঙ্গে নিয়েই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল। আর্থিক ও সামাজিক কারনে তাঁর শিক্ষা জীবনে বেশ কয়েক বার ব্যহত হয়েছিল। যোগেন্দ্রনাথ ছোট বেলা থেকেই ছিলেন খুব জেদি, উদার মনস্ক ও মেধাবী। সেই জন্য তিনি বিদ্যালয়ে 'স্মৃতিধর' ও 'শ্রুতিধর' নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।[৩১]

আট বছর পর যোগেন্দ্রনাথ গ্রামের পাঠশালাতে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান, তাই কম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রথম শ্রেনীর ডিগ্রি অর্জন করেন।[৩২] পারিবারিক আর্থিক দুর্বলতার কারনে তাঁর পিতা তার উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে অসম্মত হন। তখন যোগেন্দ্রনাথের কাকা তার পড়াশোনার আর্থিক দায়ভার নিয়ে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি করেন। ১৯২৪ সালে ২০ শে আগষ্ট কলেজে আই. এ. (I.A.) ক্লাসে ভর্তি হলেন এবং কলেজের হোষ্টেলে থাকার আশ্রয় নিলেন।[৩৩] ১৯২৬ সালে সগৌরবে আই এ অধুনা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীন হলেন। ১৯২৯ সালে উক্ত কলেজ থেকে অঙ্ক ও সংস্কৃত বিষয়ে দক্ষতার সহিত বি. এ. (B.A.) পাশ করলেন। তবে আর্থিক অনটনের কারনে যোগেন্দ্রনাথের এম. এ. (M.A.) পড়া হয়নি। অতঃপরে তিনি ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে আইন কলেজে (L.L.B.) ভর্তি হলেন। আইন পড়ার খরচ জোগাড় করার জন্য তিনি চিকিৎসক প্যারীমোহন দাসের বাড়িতে ছাত্র পড়াতেন। এছাড়া ছাপাখানাতে আংশিক সময়ের কাজ করতেন। ১৯৩৪ সালে B.L. বা আইন পাশ করলেন। ১৯৩৬ সালে বরিশালের সদর আদালতে উকিল হিসাবে নিজের আইন ব্যবসা শুরু করেন।[৩৪] তিনি আইনপাশ করে আইনজীবি

হিসাবে দরিদ্র কৃষকদের অনেক মামলা বিনা পয়সায় করে দিতেন। M.L.A. হিসাবে তিনি নমঃ-অধ্যূষিত আগৈলঝাড়া গ্রামের ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমিকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। উৎত্র বরিশালের বিভিন্ন বিলের জল নিষ্কাশন, কলকাতায় তফসিলী জাতিভুক্ত পুলিশ কনস্টেবলদের আবাসস্থলের নির্মাণ, তফসিলী ছাত্রদের ৭তম শ্রেণীর পরিবর্তে ৪তুর্থ শ্রেণী থেকে বৃত্তি প্রদান, মফঃস্বল শহরের ছাত্রাবাসগুলিতে তফসিলী ছাত্রদের আসন সংরক্ষণ এবং উক্ত ছাত্রদের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

৪.৩. ছাত্রাবস্থায় জাতব্যবস্থার শিকার

প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি ভারতে জাতব্যবস্থার নিম্নে অবস্থান কারী শূদ্ররা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অবহেলার শিকার। বালক যোগেন্দ্রনাথকেও ছাত্রাবস্থায় জাতিভেদের শিকার হতে হয়েছিল।[৩৫] একদিন বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে যোগেন্দ্রনাথ ব্রাক্ষন ছাত্রের পাশে বসেছিলেন। তখন ঐ ব্রাক্ষন সন্তান বলে উঠলেন অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র ছেলের সাহস দেখেছিস, ও আমায় স্পর্শ করছে। তখন অন্যান্য বর্ণহিন্দু ছেলেরাও ঐ ব্রাক্ষন ছাত্রকে সমর্থন করে যোগেন্দ্রনাথকে ঐ স্থান থেকে অন্যস্থানে বসার জন্য জোর করতে লাগলেন। যোগেন্দ্রনাথ সেই মুহুর্তে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। এবং দৃঢ়চিত্তে ওই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকেন।[৩৬] কিশোর যোগেন্দ্রনাথ তখন থেকেই অস্পৃশ্য শূদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎস্বর্গ করবে বলে মনস্থির করলেন।[৩৭]

ব্রজমোহন কলেজে পড়াকালীনও কিশোর যোগেন্দ্রনাথকে বর্ণব্যবস্থার ঘৃন্য প্রথার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কলেজের সরস্বতী পূজার দীর্ঘকালীন যে রীতি ছিল তা

হল নিম্নবর্ণীয় ছাত্রদেরকে পূজা মণ্ডপের বাইরে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি প্রদান করতে হয়। ব্যপারটি যখন স্বাধীনচেতা যোগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হল তখন তার বিরোধীতা করল। এবং বর্ণহিন্দু ছাত্রদের সহিত বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন ও ঐ প্রথার প্রতিবাদ করলেন।[৩৮] তিনি বললেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেদাভেদের জায়গা নয়, ফলে সকল ছাত্রকে একত্রে অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বর্ণহিন্দু ছাত্ররা তা মেনে নিতে অস্বীকার করলে যোগেন্দ্রনাথ নিম্নবর্ণের ছাত্রদের নিয়ে কলেজের অন্যত্র এক অনুরূপ পূজার আয়োজন করেছিলেন।[৩৯] এই ঘটনা সূত্রে মানবিক যোগেন্দ্রনাথের মনে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নের জন্ম নিয়েছিল যেমন এই মহান ধরিত্রীতে কে বা কারা এই বিভেদ মূলক ব্যবস্থার সূচনা করেছে। যা শিক্ষার প্রাঙ্গনকেও কলুষিত করেছে।[৪০]

যোগেন্দ্রনাথের কলেজ জীবনের আরো কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে তাঁর একজন তপশিলি সহপাঠী বরিশালের কালীবাড়ীর প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে দেবীর পূজা করছিলেন। সেই দৃশ্য বর্ণহিন্দুদের দৃষ্টি এড়াইনি। ফলে সেই ছাত্রটিকে ব্যপক শারীরিক নিগ্রহ করা হয় পরবর্তী সময়ে সেই সহপাঠী যোগেন্দ্রনাথকে সমস্ত ঘটনার বিষয়ে জানিয়ে ছিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ উক্ত ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। যা স্থানীয় নেতানেত্রীগন বিষয়টি নিয়ে ভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন নিম্নবর্ণের মানুষরাও মানবিক ও সমান মযর্দার অধিকারী।[৪১] অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে ধর্মের নামে যা কিছু সামাজিক রীতি নীতি তৈরি করা হয়েছে তা কেবল সমাজের ব্রাম্ভন্য ও উচ্চ শ্রেণির জন্য আর তাতে সমাজের নিম্নবিত্ত বা অব্রাম্ভনরা ক্ষতিগ্রস্ত

হচ্ছে। আর তাঁর জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে এই সামাজিক ব্যাধির নিরসন করা যায়।[৪২]

৪.৪. আইন ব্যবসা ও জনকল্যান

ছোটবেলা থেকে যোগেন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মানুষদের হিতসাধন করা।[৪৩] তাঁর সেই লক্ষ্য পূরন করার সুযোগ এসেছিল ১৯৩৬ সালে ২৫ শে জুলাই বরিশাল আদালতে ওকালতির কাজে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে।[৪৪] যোগেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দেশে কেউ তাঁকে সুযোগ দেবে না । তাকে নিজের যোগ্যতায় সব কিছু অর্জন করতে হবে। তাই তিনি উপলব্ধী করেন যে দেশের প্রশাসন, আইন ও বিবিধ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহন করা খুবই দরকার।[৪৫] এছাড়া যোগেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল মাত্র সভা-সমিতি, ভাষণ দেওয়া ও চাঁদা করে সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি জনকল্যান ও সেবা মূলক কাজের প্রচার ও সম্প্রসারন ঘটানোর জন্যই বরিশাল আদালতে আইন ব্যবসাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৪৬] কঠোর নিষ্ঠার সাথে তিনি আদালতের কাজ করতে থাকেন। কারন টাকা পয়সা ধনদৌলত অর্জন করা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল এলাকার সাধারন গরীব মানুষেরা আইনী সম্যসায় জর্জরিত হয়ে সর্বস্বান্ত না হয়ে যায়, সেই জন্য তরুণ যোগেন্দ্রনাথ সাধারন মানুষের মামলা গুলি নিজে দায়িত্ব নিয়ে স্বল্প মূল্যে সমাধান করতেন।[৪৭] এই ঘটনাকে বরিশাল আদালতের অন্যান্য আইনজীবিরা ভালোভাবে গ্রহন করেননি। তাঁরা যোগেন্দ্রনাথের ঐ কাজকর্মের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন “এটা ব্যবসার ক্ষেত্র, দান ছত্র নয়। দয়া ধর্ম প্রকাশের স্থান ঋষির তপোবন,

আদালতে নয়।[৪৮] কিন্ত দৃঢ়চেতা কর্তব্যে নিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ ওসব গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তাঁর কর্তব্য করতে থাকলেন। সেই কারনে তার খ্যাতি নাম যশ খুব কম সময়ের মধ্যে বরিশালের জনসাধারণের কাছে পৌঁছেগিয়েছিল। এবং ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে লোকাল বোর্ডের ভোটে জয় যুক্ত হয়ে জেলাতে আনন্দের বাতাবরন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।[৪৯]

যোগেন্দ্রনাথ কিছু দিন পর বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমন করে নিম্নবর্ণের তথা সাধারন মানুষের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করলেন। এই ভাবে তিনি তার জেলার মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন। এবং তিনি ১৯৩৭ সালে জেলা বোর্ডের মেম্বার পদ গ্রহন করেছিলেন।[৫০] বাংলার কৃষক বর্গের ব্যাকুল জীবন কাহিনী যোগেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। ঐ সমস্ত কৃষক শ্রমিকদের জন্য তার প্রান বেদনায় কেঁদে উঠত। উচ্চবৃত্ত মহাজন শ্রেণী কৃষকদেরকে শোষনের হাতিয়ারে পরিনত করেছিল। যোগেন্দ্রনাথ উপলবদ্ধী করলেন এদের দুঃখ মোচন কোন একক ব্যক্তির দ্বারা সমাধান হবে না। তার জন্য দরকার সরকারী সাহায্য। তখন থেকেই যোগেন্দ্রনাথ নিম্নবর্ণের পিছিয়ে পড়া শ্রেনীর উন্নতি সাধনে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন।[৫১]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্দেশক্রমে সারা ভারতবর্ষে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়। বরিশাল আদালতের কিছু আইনজীবি এবং তার অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা যোগেন্দ্রনাথকে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও তাঁর আর্থিক সংগতি না থাকায় তিনি নির্বাচনে লড়াই করতে সম্মত হলেন না। কিন্ত

তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও সাধারন মানুষের অনুরোধ এবং আর্থিক সাহায্য তাকে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সম্মত করেন।[৫২] অতঃপরে ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের নির্ঘন্ট সম্পন্ন হলো। এবং যোগেন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে ৬ ই ফেব্রয়ারিতে নির্বাচনে এক বিশাল ব্যাবধানে জয় লাভ করলেন।[৫৩] যোগেন্দ্রনাথের সাফল্যে ডঃআম্বেদকর বলেন "*In 1937 illiterate incompetent and selfstyled men from Scheduled Castes were elected by the Congress to the Provincial Assemblies".*[৫৪] যোগেন্দ্রনাথই একমাত্র পার্থী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 'বাখরগঞ্জ উত্তর পূর্ব সাধারন কেন্দ্র' থেকে জয়ী হয়েছিলেন।[৫৫] ভোটে জয় লাভ করে বিধায়ক (MLA) হিসাবে তাঁর প্রধান এবং প্রথম কাজ হল দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের যথাযথ শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। ১৯৩৭ সালের আগে Scheduled Castes ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য সপ্তম শ্রেণী থেকে বৃত্তি (Stipend) প্রদান করতেন। কেননা তিনি ছাত্রাবস্থায় যে সকল সমস্যার সম্মুক্ষিন হয়েছিলেন সে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথম থেকেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাই কাজের অনান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি ছিল বৃত্তি গুলিকে আরো প্রসারিত করে চতুর্থ শ্রেণী থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করা।[৫৬]

যোগেন্দ্রনাথের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আগৈলঝাড়ার ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমী নামে নিম্ন ইংলিশ স্কুলটিকে উচ্চ ইংলিশ স্কুলে উত্তীর্ন করা।[৫৭] এইভাবে স্কুলটির আর্থিক অভাব ও ছাত্রের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়ছিলেন। স্বয়ং যোগেন্দ্রনাথ ঐ স্কুলের সম্পাদক হয়েছিলেন।[৫৮] উক্ত স্কুলটির আরো অন্যান্য সমস্যা

যেমন D.P.I. কর্তক স্কুলের অনুমোদন লাভ এবং স্কুলটি যে বাস্তুজমির উপর অবস্থিত তার দখলী স্বত্ত্ব সংক্রান্ত ইত্যাদির সমাধান করেছিলেন।[৫৯]

তরুণ তুর্কি MLA যোগেন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রধান কাজ হল ব্যপক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। সেই জন্য তিনি বিধান সভার অধিবেসনে রাজনীতির দাবী গুলির থেকে শিক্ষার দাবীকে অধিক প্রাধান্য দিতেন।[৬০] আলোচ্য পর্বে যোগেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টাতে বরিশাল জেলাতে অসংখ্য উচ্চ ইংরেজি, মধ্য ইংরেজি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং বিদ্যালয় গুলি গ্রামের দরিদ্র মানুষের শিক্ষার জন্য সচল রাখতে সরকারি সব রকম সাহায্যের ব্যবস্থা যোগেন্দ্রনাথ করেছিলেন।[৬১] তৎকালীন সরকার যোগেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এলাকার বিদ্যালয়ের তালিকা চেয়েছিলেন, এবং তিনিও সেই তালিকা প্রদান করেছিলেন সরকারকে।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ দরিদ্র মানুষদের সরকারি সার্ভিসের ব্যবস্থা করার প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এবং ঐ সময় কিছু কিছু সরকারি অফিসে Scheduled Caste দের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৬২] কিন্ত সমস্যা হয়েছিল সরকারি পুলিশ নিয়োগে। কারন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের তপশিলি কন্সটেবলদের এক সঙ্গে থাকতে চাইত না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কলকাতার তপশিলি পুলিশ কন্সটেবলরা যোগেন্দ্রনাথের সাহায্য চেয়েছিলেন। এবং যোগেন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সালে তপশিলি পুলিশদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬৩] তৎকালীন পূর্ববাংলার বরিশাল জেলাতে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত রেলপথ বিস্তার লাভ করেনি। ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের রেলপথ ছিল খুবই দরকার। সেই জন্য যোগেন্দ্রনাথ সরকারি

সহযোগীতায় খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত রেলপথ তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও জাহাজ কোম্পানীর ঘোরতর আপত্তি থাকায় তাঁর সেই উদ্যোগ সাফল্য লাভ করেনি।[৬৪]

নিম্নবর্ণীয় তপশিলিদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ। কৃষিকাজের জন্য তিনি কিছু কার্যাবলী সম্পন্ন করেছিলেন, যেমন জল সেচের উন্নতি, খাল খনন ও বাঁধ নির্মান ইত্যাদি।[৬৫] যোগেন্দ্রনাথ স্পষ্ট উপলবদ্ধী করেছিলেন যে আর্থিক দিক থেকে গরীব কৃষক সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারলে তাদের শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। সেই জন্য তিনি সভা সমিতি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি স্তরে বিনা খরচে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিধান সভাতে।[৬৬]

বরিশাল জেলা সার্বিক ভাবে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। শুধু বরিশালে ভালো একটা দলনেতা দরকার। আর সেই শূন্যস্থানটা পূরন করেছিল ১৯৩৭ সালে যোগেন্দ্রনাথ। বরিশালের টাউন হলে একটি আলোচনা সভা আহুত হয়েছিল। সেই সভাতে যোগেন্দ্রনাথ নিজের ইচ্ছাতে এক বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে গুনমুগ্ধ হয়ে 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক দূর্গামোহন সেন তার পত্রিকাতে লেখেন 'বরিশালের নতুন নেতা, বরিশালের মেগাস্থিনিস'।[৬৭] যোগেন্দ্রনাথ জনগনের কল্যানের জন্য আরো বহুবিধ কাজ সম্পাদন করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার বহু এলাকাতে স্কুল, কলেজের পড়ূয়াদের জন্য হোস্টেল নির্মান, তাদের পড়াশুনার জন্য সরকারি বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্তা করেছিলেন।[৬৮]

৪.৫. বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন গঠন

প্রথম থেকেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী, তাই তিনি সমাজ কে খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সমাজে প্রথিস্তিত বিভিন্ন মতামতের ভেতরে প্রবেশ করে, তা বোঝার চেষ্টা করেন এবং তিনি উপলধি করেন যে সমাজ যে রূপ বিভক্ত তাতে ব্রাম্ভন্যবাদের অঙ্গুলি হেলনেই সব কিছু প্রবাহিত হচ্ছে, আর অনান্য শ্রেণীর মানুষের যেন জন্মই হয়েছে ব্রাম্ভনের কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিতে। আর এই প্রতিবাদ করতে হলে প্রয়োজন আইন অনুযায়ী কথা বলা, আর তা করতে গিয়েই বিপত্তির উৎপত্তি ঘটে। এমন কি তাঁকে সাম্প্রদিক হিসেবও প্রচার করা হতে থাকে। তাঁর মতে "আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই যে একজন সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট নেতা কিরূপে আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া ধিক্কার দিতে পারে"।[৬৯] বিপরীত দিক থেকে যোগেন্দ্রনাথ প্রচার করতে থাকেন "ব্রাম্ভনের পদধূলি গ্রহন এবং মন্দিরে প্রবেশের দ্বারা আপনাদের কোনও উপকার ও দুঃখ-কষ্ট লাঘব হইবে না। কে আপনাদের দুঃখ-কষ্টের অবসান করিবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে"।[৭০] আর এসব চিন্তা করতে গিয়েই তাঁর মাথায় আসে কোনও না কোনও সংগঠন তৈরি করতে হবে, যারা সমাজের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলবে। আর সুযোগ খুঁজছিলেন একটি সুবর্ণ সুযোগের। আর সেটি এসেছিল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যখন বিধান সভাতে মন্ত্রী হিসেবে গিয়েছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিধান সভাতে মন্ত্রীত্ব পদ লাভ করলে বাংলার নিম্নবর্ণীয় তপশিলি মানুষদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। কারন সামাজিক জীব হিসাবে তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঔপনিবেশিক বাংলাতে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ঐ সমস্ত অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথের। তিনি তাঁর জেলার তপশিলি সম্প্রদায় তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধারন মানুষদের সমস্যা গুলো চিহ্নিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এবং তাঁর নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭১] ১৯৪৩ সালে কলকাতা থেকে 'জাগরণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই যোগেন্দ্রনাথ 'বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন।[৭২] 'জাগরণ' পত্রিকা ছিল 'বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশনের' প্রধান মুখপত্র।[৭৩]

তৎকালীন সময়ে বাংলা প্রদেশের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের মধ্যে সার্ব্বিক চেতনার অভাব ছিল। কিন্তু জাগরণ পত্রিকা প্রকাশিত হলে ঐ অভাববোধ অনেকাংশে পূরন হতে থাকে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলাতে 'বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশনের' অসংখ্য শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৪] এই সংগঠনের মাধ্যমে তপশিলিদের অভাব অভিযোগ পূরন করার জন্য উক্ত জাতির মানুষজনের কাছে একটি নিবেদন পত্রের খসড়া জমা করেছিলেন।

কিছু দিনের মধ্যে তপশিলি জাতি ফেডারেশন পূর্ববঙ্গে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল জনমানসে। প্রতিটি জেলাতে তার সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন

তপশিলি সমাজের মানুষজন এই সংগঠনে যুক্ত হতে থাকে। উক্ত সংগঠনকে তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আধার হিসাবে মান্য করতে থাকে। তবে তাঁর এই সংগঠন গুলিকে ঠিক ভাবে চালনা করার জন্য তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে হয়েছিল, আর এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলেন ভারতীয় সংবিধানের অগ্রদুত ও স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী বি আর আম্বেদকর।[৭৫] আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বোম্বাই শহরে ১৯৪৩ সালে। আম্বেদকরের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনেই তাঁকে রাজনৈতিক গুরু হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করেন।[৭৬] আম্বেদকরের সঙ্গে মতবিনিময় হওয়ার ফলে যোগেন্দ্রনাথ যেন মাথার উপর এক ছাদ পেলেন, বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইন গত সমস্যার সমাধানের জন্য দারস্থ হতেন আম্বেদকর এর কাছে।

৪.৬. তপশিলি জাতির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় যোগেন্দ্রনাথ

তপশিলি জাতির সার্বিক অধিকার রক্ষার ত্রাতা হিসাবে আম্বেদকর ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়ের চেতনায় অদ্ভুত মিল ছিল। তাঁরা উপলব্ধী করেছিলেন যে সংরক্ষন ছাড়া তপশিলি জাতিকে সমাজের উন্নয়নের স্রোতে আনা যাবে না। সেই জন্য দুজনেই সারা জীবন উচ্চবর্ণীয়দের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেই ঐ জাতির সর্বাঙ্গীন অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।[৭৭] এছাড়া যখন সংবিধান সভাতে বা গণপরিষদে আম্বেদকরের প্রবেশ অসম্ভব যোগেন্দ্রনাথ সেই মুহুর্তে নিজে ১৯৪৬ সালে নির্বাচনে প্রাথী হলেন না। সেই জায়গায় বাংলা প্রদেশ থেকে আম্বেদকরকে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে গণপরিষদে প্রেরন করেছিলেন।[৭৮] কারন যোগেন্দ্রনাথ উপলবদ্ধী করেছিলেন

সংবিধান সভাতে আম্বেদকর অনুপস্থিত থাকলে SC, ST, OBC সম্প্রদায়ের মানুষ সাংবিধানিক অধিকার এবং মানব জীবনের সার্বিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু মহাপ্রাণ তা হতে দিলেন না।[৭৯] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ "যেদিন আমরা ডঃ আম্বেদকরকে বাংলা হইতে নির্বাচিত করিলাম, সেদিন হইতে আমারা মনে করিলাম যে, ভারতের তপশিলি জাতির আর ভয় নাই। যখন আমাদের নেতা নিজেই নির্বাচিত হইয়াছেন তখন আমাদের নেতা একাই একশ"।[৮০]

যোগেন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয় লাভ করেই বিধায়ক হিসাবে তাঁর প্রাথমিক কার্যাবলী ছিল তপশিলি সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[৮১] সেই জন্য যোগেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের ক্যাবিনেটে Communal Ratio Rule অনুযায়ি সংরক্ষন তালিকাতে তপশিলিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছিলেন। যেমন DM, Sub DM, কোঃঅপারেতটভ ইন্সপেক্টর, সাবরেজিস্টার ইত্যাদি পদে চাকুরি করতে লাগলেন, যে গুলিতে এতদিন পর্যন্ত উচ্চবর্ণীয়দের একাধিপত্য ছিল।[৮২] যোগেন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রয়াসে তপশিলি সম্রদায়ের মানুষজন সরকারি চাকুরিতে যুক্ত হতে থাকল তাই উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা তা সহ্য করতে পারল না।

আলোচ্য পর্বে যোগেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন ১৯৪৩ খ্রীঃ ফুড রেশনিং দপ্তরে চাকরির ক্ষেত্রে Communal Ratio Rule গ্রাহ্য করা হচ্ছে না সেই জন্য তপশিলিগন নিয়োগ ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। যোগেন্দ্রনাথ তখন প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন কে অবগত করলেন এবং তিনি বলেন "Communal Ratio Rule যদি অন্যান্য বিভাগে না মানা হয়, তবে আমার বিভাগেও ইহা মানিব না। আমি আমার বিভাগের একটি

চাকরিও মুসলমান কিংম্বা বর্ণ হিন্দুকে দেব না। সমস্ত চাকরি তপশিলি জাতির পার্থীগনকে দিয়ে অন্য বিভাগের ক্ষতি পূরন করিব"।[৮৩] এই ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধী করতে পারি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তপশিলি জাতির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় এক নিবেদিত প্রান। তাঁর উদ্যোগেই বিবিধ ক্ষেত্রে সংরক্ষন পেয়েছিল তপশিলিগন যেমন-

১) ১৯৩৮ সাল থেকে সব সরকারি ক্ষেত্রে তপশিলিরা ১৫% সংরক্ষন পেয়েছিল।

২) তপশিলি শিক্ষার্থীরাচতুর্থ শ্রেণী থেকে Scholarship পেতে পারে তার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে হোস্টেলের জন্য তপশিলি শিক্ষার্থীদের আসন বরাদ্দ করেন ।

৪) কলকাতা Municipality ১৯৩৯ সালে ৭০ টি আসনের ৭ টি তপশিলিদের উদ্দেশ্যে সংরক্ষন করেন।[৮৪]

৪.৭. বঙ্গ বিভাজনের পটভূমি

বঙ্গ প্রদেশের আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৭৮.৫ মিলিয়ন। বঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক এবং অপ্রতুল যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে পশ্চিমাঞ্চল হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল।[৮৫] ১৮৩৬ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে বঙ্গ থেকে পৃথক করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধিনে ন্যস্ত করা হয় এবং ১৮৫৪ সালে বঙ্গের প্রশাসনিক দায়িত্ব হতে গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে অব্যাহতি দিয়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপর অর্পণ করা হয়।[৮৬] ১৮৭৪

সালে সিলেট সহ আসামকে বঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে চিফ-কমিশনারশীপ গঠন করা হয় এবং ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড়কে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৮৭] তবে বাংলার এই বিভাজন বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ঘটেছিল।

১৯০৩ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হয়। তখন বঙ্গ হতে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসাম প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাবও ছিল।[৮৮] তেমনি ভাবে ছোট নাগপুরকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে আত্তিকরণেরও একটি প্রস্তাব ছিল। ১৯০৪ সালের জানুয়ারিতে সরকারী ভাবে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারিতে লর্ড কার্জন বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এক সরকারি সফরের মাধ্যমে এই বিভক্তির ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে এই বিভক্তির বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে) বিভাগ এবং মালদা জেলা, আসাম প্রদেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে এই নতুন প্রদেশ গঠন করবে। এর ফলে বঙ্গ শুধু তার বৃহৎ পূর্বাঞ্চলই হারাবে না, তাকে হিন্দী ভাষী পাঁচটি রাজ্যও মধ্যপ্রদেশকে ছেড়ে দিতে হবে।[৮৯] অন্যদিকে পশ্চিমে সম্বলপুর এবং মধ্যপ্রদেশের পাঁচটি ওড়িয়া ভাষী রাজ্যের সামান্য অংশ বঙ্গকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ফলে বঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৫৪ মিলিয়ন যার মধ্যে ৪২ মিলিয়ন হিন্দু ও ৯ মিলিয়ন মুসলিম।[৯০]

নতুন প্রদেশটির নামকরণ করা হয় "পূর্ব বঙ্গ ও আসাম" যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দফতর হবে চট্টগ্রাম। এর আয়তন হবে ১,০৬,৫০৪ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা হবে ৩১ মিলিয়ন যাদের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মুসলিম ও ১২ মিলিয়ন হিন্দু।[৯১] এর প্রশাসন একটি আইন পরিষদ ও দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি রাজস্ব বোর্ড নিয়ে গঠিত হবে এবং কলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ার বজায় থাকবে। সরকার নির্দেশ দেয় যে পূর্ব বঙ্গ ও আসামের পশ্চিম সীমানা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকবে সাথে সাথে এর ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক ও সামাজিক বৈশিষ্টাবলিও নির্দিষ্ট থাকবে। সরকার তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৯শে জুলাই, ১৯০৫ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ই অক্টোবর।[৯২]

১৯৪৭ সালের বাঙলা বিভক্তির পূর্বে, ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করা হয় যা 'বঙ্গ ভঙ্গ' হিসেবে পরিচিত। সে সময় পশ্চিমবাংলা ছিল হিন্দু অধ্যুসিত এবং মুসলিমরা সেখানে সংখ্যালঘু, অন্যদিকে পূর্ববাংলা ছিল মুসলিম অধ্যুসিত এবং হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু।[৯৩] মুসলিম অধ্যুসিত পূর্ববাংলার মানুষ এই বঙ্গ ভঙ্গের প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল। কেননা তারা উপলব্ধি করেছিল যে এই বিভক্তির মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব একটি প্রদেশ পেতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা এই বিভক্তির বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়। এই বিতর্ক পরবর্তীকালে প্রতিবাদ এবং সন্ত্রাসের জন্ম দেয় এবং ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করা হয়।

১৯০৫ সালের বাংলা বিভক্তির সময়ে হিন্দু এবং মুসলিমদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া এই মতানৈক্য পরবর্তীকালে আবারো বিতর্ক তৈরি করে যা আইন তৈরী এমনকি ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভক্তিতে প্রভাব রেখেছে এবং সেই সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডা হিসেবে বারংবার সামনে এসেছে।[৯৪]

বিভাজন তো হল, তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে এর দায়-দায়িত্ব কার কতটা? দৃশ্যমান দায়িত্ব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের। কংগ্রেসেরই অধিক কারণ তাদের এক জাতিতত্ত্বের কারণেই দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। কংগ্রেস অবশ্য বলবে যে স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি লীগই তুলেছিল। আসলে লীগের দাবিটা ক্রিয়া নয় প্রতিক্রিয়া বটে। তবে কাজের আসল কাজি কংগ্রেস নয়, লীগও নয়, সে হচ্ছে ইংরেজ শাসক। ওই শাসকই সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং মীরজাফর ও উমিচাঁদের রাজনৈতিক বংশধরদের উৎসাহিত করেছে নিজেদের স্বার্থে দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাগ করে ফেলতে। ভাগ তো হল কিন্তু তাতে জাতি সমস্যার সমাধান হল কি? হলো না। পাকিস্তানে তো হওয়ার কথাই নয়, কারণ পাকিস্তানি জাতি বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই ছিল না ছিল বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ ও পাঠান—এই পাঁচ জাতি। ঐতিহাসিক কারণে পাঞ্জাবিরা আধিপত্য করেছে। পাকিস্তানি জাতীয়তা গড়ে তোলার জন্য জিন্নাহ সাহেব উর্দু ভাষায় সাহায্য নেবেন ভেবেছিলেন, সুবিধা হচ্ছে না দেখে ফেরত গিয়েছিলেন ধর্মের কাছেই। ভারতে এখন ২২টি স্বীকৃত ভাষাভিত্তিক জাতি আছে।[৯৫] মতাদর্শিকভাবে তাদের এক রাখার উপায় কী? অন্য উপায় না পেয়ে ভারতীয় শাসকেরাও ধর্মের কাছেই ফিরে গেছেন। কথা ছিল ভারত হবে একটি

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু হিন্দুত্ববাদের বর্তমান তৎপরতা ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে।[৯৬] পাকিস্তান তো এখনো ধর্মের দোহাই পাড়ছে। এমনকি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সেখানেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে আপস করতে হয়েছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সঙ্গে। কারণ কী? কারণটা পুরোনো। শ্রেণীচেতনাকে বিকশিত হতে না দেওয়ার বাসনা। রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে, চীনে বিপ্লব হয়েছে, ভারতবর্ষে কেন হলো না? তার একটা কারণ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার। ওই ব্যবহারে দেশভাগ সম্ভব হয়েছে। এবং একই পদ্ধতিতে এখনো চেষ্টা চলছে সমাজ বিপ্লবকে প্রতিহত করার। জাতি সমস্যার সমাধান করতে না পারার দরুন পাকিস্তানও টিকবে না, এবং ভারত যে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে জাতি সমস্যা ও শ্রেণী সমস্যা উভয়কেই বিলুপ্ত করে দেবে বলে আশা করছে, তা-ও করা সম্ভব হবে না।[৯৭]

আর এই বিভাজনের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল র‍্যাডক্লিপ উপর কেবল মাত্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে দেওয়ার।[৯৮] কাজটা তিনি করেছেন ম্যাপের ওপর পেনসিল দিয়ে দাগ কেটে। যদি অকুস্থলে যেতেন তবে পারতেন না। কারণ যথার্থ অর্থে ভাগ করা ছিল অসম্ভব কাজ। ১৩ আগস্ট গোঁজামিল দিয়ে কাজটা শেষ করে তিনি আর বিলম্ব করেননি।[৯৯] পারিশ্রমিকের জন্যও অপেক্ষা করার সময় হয়নি তাঁর দ্রুত চলে গেছেন। অনুমান করেছিলেন প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ। কিন্তু সেটা কোন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছাবে তিনি হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি। বাংলায় তো গৃহস্থের রান্নাঘর চলে গেছে হিন্দুস্থানে, শোয়ার ঘর পড়েছে পাকিস্তানে। বাংলা হচ্ছে নদীর দেশ। প্রায় সব

নদী ওপর থেকে নিচে নেমেছে। নদীকে তো কাটা যায় না, তবু কাটা হয়েছে। এবং তাতেই বোঝা গেছে কেমন অবাস্তব ছিল ঘটনাটা। ভাটি তো শুকিয়ে মরে উজানকে না পেলে, উজান তো প্লাবিত হবে ভাটিতে নামতে না পারলে দশা হয়েছে সেই রকম। ভাটিরই কষ্ট বেশি কারণ উজান জল ছেড়ে দেয় প্লাবনের কালে। শ্রেণী সমস্যার সমাধান তো হলই না জাতি সমস্যারও নয়। সমাধান হতে পারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইটার নেতৃত্ব যদি সমাজতন্ত্রীদের হাতে থাকত। সেটা ঘটেনি। অবিশ্বাস্য দেশভাগে লাভ যে হয়নি তা নয়, হয়েছে। তবে সেটা সুবিধাভোগীদের, মেহনতিদের ভাগ্যে বাঞ্চনাই সত্য হয়ে রয়েছে।[১০০] এপারে যেমন, ওপারেও তেমনই।

৪.৮. বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ কি দায়ী ছিলেন

বঙ্গভঙ্গ বাংলার ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে বাংলা বিভাজনের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছিল। বাংলা বিভক্ত করে ফেলার ধারনাটি অবশ্য কার্জন থেকে শুরু হয়নি এটি অনেক আগে থেকেই চলছিল।[১০১] ১৭৬৫ সালের পর থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে সরকারী প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে বাংলা অতিরিক্ত বড় হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এটির সুষ্ঠু শাসনক্রিয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের সূত্রপাত এখান থেকেই।[১০২] কিন্তু ১৯১১ সালে প্রচণ্ড গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রহিত হলেও। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯৪৭ সালে। এর ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতে যুক্ত হয়। এই পূর্ববঙ্গই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের

কাছ থেকে এক রক্তক্ষয়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ও বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।[১০৩]

বাংলা ভাগ নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মধ্যে নানান রকম প্রশ্ন এসে ভিড় করেছিল। যেগুলি সাধারণত তিনি নিজের পক্ষ থেকে সমাধানে অপারাগ ছিলেন। তাই তিনি এই সব প্রশ্ন গুলি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর এর কাছে।১০৪ বা একটু অন্য ভাবে বলতে বলতে হয় যে ড. আম্বেদকর সামাজিক রাজনৈতিক শৈক্ষনিক ধার্মিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনার জন্য ঐতিহাসিক আর ক্রান্তিকারী কাজ করেছেন সেই মহান ক্রান্তিকারী কাজ করার জন্য যে মহামানব আম্বেদকরকে সহযোগীতা করেছেন, সেই মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের অবদান খুব মহত্ত্বপূর্ণ। যদি মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের এই সহযোগীতা আম্বেদকর না পেতেন তাহলে তিনি সংবিধান তৈরী করতে পারতেন না। তাই যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল আম্বেদকরী আন্দোলনে যে সহযোগীতা করেছেন এবং মূল নিবাসীদের উদ্ধারের জন্য যে কাজ করেছেন সেটা অসাধারণ কাজ। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের স্থান সম্পর্কে নানা ধরনের যে বিভ্রান্তি বা সংশয় দেখা যায় সেটা বহুলাংশে অজ্ঞতার কারণে। তাঁকে দেশ বিভাগের জন্যেও অংশতঃ দায়ী করা হয়। অথচ তাঁর মতো কর্মযোগী দেশ বৎসল স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ নেতা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে কমই দেখা গেছে।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আধুনিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যক্তিত্ব এবং তপশিলি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

সংবিধান প্রণেতা হিসেবে দেশের আইন ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন।[১০৫] এছাড়াও তিনি কমনওয়েলথ ও কাশ্মীর বিষয়ক দ্বিতীয় মন্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেগুলিকে কোনও ভাবেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না। এই তথ্য গুলি জানতে পারা যায় যোগেন্দ্রনাথ আর আম্বেদকর এর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাক্তিগত চিঠি পত্রের আদান প্রদানে।১০৬ সেই চিঠি গুলিতে বাংলা ভাগের কারন সেভাবে প্রতীয়মান না হলেও এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে তিনি বাংলা বা ভারত ভাগকে কোন ভাবেই মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। কেন বাংলা ভাগ আটকানোর জন্য তিনি প্রানপন চেষ্টা করেন যার প্রমান আম্বেদকর এর থেকে পাঠানো চিটি থেকে স্পষ্ট হয়- ‘it is my firm conviction that the partition of the Punjib and Bengal will not be so much harmful to muslim. But a divition of Bengal would very adversely affect the interests of the Scheduled Caste Hindus in that province. Bengali Hindus are destined to became non-existent in the course of a few years’১০৭ তবে বাংলা ভাগের নানা কারন গুলি পত্র পত্রিকায় উঠে এসেছিল। যার মধ্যে যুগান্তর সহ নানা পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বাংলা ভাগের কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।১০৮ বেশ কয়েকটি কারন গুলিকে কোনও ভাবে অস্বীকার করা যায় না, যেগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল-

> *"I am definitely of the view that the minority has every right to get the protection of the state and no state has got any power or right to oppress and crush a*

determined, faithful and loyal minority, said Mr. J. N. Mandal, Law and labour Minister, Pakistan Government, in an interview with the Globe. Adverting to the policy of large scale evacuation from one Dominion to the other, the Minister said, "While it is encouragmg to note that law and order is being restroed at many places where the situation had gone out of control of the authorities and sanity had dawned upon a section of people who had become mad with communal frency. it is really regrettable that evacuation of the Hindus. Sikhs and Muslims is still going on vigorously. "There is no doubt that the atmosphere, both in India and Pakistan, has been surcharged with communal bitterness, but most of the people of India continent have now realised the dreadful consequences of indulging in communalism. That is why the leaders and right-thinking persons belonging to different communities have cried a halt to this fratricidal performance and appealed to all to stop violence and lawlessness and help their respective states in

maintaining peace and order." Continuing, Mr. Mandal said, "It is really painful to think that any state will contain only the people of one community and people of the minority community shall have no place in it. I think no statesman, to whichever community he may belong, can visualise such a stage in the Indian continent."[১০৯]

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অভিভক্ত বাংলা সাধারণত মুসলিম এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর (বিশেষ করে নমঃশুদ্র) লোকদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল।১১০ সেখানে মুসলিম লীগের সরকার ছিল। যদি বাংলার বিভাজন না হয় তাহলে মুসলিম আর পিছিয়েপড়া শ্রেণীর সত্তা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে উচ্চবর্ণীয়দের কোন অধিকার থাকবে না। এখানে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পাটির এক বিশাল সমর্থন ছি, কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বংলায় জোট সরকার গঠন করা হয়েছিল এবং প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এ কে ফজলুল হক।১১১ তিনি বাংলার হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে দৃঢ় করে তুলতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী সভায় স্থান পেয়েছিলেন অর্থ মন্ত্রী নলিনি রঞ্জন সরকার, বন বিভাগীয় মন্ত্রী প্রাসান্ন দেব রক্ষিত, ঋণ বিষয়ক মন্ত্রী মুকুন্দ বিহারি মল্লিক, জনস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সইয়েদ নাসের আলী১১২, শিল্প ও কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী খাজা হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।১১৩ তবে অনেকের মধ্যে ধারনা হয়েছিল যে যদি বাংলার বিভাজন না হয় তাহলে মুসলিম আর পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সত্তা চিরস্থায়ী হবে।

সেখানে উচ্চবর্ণীয়দের কোন অধিকার থাকবে না।১১৪ যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই মতের বাস্তব ভিত্তি কতখানি ছিল তা আজও প্রশ্নের দ্বারা বিদ্ধ।

আর দ্বিতীয় যে বিষয়টির উল্লেখ না করলেই নয় সেটি হল বাংলার খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল এই এলাকা থেকে আম্বেদকরকে নির্বাচিত করে সংবিধান সভায় পাঠানো হয়।১১৫ তাই বাংলা বিভাজন করে আম্বেদকর যে ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেখান থেকে তাঁর সদস্য পদ খারিজ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কেননা তাঁর পদ যদি খারিজ করার হয়, তাহলে পরবর্তীতে ওই একই জায়গা থেকে নিজেদের মতো করে প্রার্থী বাছায় করার সুবিধে থাকে। যদিও ভাষা ভিত্তিক বা প্রসাশনের সুবিধারতে বিভাজনের যে ধারনা বাংলা বা ভারত বিভাজনের পেছনে কাজ করেছিল সেগুলি হটাৎ করে কোথাও গিয়ে কর্পূরের মতো উবে যায়। কেননা ভেতরের যে ষড়যন্ত্রের বীজ লুকিয়ে ছিল তাঁর শিকড় ছিল আরও গভীরে। তবে অন্য যে কারণটিও উল্ল্যেখ করতে হয় সেটি হল যে নমঃশুদ্ররা আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেলেন তাদেরকে সাজা দেওয়ার জন্য যাতে তারা আজীবন মুসলমানদের অধীন থাকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলা ভাগ করেছিল।১১৬ এগুলি ছিল বাইরের কারন আবার যদি কারন গুলিকে একটু বিস্তারিত আলোকপাত করা যায় ঘটনার একটি নতুন দিক ফুটে উঠবে আশা করি।

বাংলা কেন ভাগ হল? এর উত্তর খুঁজতে বেশ কয়েকটি দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন কারন গুলি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও একটা প্রবাদ আছে যতো দোষ নন্দ ঘোষ। নন্দ ঘোষের প্রতি দোষের ইতিহাস না জানলেও

যাঁর সম্পর্কে এই আলোচনা করছি এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর দোষ কতটা বা অন্যের দোষ কি তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? তবে কেন ? তাহলে আসল দোষী কে বা কারা ? আর কেনই বা তাঁরা যোগেন্দ্রনাথের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে চাইছে? কি ই বা তাদের উদ্দেশ্য ? এ সব বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একটা কথা বলেছিলেন "দেশভাগ হোক না হোক বাংলাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে।" কেন? তবে বাংলা বিভাজনের কারন খুঁজতে গিয়ে যে প্রসঙ্গ গুলি মাথায় আছে সেগুলো হল, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এর পূর্বে সমগ্র (পূর্ব ও পশ্চিম) বাংলায় কোন ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণীয়দের শাসন ছিল কি? আর এই সময়ের পরে পশ্চিম বাংলায় কোন নিম্ন বর্ণীয়দের শাসন এসেছে কি? শ্যামাপ্রসাদ কেন ঐ কথা বলেছিলেন অর্থাৎ বাংলা ভাগ হয়েছিল কিছুটা ধর্মীয় কারনে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ ভারতবর্ষ বিভক্তির একটি অংশ হিসেবে ধর্মের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গ প্রদেশ ভারত এবং পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বিভক্ত হয়।[১১৭] প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত "পশ্চিম বঙ্গ" ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত "পূর্ব বঙ্গ" পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়।[১১৮] *৩ জুন পরিকল্পনা* বা *মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা* অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ অগাস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ভারতের নিকট এই নতুন ভাবে বিভক্ত বাংলা প্রদেশের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।[১১৯] পরবর্তীকালে *পূর্ব পাকিস্তান* যা পাকিস্তানের প্রদেশ ছিল তা ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১২০] মুসলিম প্রধান জেলাগুলি হল- দিনাজপুর ,নাদিয়া ,সিলেট, ময়মনসিংহ ,পাবনা ,বগুড়া ,মুর্শিদাবাদ ,মালদা ,রংপুর ,

চট্টগ্রাম ,ত্রিপুরা , নোয়াখালি, ফরিদপুর ,ঢাকা[১২১] এবং হিন্দু প্রধান জেলা গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, যশোর, খুলনা।[১২২] তবে বৌদ্ধ অধ্যুষিত একমাত্র প্রধান জেলা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম।[১২৩]

আর এই চুড়ান্ত ভাগে পাকিস্তান এর ভাগে পড়েছিল পূর্ব দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট (বরক উপত্যকা ছাড়া), পূর্ব নাদিয়া, ঢাকা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম। আর ভারতের ভাগে এসেছিল, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম নাদিয়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বরাক উপত্যকা[১২৪] (অধুনা আসাম রাজ্যের অংশ)। তবে শুধু এই কারণটাই নয় বাংলা ভাগের অন্যান্য মুখ্য কারণগুলি হল-

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হচ্ছেন বাংলার আম্বেদকর। তাঁর ক্ষমতা কত সুদূর প্রসারী ও শক্তিশালী, সেটা তাঁর থেকে উপকার প্রাপ্তরা কতটা বুঝেছেন বলা মুশকিল। তবে উচ্চবর্ণীয়রা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন বাখার গঞ্জ কেন্দ্রের জয় থেকে শুরু করে আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় পাঠানো পর্যন্ত। যার জন্য তারা হর পল মহাপ্রাণের লাগামকে নিজেদের আয়ত্তের বাইরে যেতে দেয়নি। বরং সব সময় যোগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিজের জাতির লোক দিয়ে যেমন বিরোধীতা করিয়েছে। তেমনি তারা বুঝতে পেরেছিল বাংলা ভাগ না হলে কোন দিনই উচ্চবর্নীয়দের কব্জায় বাংলার শাসন ক্ষমতা আসবে না। তাই গোদের উপর বিষফোড়াটাকে স্বমূলে নির্মুল

করার জন্য বাংলা ভাগ করা তাদের কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি ঐ সময়ে নেতাজীর অন্তর্ধান হওয়া উচ্চবর্ণীয় বাংলা ভাগ করার কাজটি সুগম হয়। আপনারা হয়ত জানেন। যে গান্ধীর কথা স্কুলে পড়ানো হয়, যে "দেশভাগ হতে হলে আমার মৃত শরীরে উপর দিয়ে যেতে হবে"।[১২৫]

প্রায় সবকিছু পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হওয়ার পরেও বাংলা ভাগের জন্য দোষ চাপিয়ে দেওয়া হ'ল যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের উপর। কেন? কারণ, দুর্বা ঘাস প্রচন্ড রোদের শুকিয়ে গেলেও আবার বর্ষার জল পেলে জেগেওঠে। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সেই জাতের লোক ছিলেন। যার প্রমান 'মায়ের ডাক' পত্রিকায় একবার প্রকাশিত হয় "যোগেন মন্ডলরা আবার জাগছে'[১২৬] অর্থাৎ এখানে কেবল একজন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন না আরও অনেক ব্যাক্তিত ছিলেননা যারা নিম্নবর্গের মানুষের কথা ভাবছিলেন যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তারা উচ্চবর্গের শাসনের মধ্যে নিজেদের রাখতে চাননি। এবং অন্যদিকে উচ্চবর্গের মানুষেরা নানান সমস্যার মধ্যে যাচ্ছিলেন কেবল যোগেননদ্র নাথ এর মতো মানুষদের। অর্থাৎ কোন প্রকারেই নিশ্চিহ্ন করতে পারছিল না উচ্চবর্ণীয়রা। যার জন্য তারা যোগেন্দ্রনাথের উপর তাদের মিথ্যা অপবাদের শক্তিসেল প্রয়োগ করে। পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করে যে তাঁর সঙ্গে কেউ দিবালোকেও দেখা করতে যেতে সাহস পেতেন না লজ্জায়। বর্তমানে সেই পরিস্থিতি থেকে অনেক উত্তরণ ঘটলেও কিন্তু শত্রু পক্ষ তাঁরই সমাজের লোকের মধ্যে তাঁর নামে বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা প্রচার করেই চলেছে। আর তাঁরই শ্রমের বিনিময়ে সংরক্ষিত[১২৭] সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে সরকারী চাকরী করে তাঁর প্রতি বিষ উগরে

দিচ্ছে। একটা জাতির পক্ষে এর থেকে লজ্জা ও ঘৃণার আর কি হ'তে পারে। বাংলা বিভাজন যাতে না হয় তার জন্য ১৯৪৭ সালে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে লোকদের জাগৃত করার কাজ করেন।[১২৮] খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুরখোলাপোতা গ্রাম ,হরিনারায়নপুর , (২৪ পরগনা) কলকাতা, বর্ধমান, হুগলী ইত্যাদি ,বীরভুম জায়গায় বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন । যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি বাংলাকে বিভাজিত হতে বন্ধকরার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা বিভাজনের পক্ষে কংগ্রেস আর উচ্চবর্ণীয়রা কেন ছিল সেটা জানা খুব দরকার। কাদের স্বার্থে ও চক্রান্তে বাংলা ভাগ হয়েছিল। আর যে কাজে যোগেন্দ্রনাথের কোন অংশগ্রহণই ছিল না তিনি কি করে সেই কাজের জন্য দোষী হন? বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ৩ জুনের ঘোষণা অনুযায়ী ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল সমূহের প্রতিনিধিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুইটি পৃথক সভায় মিলিত হলেন। হিন্দু প্রধান জেলাগুলির হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ একটি সভায় মিলিত হলেন এবং মুলসমান প্রধান জেলাগুলীর হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ আর একটি পৃথক সভায় মিলিত হলেন।[১২৯] বর্ধমান, বীরভূম,হুগলি ,মেদিনীপুর ,বাঁকুড়া , হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগণা, খুলনা, জলপাইগুড়ি এবং দার্লিলিং এই এগারটি হিন্দুপ্রধান জেলার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ যে সভায় মিলিত হলেন তাতে সভাপতিত্ব করলেন বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মহতাব এবং মুসলমান প্রধান জেলাগুলির হিন্দু ও মুসলমান

সদস্যগণ মিঃ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে একটি পৃথক সভায় মিলিত হলেন।[১৩০] প্রথমদিকে কংগ্রেস পক্ষের দাবিতে উভয় অধিবেশনে সমগ্র বাংলা বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে বলে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১২৬ ভোট এবং পক্ষে ৯০ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি আগ্রাহ্য হয়। পরে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিগণের সভায় বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উক্ত প্রস্তাবটি ৫৮-২১ ভোটে গৃহীত হয়। এই অংশের শাসনতন্ত্র প্রণনের উদ্দেশ্য বর্তমান গণপরিষদে যোগদানের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে গৃহীত হয়।[১৩১] অপরপক্ষে মুসলমান প্রধান অঞ্চলের সদস্যগণের সভায় বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ১০৬ জন ও পক্ষে ৩৪ জন কংগেসী সদস্য ভোট প্রদান করেন। এই অংশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবার জন্য বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে না, মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির জন্য যে নতুন গণপরিষদ গঠি হবে সেই গণপরিষদে যোগদান করবে তার একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।[১৩২] মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির জন্য যে নতুন গণপরিষদ গঠিত হবে সেই গণপরিষদের যোগদানের প্রস্তাবের পক্ষে ১০৭ জন ও বিপক্ষে ৩৪ জন ভোট প্রদান করায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। মুসলমান প্রধান সদস্যদের সভায় আর একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহলে উক্ত জেলাকে পূর্ববঙ্গ নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে স্বীকৃত আছে। ১০৫-৩৪ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই অংশের কংগ্রেসী ৩৪ জন সদস্য প্রত্যকটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই ভোটাভোটিতে মোট ২২৫ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলের ৮০ জন এবং মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলের ১৪৫ জন। ইউরোপীয়ান ২৫ ভোট দানে বিরত থাকেন। হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকার ৮০ জনের মধ্যে, হিন্দু ৫৮ জন, মুসলমান ২১ জন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪ জন এবং ভারতীয় খৃষ্টান ১ জন।

উক্ত ৫৪ জন হিন্দুর মধ্যে অ-কংগ্রেসী ভোটার ৫ জন।[১৩৩] তারা হলেন–ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা) মহারাজাধিরাজ স্যার উদয়চাঁদ মহতাব (স্বতন্ত্র), মুকুন্দবিহারী মল্লিক (স্বতন্ত্র), রতনলাল ব্রাহ্মণ (কমিউনিষ্ট) এবং জ্যোতি বসু (কমিউনিষ্ট)।[১৩৪]

পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যগণ বাঙলা বিভক্তিকরণ প্রস্তাবের উপরে তিনটি আলাদা ভোট প্রদান করেন।[১৩৫] পরিষদের সকল সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ অধিবেশনে। যৌথ অধিবেশন বিভক্তি করণের পক্ষে ১২৬ ভোট এবং বিদ্যমান সংবিধান পরিষদের যোগ দেওয়ার পক্ষে ৯০ ভোট (অর্থাৎ ভারত) প্রণীত হয়।[১৩৬] তারপর একটি পৃথক অধিবেশনে বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সদস্যগণ বাংলার বিভক্তি এবং সম্পূর্ণ একটি নতুন গণপরিষদ (পাকিস্তান) এ যোগদান করার সপক্ষে ভোট প্রদান করেন। যেখানে নতুন রাষ্ট্রে যোগদানের সপক্ষে ১০৬ এবং বিপক্ষে ৩৫ টি ভোট প্রণীত হয়।[১৩৭] একই পদ্ধতি বাংলার মুসলিম অধ্যুসিত নয় এমন স্থানগুলোতেও অনুসরণ করা হয়েছিল। সেখানে ৫৮ ভোট বিভক্তি করণের পক্ষে এবং ২১ ভোট বিপক্ষে প্রণীত হয়।[১৩৮]

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি একটিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বিভক্তিকরণের পক্ষে প্রণীত হয় তাহলে প্রদেশ বিভক্ত হবে। এই পরিকল্পনাকে তুলে ধরে ২০ জুন পরিষদে ভোটাভুটির ফলাফলের প্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ ভারত এবং পূর্ব বাংলা প্রদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৩৯] এছাড়াও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ৭জুলাইতে সিলেটের নির্বাচকমণ্ডলী পূর্ব বাঙলা প্রদেশে যোগদানের সপক্ষে ভোট প্রদান করে। পরবর্তীতে স্যার র‍্যাডক্লিফ এর নেতৃত্বে

সীমানা কমিশন দুই নব নির্মিত প্রদেশের মধ্যে আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ অনুসারে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।[১৪০]

অন্যদিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী[১৪১] ২১ জন মুসলমানের বিশিষ্টদের মধ্যে মিঃ এস. এইচ. সোহারাবর্দী (মূখ্যমন্ত্রী),মিঃ এম. এ. এইচ. ইস্‌পাহানী[১৪২], মিঃ আবুল হুসের (সম্পাদক বঙ্গীয় মুসলিম লীগ), মিঃ আবদুর রহমান[১৪৩] এবং নবাব মুসারফ হোসেন। মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠদের এলাকায় হিন্দু কিরণশঙ্কর রায়[১৪৪], ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নেলী সেনগুপ্ত এবং পি. আর. ঠাকুর (প্রমথরঞ্জন ঠাকুর)। মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলের ১৪৫ জনের মধ্যে, মুসলমান ১০৩ জন , কংগ্রেসী -ভারতীয় খৃষ্ঠান ১ জন। ৪১ জন হিন্দুর মধ্যে ৬ জন অ ,হিন্দু ৪১ জন তন্মধ্যে মন্ত্রীদ্বয় দ্বারিকনাথ বার ,তপশিলি সদস্যুরী ও নগেন্দ্র নারায়ণ রায়, মহারাজা গিরিশচন্দ্র নন্দী, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ভোলানাথ বিশ্বাস, হারাণচন্দ্র বর্মণ (উপয় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী), গয়ানাথ বিশ্বাস (ময়মন সিং) এবং একজন কমিউনিষ্ট সদস্য ছিলেন।[১৪৫]

মুসলমানদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত মিঃ এ.কে ফজলুল .হক, মিঃ মহাম্মদ আলি (রাজস্ব মন্ত্রী), মিঃ নুরুল আমিন (স্পিকার), মিঃ আহম্মদ হোসেন (কৃষি মন্ত্রী), মিঃ সামসুদ্দীন আহম্মদ (শ্রম ও বাণিজ্যমন্ত্রী) অন্যতম। পশিমবঙ্গ ব্লকের দুইটি হিন্দু আসন, যথাক্রমে কলিকাতা পূর্ব (সাধারণ) এবং জলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ি সাধারণ।[১৪৬] তাছাড়া, বাখরগঞ্জ দক্ষিণ- পশ্চিম সাধারণ (তপশিলি) আসনটিকেও ভোট থেকে বিরত রাখা

হয়। বাখরগঞ্জ দক্ষিন- পশ্চিম সাধারণ তপশিলি আসনটির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ।[১৪৭]

সাধারণ ভাবে একটি সস্থা মতবাত খুব সহজেই পরিবেশিত হয় যে দেশভাগ ইংরেজরা করেছিল। এই কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মানেটা দাঁড়ায় যে ভারতে হিন্দু আর মুসলমান পরস্পর মিলেমিশে বাস করত। ইংরেজরা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল এবং পরিনামে দেশভাগ হয়েছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তো আবার এটাও বলে যে স্টুয়ার্ড মিল সাহেব তাঁর ইতিহাসে প্রথম হিন্দু আর মুসলমানকে দুই পৃথক জাতি হিসেবে দেখিয়েছিলেন তবে দেশভাগের মূল কারণ ছিল ধর্ম। হিন্দু ও মুসলমান কোনকালেই মিলেমিশে থাকেনি। তারা দুই পৃথক জাতির মতই ছিল ইংরেজদের কোনো দোষ নেই। তারা যেমন ভাবে হিন্দু আর মুসলমানকে দেখেছিল তেমন ভাবেই তারা ইতিহাস লিখেছে কেবল মাত্র তারা সুযোগের সদ ব্যবহার করেছে। ভারতে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে কতগুলি দাঙ্গা হয়েছিল, সেসব দাঙ্গার কারণ কি ছিল, ইংরেজরা হিন্দু আর মুসলমানকে কি চোখে দেখত এবং কেন। আর সেই সব কারন না অনুসন্ধান করেই আজ পর্যন্ত একমাত্র ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে আমরা সযত্নে বয়ে চলেছি যা দেশভাগের জন্য দায়ী।

সর্বপ্রথমে হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক যে প্রথম থেকেই ভালো ছিল তা বলার খুব একটা প্রয়োজন নাই।[১৪৮] হিন্দু ও মুসলিম পরস্পর এই ভারতে লড়াই করেই এসেছে বিভিন্ন কারনে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। এবং দুই সম্প্রদায়ই পরস্পর বহু দাঙ্গায় যুক্ত হয়েছিল সেই আদি মধ্যযুগ

থেকেই। তবে উপনিবেশিক ভারতেই বেশ কয়েকবার দাঙ্গা যেমন ১৮৮৯ সালে দিল্লিতে এক হিন্দুর ধর্মান্তরকরণ নিয়ে দাঙ্গা বাঁধে ১৮৯১ সালে কলকাতায় মসজিদ বানানো নিয়ে দাঙ্গা লাগে এবং ওই একই বছরে পলাকাদে হিন্দু ধর্মীয় মিছিলের উপর মুসলিম আক্রমন হয়।[১৪৯] ১৮৯২ সালে প্রভাসপাতনে মহরম নিয়ে হিন্দুরা দাঙ্গা লাগায়। ১৮৯৫ সালে পোরবন্দর-এ হিন্দুর ঘরের পাশ দিয়ে মুসলিম ধর্মীয় মিছিল বেরোলে হিন্দুরা আক্রমন করে।[১৫০] এইরকম হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বহু দাঙ্গা হয়েছে। আর এই ধর্মীয় দাঙ্গা গুলি নানা ভাবে সমাজকে ভাবিত করে তুলত।

তবে দাঙ্গার এই তালিকা আরও দীর্ঘ হতে পারে আর তা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে হিন্দুরা দাঙ্গা লাগাত গরু কাটা নিয়ে আজও যেমন লাগায়। মুসলিমরা লাগাত মসজিদের সামনে গান বাজানো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে। যদিও বর্তমানে এই কারণগুলি আরও বিস্তৃত রূপ পেয়েছে। কেননা যেখানে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্তার মাপ কাঠির থেকে মন্দির, মসজিদ, গির্জার ইসু নিয়ে বেশি রাজনীতি হয় সেখানে ধর্মীয় বিবাদ যে আসবেই সে কথা নিয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে একথা সত্য যে ইংরেজরা এইসব দাঙ্গা প্রবন চরিত্র দেখে হিন্দু আর মুসলিমদের দুই পৃথক জাতিই ভেবেছিল।

ইংরেজ আমলে দুই সমাজ নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেছিল। হিন্দুরা বানায় হিন্দু মহাসভা আর মুসলিমরা বানায় মুসলিম লিগ। দুই দলেরই উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের তোষণ করে কিছু সাম্প্রদায়িক সুবিধা ভোগ করা। ফলস্বরূপ এখানেও সাম্প্রদায়িকতা চলে এল। এই দুই দলই আগের মত পরস্পরের সাথে দাঙ্গা করত।

দুই দলেরই উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় নিজেদের সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা নেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের আর্থিক ক্ষতি হলে তারা ভারত স্বাধীন করার কথা ভাবতে থাকে। মুসলিম লিগ দেখে ক্ষমতা হিন্দুদের দিকে যাচ্ছে। তখন তারা দেশভাগের প্রস্তাব দিয়েছিল। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা প্রবন চরিত্র দেখে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে যে স্বাধীন হলে ভারতে সিভিল ওয়ার শুরু হয়ে যাবে। তাই তারা দেশভাগের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এতে ব্রিটিশদের দোষ কোথায়?

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা বলায় বাহুল্য যে দেশভাগের জন্য সংকীর্ণ ধর্মীয় আবেগ আর সাম্প্রদায়িকতাকেই সম্পূর্ণ দায়ী করা যাবে না। তবে তাদের সংকীর্ণ ধর্মীয় আবেগ অনেকখানি দায়ী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেই চারিদিক হতে একটা চিৎকার প্রতিধ্বনিত হল যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল দেশ ভাগ করেছেন তাঁর মত সর্বনাশা লোক ভারতে আর কেউ নেই। এই মিথ্যা দোষারোপকারীরা অশ্লীল ভাষায় তাঁকে অজস্র গাল দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ভারত ভাগে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তবে এই কুৎসা রটনাকারীদের উদ্দেশ্য কি তাও প্রনিধান করা করা দরকার। যারা এই মিথ্যা রটিয়েছে তারাও জানে ভারত ভাগে যোগেন্দ্রনাথের কোন ভূমিকাই ছিল না এবং তিনি দেশ ভাগের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই কুৎসা রটনার কারণ আমাদের কাছে মোটেই দুর্বোধ্য নয়। কারণ এই দেশের নিপীড়িত মানুষের অন্তরে মহাপ্রাণ যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন সেটাকে নষ্ট করে দিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তর থেকে তাঁকে চিরতরে মুছে দিতে পারলেও তাঁর আজীবন সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। এই ছিল কুৎসা রটনাকারীদের মূল উদ্দেশ্য।

তবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে এই বাংলা ভাগের জন্য দায়ী করা যায় কিনা সেই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও যদি তাঁর আম্বেদকর কে পাঠানো চিটি গুলির মূল্যায়ন করে তাহলে প্রত্যেকে এক মতে উপনীত হবেন যে তিনি কোনও ভাবেই বাংলার বিভাজনের পক্ষে ছিলেন না, উপরন্তু তিনি বাংলা বিভাজনে আকাশে কালো মেঘের ঘনিয়ে আসার সঙ্কেত পেয়েছিলেন যা তিনি তাঁর ব্যক্তি গত চিঠিতে আম্বেদকর কে জানিয়েছিলেন।১৫১ তিনি এও জানিয়েছিলেন যে কোনও ভাবে এই বাংলা বিভাজন আটকানো যাই কিনা। কিন্তু এই বিভাজন যে অনিবার্য হয়ে এসেছিল তা আবমেদকর এর প্রকাশ পেয়েছিল।১৫২ তাছাড়া তৎকালীন বাংলার যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বাংলা বিভাজনের পক্ষে তা যোগেন্দ্রনাথদের দ্বারা ঠেকানো সম্ভব ছিল না।১৫৩ তাই যোগেন্দ্রনাথ যে কোনও ভাবেই বাংলা বিভাজনের পক্ষে ছিলেন না সে কথা স্পষ্ট রূপে বলা যায়।

৪.৯. বাঙলা সমন্বিতকরণ পরিকল্পনা

দ্বি-জাতি তত্ব এর উপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্তির পরে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এখানে ধর্মীয় বিষয়টিকে মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে।[১৫৪] তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি ভিত্তিগত পরিকল্পনা পেশ করেন যে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা ভারত কিংবা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে না যুক্ত হয়ে বরং একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।[১৫৫] সোহরাওয়ার্দী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে যদি বাংলা এভাবে বিভক্ত হয় তবে পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে কেননা সব কয়লা খনি কিংবা পাট কল পশ্চিম

বাংলার অংশ হয়ে যাবে এবং একটি সিংহভাগ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা কিনা শিল্পায়নের সাথে যুক্ত পশ্চিম বাংলায় অভিবাসন সম্পন্ন করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কলকাতা যা ভারতের অন্যতম প্রধান শহর এবং শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু তা পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দী ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে দিল্লির একটি সংবাদ সম্মেলনে তার প্রস্তাব তুলে ধরেন।[১৫৬]

তবে পরিকল্পনাটি সরাসরি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল ছিল এবং দ্বি-জাতি তত্বের আলোকে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলো) বাতিল করে দেয়।[১৫৭] প্রাথমিকভাবে বাংলা প্রদেশের মুসলিমলীগ নেতারা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। বর্ধমানের নেতা আবুল হাসিম সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং অন্যদিকেনুরুল আমিন, এবং মোহাম্মদ আকরাম খান এর বিরোধিতা করেছেন।[১৫৮] কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবের বৈধতা বুঝতে পেরে পরিকল্পনাকে পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিলেন। মহম্মদ আলী জিন্নাহ এর সমর্থন লাভের পর সোহরাওয়ার্দী তার পরিকল্পনার সপক্ষে সমর্থন জমায়েত শুরু করেন।[১৫৯]

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গুটিকয়েক নেতাই এই পরিকল্পনার সাথে একমত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন বাংলা প্রদেশের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা এবং নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোসের বড় ভাই শরৎচন্দ্র বোস এবং কিরণ শ্নগকর রায়। তবে জওহরলাল নেহেরু এবং বল্লভভাই প্যাটেল সহ বেশিরভাগ নেতা এই পরিকল্পনা বাতিল করেন।[১৬০] এছাড়াও শ্যামপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল

এর তীব্রভাবে বিরোধিতা করে। তাদের মতামত ছিল যে এই পরিকল্পনা আসলে বিভক্তি করনের বিপক্ষে সোহরাওয়ার্দীর দ্বারা একটি চাল মাত্র যাতে কলকাতা শহর সহ শিল্পোন্নত পশ্চিম অংশের উপর লীগ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। তারা আরো মতামত পোষণ করেছিলেন যে যদিও পরিকল্পনায় একটি সার্বভৌম বাংলার কথা উল্লেখ করা আছে এটা বাস্তবিক পক্ষে একটি ভার্চুয়াল পাকিস্তান ছাড়া কিছুই হবে না এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের চিরতরে মুসলিম সংখ্যাগুরুদের দয়ার উপর চলতে হবে।[১৬১]

যদিও কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রস্তাবটি আলোর মুখ দেখা সম্ভব ছিলো না বোস এবং সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র নিয়ে একটি মতৈক্যে পৌঁছতে তাদের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর মত বোসও বিশ্বাস করতেন যে বিভক্তি করণের ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অর্ধেকের মত হিন্দু জনগোষ্ঠী অসহায় অবস্থায় পুর্ব পাকিস্তানে আটকে পড়বে।[১৬২] চুক্তিটি ২৪ মে, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। চুক্তিটি আক্ষরিক অর্থে একটি কেবল মাত্র রাজনৈতিক চুক্তি ছিল এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কেননা ছয় বছর ধরে মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্বের ক্রমাগত প্রচার সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রণালয়ে হিন্দু ধর্মালম্বীদের প্রান্তিকীকরণ এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ফলে মুসলিম লীগের প্রতি বাঙালি হিন্দুদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস তখন সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। এর মাঝেই নির্বাচক মণ্ডলীর প্রকৃতি প্রশ্নে (পৃথক বা যৌথ) বোস এবং সোহরাওয়ার্দীর মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। সোহরাওয়ার্দী মুসলিম ও মুসলিম নন- তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন বজায় রাখার উপর জোর দেন। কিন্তু

বোস এর বিরোধিতা করেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন কেননা কংগ্রেস এর দিক থেকে এবং অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সমর্থনের অভাব ছিল। ফলে অবিভক্ত বাংলার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। তারপরেও এই পদক্ষেপকে বাংলার বিভক্তি এড়ানো এবং বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্রে বসবাস করার ইচ্ছার শেষ চেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১৬৩]

৪.১০. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে কেন মহাপ্রাণ বলা হয়?

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে বৃহস্পতি বারে রাত্রি নটার সময় ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের বড়লাট একটি মিটিং এর আহ্বান করেন।[১৬৪] সেখানে ভারতের ভবিষৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্ত পূর্ণ ঘোষণা করা হয় যেখানে মুসলিম লীগের পৃথক ও সার্বভৌম পাকিস্তানের রাষ্ট্রের দাবি সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাহ্য হয়েছিল ঠিকই।[১৬৫] কিন্তু কোনো ভাবে কোথায়ও নমঃশুদ্র বা তপশিলি জাতি গোষ্ঠীর সার্থ রক্ষায় কোনো ভাবে কিছুই আলোচনার মধ্যে উল্লেখিত হয়নি। ফলস্বরূপ ৮ই জুন কলকাতার বঙ্গীয় নমঃশুদ্র সমিতির উদ্যেগে ৯১ নম্বর চিংড়িঘাটা রোড বঙ্গীয় প্রাদেশিক তপশিলি ভুক্ত জাতি ফেডারেশন ও সিডিউল কাস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গ একটি মিটিং এ মিলিত হয় যেখানে পঞ্চানন দাস মহাশয় উক্ত মিটিং এ পৌরহিত্য করেন এবং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল উক্ত মিটিং এ তপশিলি সমাজকে নিয়ে একটি গুরুত পূর্ণ অবদান রাখেন। তপশিলি জাতীয় জীবনে যে অভূত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার কিভাবে সমাধান করা যায় তার সমাধান যথেষ্ট চেষ্টা করেন।[১৬৬]

বাংলায় ৩০শে জুন ১৯৪৬ সালের রবিবারের এক বিকেলে ইন্ডিয়ান association হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক তপশিলি ভুক্ত জাতি ফেডারেশনের উদ্যেগে এক সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে সভাপতিত্ব করেন বাংলার এক অন্যতম প্রিয় নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।[১৬৭] সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন ড: বি আর আম্বেদকর এখানে তিনি প্রায় এক ঘন্টা বক্তব্য রাখেন এবং আম্বেদকর সন্দেহ প্রকাশ করেন যে এই ভারতে প্রায় ৮ কোটি মানুষ সামাজিক লাঞ্ছনা, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, আর এই শিকারের ফলে এই তপশিলি জাতি প্রায় নির্ভীক জাতিতে পরিণত করে ফেলেছে। তবে তিনি আশঙ্খা প্রকাশ করেন এই ভেবে যে মন্ত্রী মিশনের ঘোষণায় উক্ত আট কোটি তপশিলি মানুষ ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ সুবিধাবাদীর বর্ণ হিন্দুর ক্রীতদাসে পরিণত হইবে।[১৬৮] অর্থাৎ ভারত বিভাজনের রাজনীতিতে উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা যে সমস্যায় পড়বে যোগেন্দ্রনাথ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন সেহেতু তিনি বঙ্গীয় তপশিলি ফেডারেশন গঠন করেছিলেন তাই প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য ছিল যে নতুন সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানে অবস্তিত তপশিলি জাতির সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি স্থায়ী সমাধান করার।[১৬৯] আর এরই মধ্যে যখন জিন্নার কাছ থেকে প্রস্তাব আসে আইন মন্ত্রী করার তখন তিনি এই সুযোগ কে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবেই গ্রহন করেন- কেননা তাঁর কাছে এই সুযোগ ছিল মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো বা সুযোগ এসেছিল নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের কাছে ত্রাতা হিসেবে দাড়িয়ে থাকার মতো। তাই তিনি এই সুযোগ গ্রহন করেন এবং পাড়ি দিলেন করাচীতে। তবে যোগেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই চেষ্টা করে গিয়েছিলেন ১৯৩২ সালে ঘোষিত

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতির দ্বারা তপশিলি জাতির জন্য সতন্ত্র যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটির উপর দৃঢ় থাকতে।[১৭০]

কেননা যখন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সমস্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল ভারত বিভাজন থেকে। ভারত ও বাংলা বিভাজন তো হলই কিন্তু বিভাজিত মানুষ বা সমাজের যে কি হল বা হচ্ছে তার খবর রাখে কে?? এই চিন্তা করেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন মানুষ বিভাজনের রাজনীতি করতে গিয়ে চেয়ারের বেশি মূল্য দিয়েছেন মানুষের জীবনের চেয়ে। মানুষের জীবন ভাবাবেগ, সমাজ ও সংস্কৃতি এক প্রকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[১৭১] বিভাজনের ফলে উভয় দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপে সংখ্যা লঘুদের কি অবস্থা হইবে তার বিবেচনা কি কেউ করেছে? শুধু গদির অধিকার কি বড় প্রশ্ন? বড় প্রশ্ন কি নিজেকে বা নিজ নিজ মানুষের স্বার্থরক্ষা? এই প্রশ্নই তখন যোগেন্দ্রনাথ কে বিচলিত করে তুলেছিল।[১৭২] আর তার জন্যই কোটি কোটি অসহায় মানুষের অধিকার রক্ষায় যাহার মন বিচলিত তখন তপশিলি অন্দোলনের চিন্তা ধারা ও যোগেন্দ্রনাথের মন থেকে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে ছিল।[১৭৩] যোগেন্দ্রনাথ এর মন ভেঙে গেলো সম্পূর্ণ ভাবে আর এই ভাঙ্গা মন দিয়ে কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় এই আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ডক্টর আম্বেদকর এর কাছে। আর এই প্রসঙ্গে আম্বেদকর জানালেন

'The scheduled castes were incapable of doing anything precisely with regard to the question of partition. They could neither force partition nor could they prevent partion if it was

coming. The only course left to the scheduled caste is to fight for safeguards either in United Bengal or divided Bengal".[১৭৪]

তবে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সম্পর্কে পক্ষে– বিপক্ষে নানা রকম মন্তব্য প্রচলিত আছে। যারা বিপক্ষে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করেন তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই কেননা তারা ভাবগত অর্থে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের বিরোধী ছিল বাস্তবিক অর্থে অনেকটা ছিল বিপরীত। তাই তাঁদের কাছে বিরোধিতার উপায় বলতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র মিথ্যা অভিযোগের হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া ক্যাসেটটি যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল অথবা আম্বেদকরের সৌজন্যে উপকৃত ফলভোগকারী তপশিলি সমাজের মানুষ মহাদায়িত্বের সঙ্গে উক্ত ক্যাসেট বাজান এবং প্রথম পোষমানা চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় ব্রাহ্মণ্যবাদের পদ সেবায় নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন।[১৭৫]

নতুন আইন মন্ত্রী হয়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলন। তিনি সমস্ত কিছু শক্ত হাতে তার সমাধান করেছিলেন। পাকিস্থানের বয়স যখন প্রায় দুই বছর অতিক্রম করেছে তখন একটি জটিল সমস্যার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেটি হল 'গণপরিষদ শাসনতান্ত্রিক যে সব আইন পাশ করেন তাতেও গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন অপরিহার্য।[১৭৬] আর এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন আইন বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মিস্টার স্নেলসন (আই এ এস) আর এই বিষয়ে এক দীর্ঘ নোটে তিনি ব্যাক্ত করেন যে তাঁর এই মতের সমর্থনের পক্ষে আছেন গণপরিষদের সেক্রেটারি ও অ্যাডভোকেট। আর এই মতের সমর্থনে নাকি ভারতের আইন মন্ত্রী ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতের গণপরিষদের সমর্থনে বক্তব্য দিয়েছিলেন

এবং তার পক্ষে যথেষ্ঠ Documents ও জুড়ে দিয়েছিলেন।[১৭৭] কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ সব কিছু পুনর্বিবেচনা করে দেখেন এবং উক্ত ব্যক্তি কে জানিয়ে দেন যে তাহাদের অভিমত ভ্রান্ত এবং দেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কোনো আইন গণপরিষদে পাশ হবার পরে প্রেসিডেন্ট এর স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে উহা দেশের আইনে পরিণত হবে। এবং গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন বা স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তার এই মতামত কে অনেকেই ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন। যদি ও প্রাথমিক ভাবে মিস্টার জিন্না এই সিদ্ধান্তের উপরে একটি কমিটি তৈরি করেন। এবং কিছু দিন পরে জানান দেয় যে যোগেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।[১৭৮] পাকিস্থানের মন্ত্রী সভায় থাকাকালীন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যে আন্দোলন করেছিলেন সংখ্যালঘুদের নিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন তার কয়েকটি জ্বালাময়ী ভাষণে সংখ্যালঘু কমিটি গঠন, তৎকালীন পাকিস্থানের উচ্চস্থানের নেতৃবৃন্দের সুসংহত মনোভাব।[১৭৯]

যখন আম্বেদকর নেহরুর মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন কেবলমাত্র মতবিরোধের কারণে। যেই ভাবে আম্বেদকর কে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন্ত্রী সভায় নিয়ে আসা হয়েছিল অনুরূপ ভাবে মহম্মদ আলী জিন্না ও সুরাবর্দী প্রস্তাবিত পাকিস্তানে তপশিলিদের সর্ব প্রকার নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ কে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় আইন ও শ্রম মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু জিন্নার মৃত্যুর পরেই সমস্যার সৃষ্টি হয় কেননা জিন্নার মৃত্যুর পরেই ক্ষমতার অলিন্দে থাকার জন্য এক নিঃশব্দ বিপ্লব শুরু হয়। সেখানে ধীরে ধীরে মতবিরোধ চরম আকার

ধারণ করে তৈরি হয় বিভাজনের এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। আর এরই পরিণতিতে পাকিস্থানের গভর্নর জেনারল নিযুক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন কিন্তু লিয়াকত আলী খান প্রধান মন্ত্রী হিসেবেই থেকে গিয়ে ছিলেন। ক্রমে পাকিস্থান মন্ত্রী সভার সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর মতবিরোধ প্রকাশ্যে রূপ নিল তখন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও পাকিস্থান মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন আম্বেদকর এর মতই। অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে পাকিস্থান মন্ত্রী সভায় নির্বাচিত করা হয় জিন্নার মৃত্যুর পর সেই সব প্রতিশ্রুতি কর্পূরের মত উবে যায়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হতাশ হয়ে মন্ত্রী সভা ত্যাগ করেন।[১৮০]

৪.১১. মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের সংগ্রাম এবং তাঁর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষে তপশিলি ফেডারেশন থেকে একমাত্র জয়ী প্রতিনিধি। যদিও তাঁর এই নির্বাচিত সদস্য পদ বাতিল করবার জন্য কংগ্রেস তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি পরাজিত কামিনী কুমার সমাদ্দারকে দিয়ে কেস পর্যন্ত করিয়েছিলেন।[১৮১] কিন্তু সত্যের জয় তো কোনও না কোনও সময় উন্মোচিত হবেই ফল স্বরূপ ১৯৪৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে জয়ী ঘোষণা করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস জানত বঙ্গপ্রদেশে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলই হল তপশিলি সমাজের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাই যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যেন বিধান পরিষদে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ষড়যন্ত্র করে গেছে।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল জয়ী না হলে আম্বেদকর আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠানো সম্ভব হতো না। গণপরিষদের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আম্বেদকরের উপস্থিতি অস্পৃশ্য তথা তপশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষা ও চাকুরীর সংরক্ষণের সুবিধার প্রতিষ্ঠা পেল। সংরক্ষণের সুবিধা ভোগীদের মধ্যে যে সব মহাজ্ঞানী মহাপন্ডিত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, আম্বেদকরের বিরুদ্ধ সমালোচক তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীর শিকল পরা সেবক। শুধু তাই নয় সংরক্ষণের সুবিধা ভোগী ঐ সব মহাপন্ডিতগণ তপশিলি সমাজ ধ্বংসের জন্য বিষাক্ত ভাইরাস।[১৮২]

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আশঙ্কা সত্য প্রমানিত করে ১৯৪৬ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীম লীগের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দীর মন্ত্রীসভায় বাংলার তপশিলি সমাজের উন্নতি ও অধিকার রক্ষায় মন্ত্রী হিসাবে যোগদান।[১৮৩] শুরু হ'ল ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস সহ গান্ধী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর গাত্রদাহ। ওই সময় মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভায় একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী হলেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।[১৮৪] ১৯৪৬ সালের ২৪শে এপ্রিলের আগে পর্যন্ত শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তপশিলি সমাজের কেউ ইঞ্জিয়ারিং পড়বার সুযোগ পেত না। ঐ কলেজে ব্রাহ্মণদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দীর মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেনের সহযোগিতায় ১৯৪৬ সালে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের একান্ত প্রচেষ্টায় তপশিলি সমাজের ছাত্রদের সর্বপ্রথম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার সুযোগ হয়।[১৮৫] শুধু তাই নয়, ঐ কলেজের ছাত্রাবাসে ব্রাহ্মণ ছাড়া কারো থাকবার অধিকার ছিল না। তাই তপশিলি এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারী সহযোগিতায় ছাত্রাবাস তৈরি করেন।[১৮৬] এছাড়াও তপশিলি সমাজের মেধাবী ছাত্রদের ইংল্যান্ড, আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য

প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সরকারের থেকে বৃত্তির (অর্থ) ব্যবস্থা করেন। ঐ বিষয়গুলি কংগ্রেস, বর্ণবাদী গান্ধী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মেনে নিতে পারলনা[১৮৭]। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সম্পর্কে ভুলবার্তা দিতে ষড়যন্ত্র করে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে বলল যোগেন আলী মোল্লা। মূল উদ্দেশ্য ছিল যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যেন হিন্দু তথা তপশিলি জাতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠা না পায়।[১৮৮]

ব্রাহ্মণ এবং কংগ্রেসের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সম্পর্কে আরো গাত্রদাহ এবং আতঙ্ক শুরু হল যখন বড়লাটের অন্তরবর্তী সরকারে জিন্না মুসলিম লীগের চার জনের সঙ্গে বাংলা তথা সারাভারত তপশিলি মন্ত্রী হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে মনোনিত করল। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হলেন অন্তরবর্তী সরকারের আইন মন্ত্রী। আগে থেকেই কংগ্রেস, গান্ধীজি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহ সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মাথা ব্যথার কারণ– আম্বেদকর। এমত অবস্থায় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তপশিলি জাতির অধিকার রক্ষার প্রতিনিধি হিসাবে উত্থান সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি আতঙ্ক হয়ে পড়ে। আর তখনই একশ শতাংশ মনুবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের মুখ বর্ণবাদী শঠতার প্রতীক গান্ধী বলল– যা ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৬, স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল-"তপশিলি জাতির একব্যক্তি মুসলিম লীগ কর্তৃক বড়লাটের শাসন পরিষদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমি যদি বলি সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা হইলে আমার নিজেকে প্রতারণা করা হইবে।[১৮৯]

এক কথা তখন বেশি প্রচলিত ছিল যে গান্ধিজীর খুব একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র তপশিলি জাতির প্রতি ছিলনা, ছিল বাঙালী বিদ্বেষী মনোভাব। যা কিনা নেতাজীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আসলে গান্ধী সহ কংগ্রেসের ভিতরে ভিতরে বাংলা ভাগের

ষড়যন্ত্র চলছিল। নেতাজীর অবর্তমানে বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যাতে বাধা হয়ে দাড়াতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা প্রচার। যা শিক্ষা চেতনায় পিছিয়ে থাকা নমঃশূদ্র জাতি সহ তপশিলি সমাজ বুঝতে পারেনি।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যাতে কোন দিনই বিধান সভা এবং লোকসভায় প্রবেশ করতে না পারেন তার জন্য বাম, কংগ্রেস, বর্ণবাদী হিন্দু মহাসভা সমস্ত রকম ষড়যন্ত্র করেছে। আর এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী হতে সাহায্য করেছে তপশিলি জাতির মণীন্দ্র বিশ্বাস, পি. আর. ঠাকুর এবং সবশেষে অপূর্বলাল মজুমদার। এই সব ক্ষুদ্র স্বার্থ লোভীদের মাধ্যমে আর একদিকে আম্বেদকর যাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন কক্ষে প্রবেশ করতে না পারে সেক্ষেত্রে ব্রাক্ষণ্যবাদীরা রাজনৈতিকভাবে সফল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল আইন সভায় পৌঁছালে বাংলা সহ সারা ভারতবর্ষের তপশিলি জাতি, উপজাতির ভাগ্যটাই অন্যভাবে এগিয়ে যেত।[১৯০]

ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরকে যেভাবে নির্বাচনে কারচুপি বা ষড়যন্ত্র করে হারানো হত। যাতে আম্বেদকর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের আইন সভায় ঢুকতে না পারে। কারণ ব্রাক্ষণ্যবাদীদের কাছে আম্বেদকর ছিল আতঙ্ক। তেমনি ভাবে বাংলায়ও আম্বেদকরের মতো যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন ব্রাক্ষণ্যবাদী রাজশক্তির মহাআতঙ্ক। ১৯৫৭ সালের বিধান পরিষদের নির্বাচনে বনগাঁ মহাকুমার বনগাঁ সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসী প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে বিষয় চুড়ান্ত হয়। সৌজন্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কিন্তু কংগ্রেসী মনুবাদী নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে এবং ২৪ পরগণা জেলার ব্রাক্ষণ্যবাদী পৃষ্ঠপোষক জীবন রতন ধরের প্রচেষ্টায় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল কংগ্রেসের মনোনয়ন পেলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের অনুগত মনীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাসকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হল। মণীদ্র ভূষণ বিশ্বাস ব্যক্তি স্বার্থে ক্ষমতার লোভে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করল এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীর ষড়যন্ত্রে নিজে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সেবকে পরিণত হল। যার ফল স্বরূপ নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল নির্দল প্রার্থী হয়েও ব্রাহ্মণ্য পদ সেবক মণীন্দ্র ভূষণ বিশ্বাসে নিকট পরাজিত হলেন। তপশিলি জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত হল। আবার ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল নদীয়া জেলার হাঁসখালি লোকসভা কেন্দ্রে এবং ২৪ পরগণা জেলার বাগদা বিধান সভা কেন্দ্রে দুটি জায়গায় নির্বাচনে দাড়ান। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল কোনক্রোমেই যাতে জিতে আইন সভায় ঢুকতে না পারেন তার জন্য বাংলা এবং দিল্লীর ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস সুগভীর চক্রান্ত করল। হাঁসখালি কেন্দ্রে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের বিরুদ্ধে পি. আর. ঠাকুর এবং বাগদায় মনীন্দ্রভূষণ বিশ্বাসকে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত করল। পি.আর. ঠাকুর আর মণীন্দ্রভূষণকে সামনে রেখে কংগ্রেস ষড়যন্ত্র, ভয়, নির্বাচনে কারচুপি করে দু'টি কেন্দ্রেই যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে হারিয়ে দিল। উদ্বাস্তু সহ তপশিলি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার যোদ্ধার পরাজয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুবাদী শক্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর এই ব্রাহ্মণ্য শক্তির ষড়যন্ত্রের সাফল্যের অর্ঘ স্বরুপ হল মণীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস ও পি. আর. ঠাকুর।[১৯১]

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে আর. পি. আই. সমর্থিত এবং বাম কমিউনিস্ট সমর্থিত বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের এবং ঐ লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধান সভার ভোটের নিরিখে মোর্চার প্রার্থী হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের ১৪১১৪১ ভোট পেয়ে জয়ী হবার কথা। কারণ সাতটি বিধান সভার মধ্যে ৫টি বিধান সভায় আর. পি. আই., বাম-

কমিউনিস্ট প্রার্থীরা জয় লাভ করে। সেখানে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ভোট পান মাত্র ৮৪৬৪৪ টি। আর ভোটের নিরিখে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের বিপক্ষে রনেন্দ্রনাথ সেনের পাবার কথা ৬৬৮৮৯ টি ভোট। কিন্তু বাম-কমিউনিস্ট পার্টির ষড়যন্ত্রে রনেন্দ্রনাথ সেন ১৪৩৮৮৯ টি ভোট পেয়ে জয় লাভ করে। আর এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের নায়ক মেকি কমিউনিস্ট ধজাধারী প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, শান্তিময় ঘোষ– প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। অর্থাৎ তপশিলি যোদ্ধা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যশক্তি পরিচালিত রাজনৈতিক দল আইন সভায় ঢুকতে দিতে রাজী নয়। কারণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের মধ্যে বাবা সাহেব আম্বেদকরের ছায়া দেখে ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুবাদী নেতৃত্বের রাজনৈতিক দল আতঙ্কিত ছিল। তাই যতদিন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বেঁচে ছিলেন সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি সর্বক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করেছে। সহযোগিতায় তপশিলি জাতির ব্রাহ্মণ্যবাদীর অনুগত সেবকগণ।[১৯২]

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলও আম্বেদকরের মতো পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিকায়ত আলীর ষড়যন্ত্রের স্বীকার হলেন। পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের পাকিস্থানী মুসলিম দেহরক্ষী তাঁকে বলেন- “আপনি পশ্চিম পাকিস্থানে থাকলে প্রাণে বাঁচবেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে গেলে পাকিস্থান সরকার আপনাকে ষড়যন্ত্র করে মেরে দেবে”।[১৯৩] এই গোপন তথ্য দেহরক্ষী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে জানিয়ে দেবার পর জাতির স্বার্থে বেঁচে থাকা প্রয়োজন বোধ করে কৌশল করে তিনি পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পূর্ব

পাকিস্থানে যাবার নাম করে কলকাতা বিমান বন্দরে নেমে যান। ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতে থেকে যান এবং পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন।

পাকিস্থানী সরকার পরবর্তী কালে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নিরাপত্তা দেওয়ার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পাকিস্থানের কারাগারে বন্দী করে রাখে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ভারপ্রাপ্ত ঐ অফিসারের পুত্র পরবর্তী সময়ে "TRUE FACT" নামে গ্রন্থে সেকথা প্রকাশ করেন।[১৯৪] পাকিস্থান সরকার বইটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে এবং পান্ডুলিপিসহ সমস্ত বই পুড়িয়ে দেয়। মৌখিকভাবে এটা প্রচলিত সত্য। বাস্তব না জেনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল করাচী থেকে পূর্ব পাকিস্থানে কেন গেলেন না – এই অজুহাতে তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়। আম্বেদকর যেমন তপশিলি জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন যার ফল স্বরূপ "পুনাচুক্তি" (১৯৩২) করতে বাধ্য হয়েছিলেন ঠিক তেমনই পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দু তথা তপশিলি জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ভারতে থেকে যান। যার ফল স্বরূপ ১৯৫০–১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত হিন্দুদের পুনর্বাসন আন্দোলনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে বার বার জেলে যেতে হয়েছে। তপশিলি জাতির শিক্ষা ও চাকুরীর সংরক্ষণের বিরোধী ১৯৬৫ সালের লকুড় কমিশনের[১৯৫] সুপারিশ বাতিল করে বাংলার নমঃশূদ্র, ধোবা, রাজবংশী, সুড়ী সহ সারা ভারতের তপশিলি জাতির শিক্ষা ও চাকুরীর সংরক্ষণের নিরাপত্তা দেন।[১৯৬]

পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর অত্যাচার প্রতিবাদে মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে রাজদ্রোহী হিসাবে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৬০-১৯৬৪ সালে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় কংগ্রেসী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি তাঁকে দুবার

জেল বন্দী করে রাখে। আন্দোলনের সময় কালে নমঃশূদ্র জাতির পি. আর. ঠাকুর ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রের চক্রান্তের স্বীকার হয়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তপশিলি উদ্বাস্তুদের যখন বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে করেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যখন তপশিলি উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে মেঘনাদ সাহার জমি জরিপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বর্ধমান, হাওড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনের পক্ষে যোর আন্দোলন করছেন – তখন পি. আর. ঠাকুরকে দিয়ে বিপরীত মুখী বক্তব্য রাখলেন বাংলার তপশিলি বিরোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজশক্তি। পি. আর. ঠাকুর ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজশক্তির ষড়যন্ত্র ধরতে পারলেন না। ব্যর্থ হল বাঙালীদের বাংলায় পুনর্বাসনের আন্দোলন।[১৯৭]

৪.১২. পর্যবেক্ষন:

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন অভিভক্ত বাংলা থেকে বিভক্ত বাংলার এক মহান ব্যাক্তিত্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যার জন্মই হয়ে ছিল হইত বাংলার অবহেলিত সমাজের এক প্রধান স্তম্ভ হিসেবে সমাজ আলোকিত করেছিল এক দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে এক উল্লেখযোগ্য নাম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। যদিও বাড়ীতেই তার প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং পরবর্তী কালে গ্রামের পাঠশালা থেকে তিনি বাস্তব মুখী হতে শুরু করেন। যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখন তিনি বেশ কয়েকটি সামাজিক ব্যাধির শিকার হন যা তাকে বিভিন্ন সময় ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই সময়ই ভারতে জাতপাত ব্যবস্থার

দ্বারা নিম্নবৃত্ত মানুষেরা বেশি শোষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলার শিকার হচ্ছিল। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। যেহেতু প্রথম থেকেই তার উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন শ্রেণীর মানুষের হৃত সাধন করা তাই তিনি আইন এর দ্বারা তার পরিবর্তন করতে চেয়ে ছিলেন । ফলস্বরূপ আইন নিয়ে পড়াশুনা এবং সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নানা মত বিনিময় ও সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে নিজেকে একদম বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এবং ভোটে জিতে তিনি ফজলুল হকের মন্ত্রী সভায় নিজের স্থান করে নেন। এবং বিভিন্ন সমাজ মূলক কাজের দ্বারা জীবনের বাকিটি সময় অতিবাহিত করতে থাকেন।

তার কাজের বিভিন্ন দিকগুলো যেমন বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন গঠন কেবল মাত্র তপশিলি জাতিতকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় সেই বিষয়ে এখনো আলোচনা করা হত এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকার পাইয়ে দেবার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এসবের ব্যাখ্যার শেষে একথা বলতেই হয় এত মহান মানুষ হয়েও যিনি বর্তমান ইতিহাসে সেভাবে আলোচিত হননি। যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তাকে নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে। আর এই গবেষণার দ্বারা আশাকরা যায় যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সম্পর্কে এই নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করে ইতিবাচকে পরিনত করবে।

যদিও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের মৃত্যু নিয়েও রয়েছে নানারকম সন্দেহ। আর এই সন্দেহটা অবাস্তব নয়। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে নির্বাচনে হারাবার জন্য ১৯৬৮ সালে তাঁরই হাতে গড়া অপূর্ববালা মজুমদারই হন বাগদার তপশিলি বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁরই বিরোধী প্রার্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের। পরিকল্পিতভাবে ১৯৬৮ সালের ৫ই অক্টোবর

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের উপর আক্রমন, খাদ্য পরিবেশণ। শেষ পরিণতি ১৯৬৮ সালের ৫ই অক্টোবরের বনগাঁ বোর্ডের পুলে অসুস্থ হয়ে পড়া এবং শেষ পরিণাম মৃত্যু এবং তপশিলি সমাজকে চিন্তা ভাবনার এক বৃহৎ পরিসরেরও যেন মৃত্যু ঘন্টা বেজে গেল।[১৯৮]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. দেবেশ রায়: 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল', (দেজ পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১০), পৃ. পৃ. ১০২৭-১০৫৫।

২. দেবেশ রায়: *তদেব,* পৃ. পৃ. ৮৪৭-৮৪৯।

৩. Arunoday Sana: *'The caste system in India and its consequences', International Journal of Sociology and Social Policy* 13, no. 3/4 (1993), পৃ. পৃ. ১-৭৬।

৪. Narender Singh: *'Role of Muslim League in the Partition of India', International Journal for Social Studies* 2, no. 9 (2016) পৃ. পৃ. ৭০-৭৫।

৫. দেবেশ রায়: 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল', (দেজ পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১০), পৃ. পৃ. ৮৮৩-৮৯৩।

৬. Kaushik Roy: *'Partition of British India: Causes and Consequences Revisited',* India Review 13, no. 1 (2014) পৃ. পৃ. ৭৮-৮৬।

৭. Kaushik Roy: *তদেব,* পৃ. পৃ. ৭৮-৮৬।

৮. Ishtiaq Ahme: *'The 1947 partition of India: A paradigm for pathological politics in India and Pakistan'* Asian ethnicity 3, no. 1 (2002), পৃ. পৃ. ৯-২৮।

৯. Anushay Malik: *'Alternative politics and dominant narratives: Communists and the Pakistani state in the early 1950s'* In State of Subversion, Routledge India, (2023), পৃ. পৃ. ১০২-১২৯।

১০. Amlan Baisya: *'Caste Politics in West Bengal: The Inside Story'* Chakradhar Baldeo Indurkar, PhD Scholar, School of (2015), পৃ. ৫২।

১১. Amlan Baisya: *তদেব,* পৃ. ৫২।

১২. Mysore Narasimhachar Srinivas: *'Caste in modern India'* , The Journal of Asian Studies 16, no. 4 (1957), পৃ. পৃ. ৫২৯-৫৪৮।

১৩. Sudipta Kaviraj: *'Religion, politics and modernity,'* Occasional Paper (1994), পৃ. পৃ. ১৬৩-১৮৪।

১৪. দেবেশ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ৮৮৩-৮৯৩।

১৫. বিস্তারিত Hamid Dalwai: *'Muslim Politics in India',* Penguin Random House India Private Limited, 2023.

১৬. Sisir K Gupta: *'Moslems in Indian politics, 1947–60',* India Quarterly 18, no. 4 (1962), পৃ. পৃ. ৩৫৫-৩৮১।

১৭. John M Meyer: *'The Royal Indian Navy Mutiny of 1946: Nationalist Competition and Civil-Military Relations in Postwar India',* The Journal of Imperial and Commonwealth History 45, no. 1 (2017), পৃ. পৃ. ৪৬-৬৯।

১৮. Zeenath Kausar: *'Communal Riots in India: Hindu–Muslim Conflict and Resolution', Journal of Muslim Minority Affairs* 26, no. 3 (2006): পৃ. পৃ. ৩৫৩-৩৭০।

১৯. Gerald J Bryant: *'Indigenous Mercenaries in the Service of European Imperialists: The Case of the Sepoys in the Early British Indian Army, 1750-1800',* War in History 7, no. 1 (2000), পৃ. পৃ. ২-২৮।

২০. Belkacem Belmekki: *'The formation of the Indian National Congress: A British manoeuvre?',* ES: Revista de filología inglesa 29 (2008): পৃ. পৃ. ২১-৪১।

২১. Mysore Narasimhachar Srinivas: প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৫২৯-৫৪৮।

২২. Meghnad Desai: *'Communalism, secularism and the dilemma of Indian nationhood',* In Asian nationalism, Routledge, 2002. পৃ. পৃ. ১০১-১৩৫।

২৩. Amartya Sen: *'The threats to secular India',* Social scientist (1993), পৃ. পৃ. ৫-২৩।

২৪. Zeenath Kausar: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ৩৫৩-৩৭০।

২৫. Ghazal Asif: *'Jogendranath Mandal and the politics of Dalit recognition in Pakistan'. South Asia',* Journal of South Asian Studies 43, no. 1 (2020), পৃ. পৃ. ১১৯-১৩৫।

২৬. Ghazal Asif: *তদেব,* পৃ. পৃ. ১১৯-১৩৫।

২৭. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): '*ইতিহসের প্রেক্ষাপটে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ',* (হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ প্রকাশনী, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২০২১), পৃ. ৪৮।

২৮. Suhasini Roy: '*Barishaler Jogen Mandal', CASTE: A Global Journal on Social Exclusion* 3, no. 1 (2022): পৃ.পৃ. ১২৩-১৩৬।

২৯. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খণ্ড',* (চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৫), পৃ. ১৩৬।

৩০. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড',* (চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৫), পৃ. ১।

৩১. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড',* (চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৫), পৃ. ১।

৩২. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৮।

৩৩. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:*প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯।

৩৪. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪৮-৪৯।

৩৫. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫।

৩৬. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫।

৩৭. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৯।

৩৮. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩।

৩৯. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩।

৪০. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩।

৪১. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪৯-৫০।

৪২.Suhasini Roy: *'Barishaler Jogen Mandal', CASTE: A Global Journal on Social Exclusion* 3, no. 1 (2022): 123-136.

৪৩. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *পথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২।

৪৪. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *পথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২।

৪৫. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *পথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২।

৪৬. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১।

৪৭. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১।

৪৮. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর',*(বিশ্বাস পাব্লিশার, কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ. ১৩।

৪৯. জগদীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫২।

৫০. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:'*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর',প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩।

৫১. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫।

৫২. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, তদেব,* পৃ.পৃ.২৬-২৭।

৫৩. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, তদেব,* পৃ. ২৯।

৫৪. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:*‘মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর’,প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৫৫. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩২।

৫৬. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:*‘মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর’, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪।

৫৭. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩।

৫৮.সদানন্দ বিশ্বাস:*‘মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’,* (কলকাতা, দীপালি বুক হাউস,২০০৪), পৃ. ২।

৫৯. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৬০. সদানন্দ বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪।

৬১. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫।

৬২. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, তদেব,* পৃ. ৩৭।

৬৩. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:*‘মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর’, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫।

৬৪. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৮।

৬৫. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:*‘মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর’, প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৫-১৬।

৬৬. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।

৬৭. দেবেশ রায়:*'বরিশালের যোগেন মণ্ডল',* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা, ২০১০), পৃ. ২২।

৬৮. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল:*'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর', প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮।

৬৯. দেবেশ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯২৯।

৭০. দেবেশ রায়: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৯০৯-৯৩৯।

৭১. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৫।

৭২. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রথম খণ্ড, তদেব,* পৃ. ১৩৫।

৭৩. সদানন্দ বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২।

৭৪. Sarbani Bandyopadhyay: *'The Invisibility of Caste in Bengal', The Oxford Handbook of Caste* (2023): পৃ. ৪১৩।

৭৫. Nirupam Hazra: *'The Decline of the Caste Question: Jogendranath Mandal and the Defeat of Dalit Politics in Bengal',* by Dwaipayan Sen, Cambridge, MA, Cambridge University Press, 2018, xii ISBN: 9781108417761'. (2020), পৃ.পৃ. ১২৩৪-১২৩৬।

৭৬. Swapan Kumar Bhattacharyya: '*Exploring BR Ambedkar's Sociology: A Biographical Approach'. In Indian Sociology: Theories, Domains and Emerging Concerns,* Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, পৃ.পৃ. ৯৯-১২৩।

৭৭. মনিমোহন বৈরাগী: *অস্পৃশ্য জনজাতির মুক্তি-সূযর্, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল'*, প্রকাশক অভিমান্য পাল, নদীয়া, ২০১৬, পৃ. ৩০।

৭৮. সরকার, হরষিত: *সোজাকথা* মূল ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা, পৃ ১০১।

৭৯. হরষিত সরকার: *তদেব,* পৃ. ১২৫।

৮০. Chhanda Chatterjee & *Syama Prasad Mookerjee*: *'the Hindu dissent and the partition of Bengal, 1932-1947.* Routledge, 2020; Asif, Ghazal. "Jogendranath Mandal and the politics of Dalit recognition in Pakistan." *South Asia: Journal of South Asian Studies* 43, no. 1 (2020): পৃ.পৃ. ১১৯-১৩৫।

৮১. মনিমোহন বৈরাগী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫।

৮২. জগদীশ চন্দ্র রায়: সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৮৩. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১০।

৮৪. মনিমোহন বৈরাগী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮-২৯।

৮৫. Bidyut Chakrabarty: *'An alternative to partition: The United Bengal scheme', South Asia: Journal of South Asian Studies* 26, no. 2 (2003), পৃ.পৃ. ১৯৩-২১২।

৮৬. বিস্তারিত Bidyut Chakrabarty: '*The Partition of Bengal and Assam 1932-1947: contour of freedom.* Routledge, 2004.

৮৭. Bidyut Chakrabarty: *The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947: contour of freedom.* Routledge, 2004.

৮৮. Bidyut Chakrabarty: *The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947: contour of freedom.* Routledge, 2004.

৮৯. Bidyut Chakrabarty: *The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947: contour of freedom.* Routledge, 2004.

৯০. Bidyut Chakrabarty: *The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947: contour of freedom.* Routledge, 2004.

৯১. David Ludden: *'Spatial inequity and national territory: remapping 1905 in Bengal and Assam', Modern Asian Studies* 46, no. 3 (2012): পৃ.পৃ. ৪৮৩-৫২৫।

৯২. বিস্তারিত Mohammad Kasim Uddin Molla: 'The New Province of Eastern Bengal and Assam, 1905-1911'. PhD diss., SOAS University of London, 1965.

৯৩. J. M. Broomfield: *'The partition of Bengal: A Problem in British Administration, 1830-1912',* In Proceedings of the Indian History Congress, vol. 23, Indian History Congress, 1960. পৃ.পৃ. ১৩-২৪।

৯৪. J. M. Broomfield: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৩-২৪।

৯৫. Dhir Jhingran: *'Hundreds of home languages in the country and many in most classrooms: Coping with diversity in primary education in India', Social justice through multilingual education* 250 (2009), পৃ. ২৬৭।

৯৬. Pritam Singh: *'Hindu bias in India's 'secular'constitution: Probing flaws in the instruments of governance', Third World Quarterly* 26, no. 6 (2005): পৃ.পৃ. ৯০৯-৯২৬।

৯৭. Pritam Singh: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৯০৯-৯২৬।

৯৮. Joya Chatterji: *'The fashioning of a frontier: the Radcliffe line and Bengal's border landscape, 1947–52', Modern Asian Studies* 33, no. 1 (1999), পৃ.পৃ. ১৮৫-২৪২।

৯৯. Joya Chatterji: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৮৫-২৪২।

১০০.Kaushik Roy: *'Partition of British India: Causes and Consequences Revisited',* India Review 13, no. 1 (2014): পৃ.পৃ. ৭৮-৮৬।

১০১. Kaushik Roy: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৭৮-৮৬।

১০২. Z. H. Zaidi: *'The Political Motive in the Partition of Bengal, 1905', Journal of the Pakistan Historical Society* 12, no. 2 (1964), পৃ. ১১৩।

১০৩. Aminul Islam, and Mashihur Rahman: *'A conceptual analysis and understanding of press freedom from Bangladesh perspective', Global Media Journal: Pakistan Edition* 9, no. 1 (2016), পৃ.পৃ.১-১২।

১০৪. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, *৪র্থ খন্ড',* পৃ. ৩৯।

১০৫. Ali, Syeda Ayesha, and Ms Tayana Chatterjee. 'Interpretation of Memories'.

১০৬. যুগান্তর পত্রিকা, ২য় ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬।

১০৭. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *‘মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, ৪র্থ খন্ড’*, পৃ. ০৫।

১০৮. Mohammad Shah: *‘Partition of Bengal: A Review’, Islamic Quarterly* 40, no. 2 (1996), পৃ. ৮৫।

১০৯. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্র নাথ, *চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৪১।

১১০. সেনসাস রিপোর্ট ১৯৪১।

১১১. Ian Arther Talbot: *‘The growth of the Muslim League in the Punjab, 1937–1946’, Journal of Commonwealth & Comparative Politics* 20, no. 1 (1982): পৃ.পৃ. ৫-২৪।

১১২. *Syed Ashraf Ali: 'The Daily Star*, Collected date: *10 August* 2017.

১১৩. M. K. U. Molla: *‘The Bengal Cabinet Crisis of 1945’, Journal of Asian History* 14, no. 2 (1980), পৃ.পৃ. ১২৭-১৪৮।

১১৪. বিস্তারিত যুগান্তর পত্রিকা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬।

১১৫. Eleanor Zelliot: *‘Understanding Dr. BR Ambedkar’. Religion compass 2,* no. 5 (2008): 804-818; Bidyut Chakrabarty: ‘BR Ambedkar and the history of constitutionalizing India’. *Contemporary South Asia* 24, no. 2 (2016): পৃ.পৃ. ১৩৩-১৪৮।

১১৬. বিস্তারিত Gail Omvedt: *Ambedkar: towards an enlightened India,* Penguin UK, 2017.

১১৭. David Gilmartin: *'Partition, Pakistan, and South Asian history: In search of a narrative', The Journal of Asian Studies* 57, no. 4 (1998): পৃ.পৃ. ১০৬৮-১০৯৫।

১১৮. S. K. Pachauri: *'Mountbatten in India and 15 Th August, 1947',* In *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 68, Indian History Congress, 2007. পৃ.পৃ. ৮৮৯-৮৯৪।

১১৯. S. K. Pachauri: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৮৮৯-৮৯৪।

১২০. Amit Ranjan: *'Bangladesh liberation war of 1971: Narratives, impacts and the actors', India Quarterly* 72, no. 2 (2016): পৃ.পৃ. ১৩২-১৪৫।

১২১. Amit Ranjan: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৩২-১৪৫।

১২২. Amit Ranjan: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৩২-১৪৫।

১২৩.Nayanika Mookherjee: *'Never again': aesthetics of 'genocidal'cosmopolitanism and the Bangladesh Liberation War Museum', Journal of the Royal Anthropological Institute* 17 (2011), পৃ.পৃ. *তদেব,* ৭১-৮৪।

১২৪. Nayanika Mookherjee: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৭১-৮৪।

১২৫. বিস্তারিত জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ* ৩য় খণ্ড'।

১২৬. বিস্তারিত 'মায়ের ডাক' পত্রিকা, ১৮ই মার্চ, ১৯৪৮।

১২৭. বিস্তারিত ১৯৬৫ এর লকুড় কমিটির সুপারিশ বন্ধ করে নমঃশূদ্র, দাস, সুড়ি/সাহা ও রাজবংশীদের তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত করে রাখেন।

১২৮. বিস্তারিত, জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ চতুর্থ খণ্ড।*

১২৯. Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury: *'Partition in Bengal: Re-visiting the caste question, 1946–47', Studies in History* 33, no. 2 (2017), পৃ.পৃ. ২৩৪-২৬১।

১৩০. Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury: *তদেব,* পৃ.পৃ. ২৩৪-২৬১।

১৩১. Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury: *তদেব,* পৃ.পৃ. ২৩৪-২৬১।

১৩২. Swarnendu Chakraborty: '*The partition of Bengal in 1947 and The Role of the Hindu MahaSabha' British Journal of Philosophy, Sociology and History* 2, no. 1 (2022), পৃ.পৃ. ৩০-৩৪।

১৩৩. Swarnendu Chakraborty: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৩০-৩৪।

১৩৪. Swarnendu Chakraborty: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৩০-৩৪।

১৩৫. Mirza Rashid Ali Baig: *'The partition of Bengal and its Aftermath', The Indian Journal of Political Science* 30, no. 2 (1969), পৃ.পৃ. ১০৩-১২৯।

১৩৬. Mirza Rashid Ali Baig: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০৩-১২৯।

১৩৭. Dipesh Chakrabarty: *'Remembered villages: representation of Hindu-Bengali memories in the aftermath of the partition', Economic and Political Weekly* (1996), পৃ.পৃ. ২১৪৩-২১৫১।

১৩৮. Mirza Rashid Ali Baig: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০৩-১২৯।

১৩৯. Dipesh Chakrabarty: *তদেব,* পৃ.পৃ. ২১৪৩-২১৫১।

১৪০. বিস্তারিত টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, ১৫ই আগস্ট্, ১৯৪৭।

১৪১. বিস্তারিত বাঙ্গালী রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

১৪২. বিস্তারিত মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিটির সদস্য।

১৪৩. বিস্তারিত সমবায় ও ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রী।

১৪৪. বিস্তারিত কংগ্রেসের বিধান সভার নেতা।

১৪৫. বিস্তারিত যুগান্তর, ১৮ই আগস্ট, ১৯৪৭।

১৪৬. বিস্তারিত তপশিলি আসন দুটিকে ভোট থেকে বিরত রাখা হয়।

১৪৭. বিস্তারিত যুগান্তর, ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭।

১৪৮. Christopher A Bayly: 'The Pre-history of Communalism'? Religious Conflict in India, 1700–1860', *Modern Asian Studies* 19, no. 2 (1985), পৃ.পৃ. ১৭৭-২০৩।

১৪৯. Christopher A Bayly: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৭৭-২০৩।

১৫০. Christopher A Bayly: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৭৭-২০৩।

১৫১. বিস্তারিত মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ব্যাক্তিগত চিঠি, *চতুর্থ খণ্ড*।

১৫২. বিস্তারিত মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ব্যাক্তিগত চিঠি, *চতুর্থ খণ্ড*।

১৫৩. বিস্তারিত যুগান্তর পত্রিকা, ২৩শে মে, ১৯৪৬।

১৫৪. Justice R Mughal: *'Two Nation Theory: In the Light of the Speeches of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah', Available at SSRN 2021435* (2012).

১৫৫. Huseyn Shaheed Suhrawardy: *'Political stability and Democracy in Pakistan', Foreign Affairs* 35, no. 3 (1957), পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩১।

১৫৬. Huseyn Shaheed Suhrawardy: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩১।

১৫৭. Huseyn Shaheed Suhrawardy: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩১।

১৫৮. Huseyn Shaheed Suhrawardy: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩১।

১৫৯. Huseyn Shaheed Suhrawardy: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩১।

১৬০.বিস্তারিত Ikramullah, Shaista Suhrawardy, and Shaista Suhrawardy Ikramullah. *Huseyn Shaheed Suhrawardy:* A Biography, Karachi: Oxford University Press, 1991.

১৬১. Huseyn Shaheed Suhrawardy: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪২২-৪৩১।

১৬২. বিস্তারিত Muhammad Ali Jinnah, Aga Khan III, AK Fazlul Huq, Nawab Waqar-ul-Mulk Kamboh, Huseyn Shaheed Suhrawardy, Feroz Khan Noon, Khwaja Nazimuddin et al: 'All-India Muslim League', (1975)

১৬৩, Rizwan Ullah Kokab, and Mahboob Hussain: *'National Integration of Pakistan: An Assessment of Political Leadership of Huseyn Shaheed Suhrawardy', J. Pol. Stud.* 24 (2017): পৃ. ৩১৫।

১৬৪. বিস্তারিত সাপ্তাহিক জাগরণ, শনিবার, ১৮ই মে, ১৯৪৬।

১৬৫. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩০।

১৬৬. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: *মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ* দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. পৃ. ৩০-৩১।

১৬৭. বিস্তারিত যুগান্তর পত্রিকা, ১ম জুলাই, ১৯৪৬।

১৬৮. জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: '*মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ* দ্বিতীয় খণ্ড', পৃ. ৩৩।

১৬৯. Manosanta Biswas: *'Caste, Community, Religion and Empowerment: The Political Movement of the Muslims, Matua and Namasudras in the Colonial Bengal', Afro Asian Journal of Anthropology and Social Policy* 5, no. 1 (2014), পৃ.পৃ. ৭৯-৯৫।

১৭০. Biswas, Manosanta: *তদেব,* পৃ.পৃ. ৭৯-৯৫।

১৭১. Amlan Baisya: 'Caste Politics in West Bengal: The Inside Story'. *Chakradhar Baldeo Indurkar, PhD Scholar, School of* (2015): পৃ. ৫২।

১৭২. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ চতুর্থ খন্ড', পৃ.পৃ. ১-২।

১৭৩. Dwaipayan Sen: *'Representation, education and agrarian reform: Jogendranath Mandal and the nature of Scheduled Caste*

politics 1937–1943', Modern Asian Studies 48, no. 1 (2014), পৃ.পৃ. ৭৭-১১৯।

১৭৪. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ *যোগেন্দ্রনাথ* চতুর্থ খন্ড', পৃ.পৃ. ১-২।

১৭৫. Dr. Kausar Parveen and Dr. Samina Awan: *'Role of Pakistan National Congress in the Constitutional Development in Pakistan, 1947-1958',* Quarterly Journal of the Pakistan Historical Society 70, no.2, 2022.

১৭৬. Anasua Basu Ray Chaudhury: *'Politics of rehabilitation: struggle of the lower caste refugees in West Bengal', Voice of Dalit* 3, no. 1 (2010), পৃ.পৃ. ৬১-৮২।

১৭৭. বিস্তারিত জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ *যোগেন্দ্রনাথ* চতুর্থ খন্ড'।

১৭৮. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ *যোগেন্দ্রনাথ* চতুর্থ খন্ড', পৃ.পৃ. ৩৯-৪০।

১৭৯. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ *যোগেন্দ্রনাথ* চতুর্থ খন্ড,' পৃ.পৃ. ৪০-৪১।

১৮০. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ *যোগেন্দ্রনাথ* চতুর্থ খন্ড', পৃ. Ii

১৮১. Mahitosh Mandal: *'Dalit Resistance during the Bengal Renaissance', CASTE: A Global Journal on Social Exclusion* 3, no. 1 (2022), পৃ.পৃ. ১১-৩০।

১৮২. দেবেশ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৯২৯-৯৩৩।

১৮৩. Rizwan Ullah Kokab, and Mahboob Hussain: *'National Integration of Pakistan: An Assessment of Political Leadership of Huseyn Shaheed Suhrawardy'., J. Pol. Stud.* 24 (2017), পৃ. ৩১৫।

১৮৪. বিস্তারিত বিশেষভাবে জানা দরকার ঐসময়ে প্রদেশের মন্ত্রী পরিষদের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলা হ'ত।

১৮৫. বিস্তারিত Shaista Suhrawardy Ikramullah and Shaista Suhrawardy Ikramullah: *Huseyn Shaheed Suhrawardy: A Biography*. Karachi: Oxford University Press, 1991.

১৮৬. বিস্তারিত Mohammad HR Talukdar and Kamal Hossain: *'Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy',* (1987).

১৮৭. দেবেশ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৯০৯-৯১৯।

১৮৮. Rizwan Ullah Kokab and Mahboob Hussain: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১৫।

১৮৯. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খন্ড', পৃ. ৭২ ।

১৯০. দেবেশ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১০২৭-১০৫৫।

১৯১. দেবেশ রায়: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০১৬-১০৫৫।

১৯২. দেবেশ রায়: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০২৭-১০৫৫।

১৯৩. দেবেশ রায়: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০৪৭-১০৫৫।

১৯৪. Amlan Baisya: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫২।

১৯৫. Jagannath A mbagudia: *'Scheduled tribes and the politics of inclusion in India', Asian Social Work and Policy Review* 5, no. 1 (2011), পৃ.পৃ. ৩৩-৪৩।

১৯৬. দেবেশ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১০২৭-১০৫৫।

১৯৭. দেবেশ রায়: *তদেব,* পৃ.পৃ. ১০২৭-১০৫৫।

১৯৮. বিস্তারিত দেবেশ রায়: 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল', দেজ পুব্লিশিং হাউস, কলকাতা, (২০১০) ১০১৭।

পঞ্চম অধ্যায়

(CHAPTER FIVE)

বাংলার দলিত চেতনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) ভূমিকা

৫.১. ভূমিকা: বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী ছিল একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বহুল এবং বর্ণময় অধ্যায়। ঐ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঘটে গিয়েছিল দুই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও (১৯৩৯-১৯৪৫) যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব সমগ্র বিশ্ববাসী এবং ভারতবর্ষকেও উপলব্ধী করতে হয়েছিল। আলোচ্য পর্বের ঔপনিবেশিক বাংলাও কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। কারন ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাংলা ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র স্বরূপ। আর ঐ স্বাধীনতায় কেবল মাত্র যে সংগ্রামী বিপ্লবীরা অংশ নিয়েছিল তা নয়। তাতে পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছিল ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, কবি, সাহিত্যিক তথা সমগ্র সম্প্রদয়ের মানুষজন। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন, সামাজিক সংস্কার, সাহিত্য এবং ইতিহাসে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের/উচ্চবর্গের মানুষদের কীর্তি কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নবর্ণের মানুষদের ভূমিকা কে রাখা হয়েছে প্রান্তিক স্তরে বা স্থান দেওয়া হয়নি বললেই চলে। তাই ঐ সমস্ত নিম্নবর্ণের/নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কালেও যে অবহেলা অবজ্ঞা করা হয়ে চলেছে তার একাধিক স্বরূপ বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে

সাধারণ পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন এক দরিদ্র মালো সম্প্রদায়ের স্বল্পজীবি লেখক কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার এক উল্লেখ যোগ্য কথা সাহিত্যিক।[১] অদ্বৈত তাঁর কলমের মাধ্যমে কেবল নিম্নবর্ণের কথাই তুলে ধরেনি সেখানে দরিদ্র, পীড়িত, জরাজীর্ণ, চাল চুলোহীন মানুষদের কথাকেই বেশী মাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছেন।[২]

অদ্বৈত নামটি উচ্চারণ করলেই বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তাঁর অমর সৃষ্টি "তিতাস একটি নদীর নাম" কে বারং বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ উপন্যাসেই তিনি অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের মালোদের করুণ ইতিহাসকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। পরবর্তী কালে তাঁর ঐ অতুলনীয় উপন্যাসটি অবলম্বনে দুই ভারত বিখ্যাত শিল্পী উৎপল দত্ত ও ঋত্বিক ঘটক নাটক (১৯৬৩) এবং চলচ্চিত্রে (১৯৭৩) পরিবেশন করে অদ্বৈত কে চিরকালীন স্থায়ীত্বের আসনটি প্রদান করেছেন।[৩]

৫.২. আর্বিভাব ও শিক্ষা জীবন

“জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম হউক ভালো"[৪] -- এই আদর্শ বাণীটিকে পাথেয় করেই বোধহয় অদ্বৈত তাঁর জীবন তরীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। আর সেটা বাংলা সাহিত্যের পাঠকবর্গ এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছেই সবচেয়ে ভালো বোধগম্যের বিষয়। বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গঠনের তথ্যের মতোই স্বল্পতা রয়েছে। সেই জন্য তাঁর জীবনী মূলক গবেষণা বর্তমানেও প্রবাহমান লেখক ও গবেষকদের মধ্যে। অদ্বৈতের জীবন সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার

অনেকটাই তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মুখ নিসৃত বাণী। লোককথন বা শ্রুতিনির্ভর এবং বিভিন্ন চিঠিপত্র তাই ঐ সমস্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষকদের কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।[৫] তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যধারার সৃষ্টিশীল লেখক যার "তিতাস একটি নদীর নাম" ঐ একটি উপন্যাসই তাকে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় চিরকালীন অমরত্ব দান করেছে। এই রকম ঔপন্যাসিক বাংলা অথবা ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে হাতে গোনা কয়েকজন কে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রাচীন বর্ণাশ্রম দ্বারা চিহ্নিত অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের মালো সম্প্রদায়ের শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ।[৬]

পূর্ববঙ্গের অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া শহরের উপকুলে তিতাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গোকর্ণঘাট গ্রামে ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী অদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন।[৭] অভাব, অনটন ও অনাথই ছিল তার জীবনের তথা পরিবারের চির সঙ্গী। তাঁর পিতা ছিলেন অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। তিনি ছিলেন মালো সম্প্রদায়ের মৎসজীবী। অনিবার্য কারণ বশত অদ্বৈতের মায়ের নাম এখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত। তাঁর সৃষ্ট 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসেও অন্যতম চরিত্র অনন্তের মায়ের নাম কে আড়াল করেছেন স্বয়ং লেখক। এভাবে পাঠক সমাজ অদ্বৈতের উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব জীবনের অনেকাংশের সাযুজ্যের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছেন।[৮]

বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে মালোরা নীচু জাতি অস্পৃশ্য হিসাবেই বিবেচিত হত এবং কুমিল্লার মালো সম্প্রদায়ের বসবাসকারী অঞ্চলকে 'গাবরদের পাড়া' বলে সমাজের উঁচু বর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। ঐ রকম এক প্রতিকুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতের শৈশব এবং কৈশোর কাল অতিবাহিত হয়েছিল।

লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল গভীর টান। যা আমরা তাঁর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে গান, কবিতা ইত্যাদি রচনার লেখার মাধ্যমে প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলাম।[৯] আমরা প্রায়ই দেখতে পাই কিংবদন্তীদের ক্ষেত্রে মিথ বা অতিকথন পিছু ছাড়ে না। অদ্বৈতের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। তাঁর লেখাপড়া সংক্রান্ত তেমনি কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য প্রথমত একটি তথ্য অনুযায়ী মালো সমাজের কিছু ব্যক্তি চাঁদা তুলে তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অপরপক্ষে দ্বিতীয় মতটি অদ্বৈতের সর্ম্পকে কাকা সনাতন মল্লবর্মণের সাহায্যে তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেছিলেন। যাইহোক মালো সমাজের নিম্ন বর্ণীয় মানুষেরা চেয়েছিল অদ্বৈত শিক্ষালাভ করে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সামন্ততান্ত্রিক অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তির ভাতা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন।[১০] যাইহোক অদ্বৈতের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণবেড়িয়া শহরের প্রথম মাইনর স্কুলের মধ্য দিয়ে।[১১] পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মনবেড়িয়ার অন্নদা হাই স্কুল থেকে ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন বিশেষ কৃতিত্বের সাথে।[১২] যদিও অদ্বৈতের ম্যাট্রিক লেবেলের শিক্ষা জীবনের স্কুল নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। বহু গবেষক দেখিয়েছেন অদ্বৈত এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশান থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন।[১৩] আলোচ্য পর্বে কুমিল্লার মালোদের দারিদ্র ছিল নিত্য সঙ্গী ঐ দারিদ্রকে সঙ্গী করে অনমনীয় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান অদ্বৈত কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।[১৪] কিন্তু তাঁর আর্থিক সংকট ক্রমান্বয়ে পূর্বের চেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে সেই কারণে অদ্বৈত তাঁর শিক্ষায় ইতি টেনে দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৪ সালে কর্মানুসন্ধানে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন।[১৫]

৫.৩. প্রাথমিক জীবনের লেখাপত্র এবং জীবিকা ধারন

১৯৩৪ সালে অদ্বৈতকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আদর্শস্থান মালোদের প্রান তিতাস তীরের গোকর্ণকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। কলেজের প্রথম বর্ষের তরুণ তুর্কী ছাত্র অদ্বৈত জীবন যুদ্ধে সৈনিকবৃত্তি হিসাবে কলকাতার ত্রিপুরা পত্রিকাকে গ্রহণ করেছিলেন।[১৬] এবং সেই থেকে তার পথচলা শুরু হয়েছিল এবং অদ্বৈত একাধিক পত্রিকায় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয়ের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন ১৯৩৫ সালে নবশক্তি, মোহাম্মদী,আাজাদ,নবযুগ, কৃষক যুগান্তর[১৭] ইত্যাদি উপরিউক্ত পত্রিকা সমূহে ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত অদ্বৈতের সাংবাদিক ও লেখক হিসাবে অবদান ছিল অসামান্য।[১৮] পত্রিকাগুলিতে তিনি ধারাবাহিক ভাবে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে মোহাম্মাদী মাসিক পত্রিকাতে বাংলা ১৩৫২ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত "তিতাস একটি নদীর নাম প্রকাশিত হয়েছিল।[১৯] নবশক্তিতে 'বরজের গান' (১৯৩৮, ডিঃ), মোহাম্মদীতে 'অপ্রকাশিত পল্লীগীতি' (১৯৪৪), দেশ পত্রিকাতে সাগর তীর্থে (১৯৪৫), নবশক্তি পত্রিকাতে 'ত্রিপুরার একটি বারমাস্যা গান' (১৯৩৬) ইত্যাদি রচনা এছাড়া জীবন তৃষা (১৯৫০), ১৩৫৫ সালের সোনার তরী পত্রিকাতে "শাদা হাওয়া, "রাঙা মাটি চতুষ্কোণ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।[২০]

মাত্র একুশ বছর বয়সে কলকাতার পত্রিকাগুলিতে কাজ করার সময় থেকেই অদ্বৈতের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব বোধ জন্ম নিয়েছিল।[২১] সেই জন্য তিনি ঐ সময় থেকেই যে যৎসামান্য টাকা রোজগার করতেন তার অধিকাংশ টাকা তাঁর পৈতৃক বাসভূমি গোকর্ণঘাটের মালো শিশুদের লেখাপড়া চালানোর জন্য পাঠিয়ে দিতেন।[২২] শ্রী অদ্বৈত সামাজিক দায়দায়িত্বকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজের শরীরের প্রতি তিনি কোন দিন

সেভাবে গুরুত্ব দেন নি। যার পরিনামে অল্প কালের মধ্যেই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

৫.৪. শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম-এ মালোদের নিম্নবর্ণীয় সামাজিক অবস্থান

অদ্বৈত তাঁর এই স্বল্পময় জীবনে খুবই মানবিক প্রকৃতির ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের সে সম্পূর্ন আলাদা ঘরানার লেখক তা আমরা তার উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে ভালোভাবে উপলব্ধী করতে পারি। এছাড়া অদ্বৈত যে জন্য খ্যাতির শীর্ষে তার সেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিনি কিভাবে অশিক্ষিত দরিদ্র মালো সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন কাহিনীর ইতিহাসকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল তা সংক্ষেপে নিচে আলোচিত হয়েছে–অদ্বৈতের সমগ্র উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডে আবার দুটি করে অধ্যায় রয়েছে। প্রথম খণ্ডের দুটি অধ্যায়ের নাম হল 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং প্রবাসখণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় 'নয়া বসত' ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ‘জন্ম-মৃত্যু বিবাহ', তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের নাম রামধনু ও দ্বিতীয় অধ্যায় ‘রাঙা নাও' এবং শেষ খণ্ডের অধ্যায় দুটির নাম ' দুরঙা প্রজাপতি এবং দ্বিতীয় অধ্যায় 'ভাসমান’।[২৩] সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পন আর ঐ দর্পণে অদ্বৈত তৎকালীন মালো সম্প্রদায়ের তথা সমাজের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বাস্তব চিত্রটিকে রাঙিয়ে তুলেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু এবং দেবেশ রায় প্রমুখরা নদীকে দেখেছেন বাইরে থেকে কিন্তু অদ্বৈত

তিতাস কে দেখেছিলেন তাঁর অর্ন্তরনিহিত দৃষ্টির দ্বারা। যদিও সমস্ত উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মানুষদের বাঁচার তীব্র সংগ্রাম।[২৪]

তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো সসম্প্রদায়ের আনন্দ, বেদনা চাওয়া পাওয়া এবং তাদের সমগ্র জীবন যুদ্ধের একজন অংশিদার হিসাবে নিম্নবর্ণীয় সাহিত্যিক রূপে আবির্ভাব হয়ে অদ্বৈত তৎকালীন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তিতাস একটি নদীর নাম, এই নদীর একটি যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ রয়েছে তা ঐ নদীর তীরবর্তী নিম্নবর্ণীয় মালো সম্প্রদায় এবং মুসলিম মানুষেরা জানে না। জানবার চেষ্টাও তারা কোনদিন করেনি। প্রয়োজনই হয়নি। তারা শুধু জানে এই তিতাস তাদের সুখে দুঃখে চিরকালের সঙ্গী। এই নদী যদি না থাকত তবে নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবিকা নির্বাহ প্রায় স্তব্ধ হয়ে যেত।[২৫] এইভাবে অদ্বৈত উপন্যাসটিতে মালোদের জীবনের অর্থনীতি সংস্কৃতি ও সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন এছাড়া তারা যে সমাজের প্রতিটি পদক্ষেপে বর্ণ হিন্দুদের কাছে অবহেলিত হত নির্যাতিত হত সেটাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। যেমন কয়েকটি ক্ষেত্রে অদ্বৈত প্রশ্ন তুলেছে তাঁর কথায় -

"উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা' মালোদের ঘরে নেয় না। মালোরা কোন জিনিস ছুঁলে সে জিনিস অপবিত্র বলে মনে করে। পূজা-পার্বনে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটোপাতা নিজে ফেলিয়া আসতে হয়। সে পাতা ওঁরা ছোঁয় না। জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে।[২৬]

এছাড়া অদ্বৈত উপলব্ধী করেছিলেন উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ প্রতিটি জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ থাকে। ঠিক তেমনি মালোদেরও তিতাস তীরে

নিজেদের একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল আর সেই সংস্কৃতি ছিল তিতাসের জলের মতই স্বচ্ছ ও শান্ত প্রকৃতির। যেমন –

“না ওরে বন্‌ধ, বন্ধ, বন্ধ, কি আরে বন্ধ রে

তুই শ্যাম রাধারে করিলি কলঙ্কিনী

মথুরার হাটে ফুরাইল বিকিকিন।

না ওরে বন্ধ ----

তেল নাহ সলিতা নাহ কিসে জ্বলে বাতি

কেবা বানাইল ঘর, কেবা ঘরের বাতি।”[২৭]

এই সকল গান মালো সমাজের সবারি হৃদয়ের গান ফলে তাদের কানে শোনা মাত্র মালোদের প্রাণের ভিতরটা নাড়িয়ে ওঠে। এবং মালোদের মেলাবার মিলন সংস্কৃতি দোল পূর্ণিমা তাকে অদ্বৈত তাঁর লেখনী দ্বারা একটি নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এই রকম একটি সংস্কৃতি কে যখন শহরের উচ্চবর্ণের জমিদার বা বাবু সংস্কৃতি আক্রমণ করতে থাকে অদ্বৈতের অপূর্ব সৃষ্টি সুবলের স্ত্রী ঐ বাবুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেছিল। [২৮] ১৯৪০ দশকে নিম্নবর্ণীয়রা যেমন উচ্চ বর্ণীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিত হত তেমনি নিম্নবর্ণীয়রা তার প্রতিবাদ করার সাহসও দেখাত।

আমরা সমগ্র উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো, সেখানে নদী উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিম্নবর্ণের প্রান্তিক জন প্রকৃতির বিস্তৃত জীবনযাপন তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জীবন দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। হৃদয় জড়িত কলমের প্রতিটি অক্ষরে জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর প্রাণ স্পন্দন। সে এক অন্য ধারার ইতিহাস। যেখানে

রাজায় রাজায় যুদ্ধ নেই, রাজপুত্র, রাজকন্যার স্বপ্ন কল্পনা নেই, নেই অহেতুক প্রাণ হরনের রক্তের দাগ বরং রয়েছে নেই ইতিহাসের গল্প, যেখানে ধরা দিয়েছে একেবারে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মর্মস্পর্শী কাহিনী। মালোজাতির প্রতি সমাজের উচ্চবর্ণীয়দের ছ্যুৎমার্গ, লেখক কে আহত করেছে তাই তিনি সমাজের সকলের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন -

> "মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত ধুতি চাদর পরিয়া
> জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায়না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও
> অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।"[২৯]

মালো সমাজের মানুষদের প্রতি এই অবর্ণনীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকেই বোধ হয় অদ্বৈতের হাতে উপন্যাসটির জন্ম হয়েছিল বলে পাঠক সমাজ তথা গবেষকগণও ধারণা করতে পারেন। বর্ণ বিভক্ত সমাজে মালোদের সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। তারা সর্বদা বর্ণ হিন্দুদের (বিশেষত ব্রাহ্মণদের) দ্বারা শোষিত এবং অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে চলতেন। আর সেই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে অদ্বৈত - দয়াল চাঁদ নামক চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ---

"ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসনও দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙ্গা তক্তা। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও তোমাকে দিবে শুধু কলকে খানা।"[৩০]

কাজেই সমগ্র উপন্যাসটি আলোচনার দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অদ্বৈত বিপুল নিপুনতার সাথে নিম্নবর্ণের মালো নামক তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিটিকে কেন্দ্র করে অসাধারণ এক আখ্যান রচনা করেছেন। এই ইতিহাস হল একটি জাতির ইতিহাস, একটি সংস্কৃতির ইতিহাস। তাদের ক্রমবিবর্তন লেখকের দৃষ্টিতে একেবারে প্রাণবন্ত।

৫.৫. তাঁর বিবিধ রচনায় দলিত ঐতিহাসিক চেতনা

বরজের গান

অদ্বৈত তাঁর কবিতা, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধে নিম্নবর্ণের / নিম্নবর্গীয়দের দারিদ্রের পাশাপাশি জাত-ব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট অস্পৃশ্যতাকেও সমান ভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপকে চিত্রিত করেছেন 'বরজের গান' নিবন্ধে। এই বরজের গান কি? সে সম্পর্কে তিনি খুব সংক্ষেপে বর্ণনাও করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন পল্লীবাসীগণ প্রধানত দুটি ভাবধারায় ঐ গান রচনা করতেন। 'প্রেম' ও 'সাধনামূলক' গান।[৩১] মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মানব-মানবীর প্রেম-প্রণয় সেই অমর প্রেম ভালোবাসাকেও জাতপাত বা বর্ণাশ্রম কিভাবে আক্রমণ করেছিল তার একটি জীবন্ত দলিল হল অদ্বৈতের এই 'বরজের গান'। আলোচ্য অধ্যায়ে বরজ বা ব্রজ হলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে। ঐ ব্রাহ্মণ ছেলে এক গ্রাম্য নিম্নবর্ণের গন্ধ ভূঁইমালী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে কিভাবে বাধা পড়েছিল সেটাই লেখক ব্যাথাতুর ভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩২] ব্রাহ্মণপুত্র বরজ শিক্ষা কিংবা বাণিজ্যের সূত্রে সে ভিন দেশে থাকে। তার যাত্রাকালের সময়টা গ্রীষ্মের চৈত্র বা বৈশাখ মাস। প্রখর

রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন পল্লীগ্রামের মধ্যে ঢুকল তখন সে সামনেই একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির বাড়ী দেখতে পেয়েছিল এবং বরজ বলিলেন –

“ঘরখানি লেপা মুছা

দুয়ারে চন্দনের ছিটা

এটা বুঝি ----

এটা বুঝি ব্রাহ্মণের বাড়ী।[৩৩]"

এই যে ঘরবাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অপরিচ্ছন্নতা (অথবা শুচি, অশুচি) তাতেও তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ বা বর্ণহিন্দুগণ নিজেদের উচ্চ জাতির ধারনা পোষণ করতেন। তাদের ধারণা নিম্নবর্ণের, শূদ্র, অস্পৃশ্যদের ঘরবাড়ীও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারে না। এই ভেবে বরজ ডাকদিল -

"ঘরে আছ ঘরোয়া ভাই

জল নি আছে খাইবারে চাই,

জাতে আমি

জাতে আমি ব্রাহ্মণের ছাওয়াল।[৩৪]"

এই কথা শুনে বাড়ীতে তখন এক মাত্র অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা অন্য গ্রামের ব্রাহ্মণের ছেলে বরজকে দেখে সে বিস্মৃত হয়ে চেয়ে থাকে। তার পরে সে অচেনা অতিথি ভেবে ঐ ব্রাহ্মণ ছেলের কাছে জল এবং খাবার নিয়ে এসেছিল। তখন বরজ ঐ অপরূপা সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ জলপান করে ঐ মেয়েটির জাত জানতে

চাইল কারণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কাছে প্রেম ভালোবাসা ধনী গরীব তার থেকেও বড় ব্যাপার হল নিজেদের জাত্যভিমান। বরজ

"জল খাইয়া শান্ত হইয়া

জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জাতের মায়া!

বলে, জাতে আমরা-

জাতে আমরা গন্ধ ভূঁইমালী।[৩৫]"

যখন ব্রাহ্মণ পুত্র বরজ জানতে পারল যে ঐ কন্যা নিচু জাতের গন্ধ ভূঁইমালী তখন সে রেগে গিয়ে উৎশৃঙ্খল আচার ব্যবহার এবং কথাবার্তা বলতে থাকে –

"জাতি গেল ভুঁই মালীয়ার ঘরে"।

বরজ নিজে মনে মনে তাঁর জাতি গৌরবের পাপের প্রাশ্চিত্য করবে বলে স্থির করেছিল। তিনি বলেন যে জাত যেহেতু চলে গেলে অতএব তাকে এখানেই চিরকাল কাটাতে হবে।[৩৬] তাই লেখক অদ্বৈত দেখাতে চেয়েছেন মানব মানবীর প্রেম প্রণয় অপেক্ষা তৎকালীন সমাজে বর্ণ হিন্দু বিশেষত ব্রাহ্মণরা জাতিভেদপ্রথা বা অস্পৃশ্যতাকে কিভাবে প্রাধান্য দিত আর নিম্ন বর্ণের বা নিচু জাতের মানুষদের কে কিভাবে ঘৃণা অবজ্ঞা করত। এবং বর্তমানেও ঐ অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মানব সমাজ।

ত্রিপুরালক্ষ্মী

উপন্যাসের মত অদ্বৈতের কবিতাতেও ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ জীবনের নিম্নবর্ণের/নিম্নবর্গের মানুষদের করুণ দৃশ্যের কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ক্ষুধিত, মুমূর্ষু। উদ্বাস্তু এবং প্রাকৃতিকও মানুষের সৃষ্টি কৃত্রিম বিপর্যয়ের জন্য মানুষদের ঐ মর্মস্পর্শী অবস্থার কথা - ১৩৪২ সালের (বঙ্গাব্দে)প্রকাশিত 'ত্রিপুর লক্ষ্মী' কবিতার মাধ্যমে লিখেছেন—

"অনশনে, অর্ধাশনে
জীর্ণ শীর্ণ কংকালের মত
রয়েছে পড়িয়া
নাহিমা প্রাণের সাড়া,
নাহি উৎসবের ধারা
প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া"।[৩৭]

এইভাবে গ্রাম বাংলার যন্ত্রনা দগ্ধ মানুষদের অসহনীয় অবস্থা অদ্বৈত তাঁর সৃষ্টিশীল কলমের দ্বারা সাহিত্য ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া ঐ সমস্ত মরণাপন্ন মানুষদের জন্য তৎকালীন বুদ্ধিজীবি ও নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অচৈতন্য অবস্থা শ্রীঅদ্বৈতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি লিখেছেন -

"সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়
কয় বড় বড় কথা
ছোট ছোট প্রাণগুলো মৃত্যু মোহ তন্দ্রাতে – বিলীন।

কে বুঝিবে ব্যথা"[৩৮?]

এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়েই মালো সমাজের এক দরিদ্র কবি লেখক অদ্বৈত তাঁর মানবিক হৃদয়ের প্রকাশ করেছিলেন এবং সমাজের করুণ অবস্থাকে চিত্রিত করেছিলেন।

আশালতার মৃত্যু

অদ্বৈত 'ত্রিপুরালক্ষ্মী' কবিতায় বাংলার দরিদ্র মানুষদের সমাজ জীবনের ব্যথাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আশালতার মৃত্যু' গল্পেও তিনি আরো গভীর করুন দৃষ্টিতে ঐ ব্যথার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। "আশালতার মৃত্যু"গল্পটিতে অদ্বৈত তিনজন আশালতার কথা উল্লেখ করেছেন অদ্বৈত প্রথমে যার কথা বলেছেন তিনি হলেন আশালতা চাকলাদার। যে কিনা বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে পেটের ক্ষুধা বা অন্নের অভাবে মারা গিয়েছিল। এছাড়া দ্বিতীয়ত আশালতা তালুকদার, আমরা জানি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তিনটি হল মানুষের প্রধান চাহিদার বিষয় বস্তু ঐগুলি ছাড়া মানুষের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে সেই রকম আশালতা তালুকদার মৃত্যুবরণ করে ছিল তার শারীরিক লজ্জা ঢাকবার বস্ত্রের অভাবের জন্য। এবং শেষজন হলেন পূর্ববঙ্গ বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে গৃহত্যাগ করে পশ্চিমবাংলার উদ্ধাস্তু শিবিরে আশ্রয়কারী আশালতা মন্ডল। সে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল তার পারিবারিক অর্থনৈতিক অভাবের জন্য। ১৯৪০-এর দশকে বাংলায় যে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার ফলে সাধারণ মানুষের সামাজিক জন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে ছিল আর সেই কথা অদ্বৈত বর্ণনা করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন – "অমুকগাঁয়ের

আশালতা চাকলাদার নামে এক কুলবধূ না খেয়ে আজ মারা গিয়েছে মহামান্য সরকার এ সম্বন্ধে কী বলেন।"[৩৯] এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারের তরফের মনোভাবের কথাও অদ্বৈত ব্যকুলভাবে ব্যক্ত করেছেন - "সরকার হচ্ছে এমনি এক বস্তু যার মধ্যে কোন দিন কোন দোষ স্পর্শে না। মন্দ লোকেরা যাই বলুক, তিনি তো জানেন তিনি সিজারের স্ত্রীর মতো সৎ, আর যীশুর মত নিষ্পাপ। তাঁর দায়িত্বের অধীনে থেকে কোন লোক না খেয়ে মারা যাবে এটা যে কিছুতেই হতে পারে না। এটা নিশ্চিত মন্দ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ।... যা হোক, একটা সরকারী তদন্ত হল এবং সেই তদন্তের ফল সরকারী বিবৃতি হিসাবে খবরের কাগজে ছাপা হল তাতে বলা হয়েছে; আশালতা মারা গিয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু না খেয়ে মারা গিয়েছে একথা মিথ্যা। আসলে তার মাথা খারাপ ছিল এবং অত্যধিক খাওয়ার ফলে দম আটকে গিয়ে সে মারা যায়"।[৪০]প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে অদ্বৈত সরকারী মনোভাবের যে পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গল্প কবিতার মাধ্যমে তা আমরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সরকারী ভাবনার একই প্রতিচ্ছবি লক্ষ করে থাকি।

ভাই ফোঁটার গান

অদ্বৈত তাঁর "তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে যেমন শুধু মাত্র মালোসম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে মনোরম ভাবে তুলে ধরে বাস্তব রূপ দান করেছেন লেখনীর দ্বারা, ঠিক তেমনি 'ভাই ফোঁটার গান' নিবন্ধে বাংলার সমগ্র হিন্দুদের এক মিলন মুখর উৎস 'ভাইফোঁটা' উপলক্ষ্যে গ্রাম বাংলার মেয়েরা যে সমস্ত গান বাঁধে তাকেও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যেমন -

"আশ্বিন যাইতে রে

কার্তিক আসিতেরে

দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা।

কাটিয়া কলার পাতি

সাজাইয়া তৈলের বাতি

আশীর্বাদ বানাইল ভইন একা।"[৪১]

এছাড়া অন্য আর একটিতে বলেছেন -

"ভাই-এর বোন্ গো সর্বতারা দুর্বা তোল গিয়া।

দুর্বাতুলে ভরিল বাটা ভাই ধনকে দিতে ফোঁটা। "[৪২]

গান গুলির ভাষা এবং ভাব শুনে পাঠক সমাজ ধারণা করতে পারেন যে ঐ গানগুলি বাংলার নিম্ন, মধ্যবিত্ত পরিবারের গান কারণ অদ্বৈত ছিলেন ঐ সকল মানুষদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি যা তাঁর প্রতিটি সাহিত্য কর্মে স্থান দিয়েছেন।

এছাড়া ঐ একই প্রবন্ধে মাতৃ স্নেহের কিছু প্রাচীন গানও তিনি তুলে ধরেছেন আর সেই গানের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে পারিবারিক দারিদ্র। বাঙালীর পৌরাণিক কাহিনীকে অদ্বৈত বাঙালীর সামাজিক জীবনের সাথে মিলিত হতে দেখেছেন। যেমন একটি গানে শিবগৌরির নিদারূণ অভাব অনটনকে মর্মান্তিকভাবে পরিবেশন করেছেন -

"মৃদু বাতাস এলে হাঁড়ি খুড়ি নড়ে,

ওমা মেনকা, আমার মন চলে না।

ভাঙড়া শিবের ঘরে

শিবের ঘর নাই দুয়ার বান্ধে

বদনে ছাউনি ছান্দে।”[৪৩]

অদ্বৈত সমাজ দর্পণে বার বার সকরুণ দৃষ্টিতে বাংলার অস্পৃশ, দলিত, দারিদ্র পীড়িত মানুষদের অবস্থাকে ব্যক্ত করেছেন।

চিঠিপত্র:

শ্রী অদ্বৈত ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে কাচরাপাড়া যক্ষা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম কালীনও তিনি নিম্নবর্ণের দরিদ্র জেলে মানুষজনদের প্রতি নিষ্ঠাবান হৃদয়াবেগের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। যা তাঁর লেখা চিঠি পত্রের মাধ্যমেও আমরা জানতে পেরেছি। অদ্বৈত বা চন্দ্র কিশোর নামে এক ব্যক্তিকে পত্রের মাধ্যমে জানাচ্ছেন যে--" গঙ্গায় রোজি রোজগার নাই বলিয়া শুনিয়াছি"[৪৪]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি কত বড় মাপের মানবিকতা পূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর মনপ্রাণ সমাজের নিচুতলার মানুষদের জন্য উদ্বেলিত হত।

প্রবন্ধ: রোকেয়া জীবনী (১৮৮০ - ১৯৩২)

লেখকের যেমন কোন জাতি, ধর্ম হয় না তেমনি তাঁর লেখার ক্ষেত্রও কোন নির্দিষ্ট জাতি ধর্ম বা সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। অদ্বৈতের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল। তিনি কেবল মাত্র যে বাংলার নিম্নবর্গের/নিম্নবর্ণের/দরিদ্র হিন্দুদের জন্য কলম ধরেছিলেন তা নয়, তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রতিও সমানভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতের মুসলিম সমাজ শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি

আত্মজাগরণ সমস্ত দিক থেকে অনগ্রসর এবং বর্তমানেও অন্যান্য ধর্মের মানুষের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। নারী সমাজ প্রাচীন কাল থেকে আজও সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত, শোষিত, অবহেলিত এবং দলিত।[৪৫] সেহেতু ঐ নারী সমাজের প্রতি ও অদ্বৈত ছিলেন সবিশেষ সচেতন। এক সংগ্রামী মুসলিম নারী রোকেয়ার জীবনীকে তিনি সুন্দর ভাবে উপলব্ধী করেই পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন।[৪৬] আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজের নারীদের কাছে শিক্ষা ছিল আকাশ কুসুম ভাবনা। মুসলিম নারী মানেই তারা বোরখার আড়ালে থেকে পরিবার পরিজনদের কে সেবাক করবে।[৪৭] রোকেয়ার জীবনের এই অবস্থার জন্য অদ্বৈত তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজের শিক্ষার প্রতি দায়িত্বহীনতা সংস্কৃতি জ্ঞানের অভাব কে দায়ী করেছেন।[৪৮] রোকেয়া ছিলেন প্রবল সংগঠনশীল ক্ষমতার অধিকারিনী এবং শিক্ষার প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি সমস্থ প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নারীদের প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে লেখনী ধারন করে জয়ী হতে পেরেছিলেন।[৪৯] এইভাবে অদ্বৈত তাঁর রচনায় রোকেয়াকে এক জীবন্ত মহীয়সী নারীর স্থান দিয়েছিলেন।

ভারতের চিঠি পার্ল বাক কে

'ভারতের চিঠি পার্ল বাক্' -কে বইটি ছিল অদ্বৈতের প্রথম প্রকাশিত বই, আমারা পূর্বেই বুঝতে পেরেছি তিনি ; অদ্বৈত শয়নে, স্বপ্নে ও মননে ছিলেন অস্পশ্য, দলিত, দীনদের সেবক। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি ঐ সমস্ত মানুষজনদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'ভারতের চিঠি পার্ল বাক কে' বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্ল এস. বাক. (১৮৯২-১৯৭৩) ছিলেন মার্কিন লেখিকা তিনি ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

পেয়েছিলেন তাঁর "The Good Earth" গ্রন্থের জন্য ।[৫০] অদ্বৈত তার ঐ গ্রন্থটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। গ্রন্থটিতে অধ্যয়ন করেছিলেন। গ্রন্থটিতে অধ্যাপিকা বাক দেখিয়েছেন প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত শাসনে চীনের মানুষজনদের ভাগ্য কি নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ছিল তার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সেই জন্য অনাহার ছিল তাদের ঐ সময়ের সঙ্গী। তাই দরিদ্র চাষী ওয়াংলাঙ জীবনে বাঁচার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। আর তাতে ঐ চীনা চাষী জয়ী হলেও কিন্তু তাদের নিত্য সমস্যা রয়ে গিয়েছিল।[৫১]

অদ্বৈত একটি পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে বাংলা তথা সমগ্র মানব সমাজের প্রান্তিকায়িত মানুষদের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের মানবভূমি ক্ষেত্রেও বিচরণ করেছেন।[৫২] সমকালীন বিশ্বসাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত বিষয়ে অদ্বৈত ছিলেন খুবই ওয়াকিবহাল। সেইজন্য তিনি Good Earth পড়ে উপলব্ধী করেছিলেন যে ওয়াংলাঙের প্রত্যাহিক জীবনের সঙ্গে ভারতীয় অবহেলিত অস্পৃশ্য দলিত মানুষ তিতাস তীরবর্তী মানুষদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামেরও অনেকাংশে মিল দেখা যায়।[৫৩]

অদ্বৈতের ভারতের চিঠি গ্রন্থটি আলোচনা করে জানতে পারি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তখন ব্যপক ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য। ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পীহা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সমস্ত কিছু তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।[৫৪] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘনীভূ হয়ে ওঠে ছিল এবং ভারতবর্ষের মানুষজনদের অবস্থাও ছিল সংকটপূর্ণ। সেইজন্য অদ্বৈত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন – "পথ চলতে লক্ষ অন্নহীনের ভীড়

ঠেলতে হয়, তারা যেন তোমার 'Good Earth' এর চিত্রিত মানুষগুলিরই প্রতিচ্ছবি। না খেতে পেয়ে দলে দলে শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে কতক মরে কতক বেঁচে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের নারীদের কাপড় নেই ; সেই দিকে চোখ রেখে ওরা বিড়ির টুকরো ফেলে হাসতে হাসতে চলে যায়। অফিস ফেরতা ক্লান্ত বাবুদের মুখ নিঃসৃত আমের আঁটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঐ নারীরা শীর্ণ শিশুগুলির মুখে পুরে দেয়। আমের দাম বেড়ে গেছে। আঁটি দুষ্প্রাপ্য। ডাস্টবিনের পচাগলা কুকুর, বিড়াল ইঁদুরের মাংসের সঙ্গে মিশে আছে যে খাদ্য কণিকা, স্বর্ণরেণু অনুসন্ধানের অভিনিবেশ নিয়ে তাই তারা খুঁজে বার করে। সাহেববাড়ির চাকর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত পচা রুটির টুকরো ছিটিয়ে দেয় কাদার উপর। তাই নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি মারামারি করে। ধরতে না পারলে গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয় তারপর এই করে কিছু দিনের পর জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে, ফুটপাথের উপরে শুয়ে পড়ে একটি ব্যঙ্গের হাসি রেখে মরে যায়। আরো, দুঃখের বিষয়, তাদের বিকৃত দেহ গুলো কে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার মতো সভ্য নাগরিক ব্যবস্থাটুকু পযর্ন্ত আমাদের নেই।"[৫৫]

অদ্বৈত তাঁর চিঠিতে লিখেছেন পার্ল বাক্ একজন শ্বেতাঙ্গ লেখিকা হয়েও তিনি তৃতীয় বিশ্বের বর্ণ বিভক্ত সমাজের দলিত অন্তেবাসী মানুষজনদের সম্পর্কে যথেষ্ট সহমর্মীতার পরিচয় দিয়েছে। যেমন অদ্বৈত তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতে ঐ দলিত মানুষদের প্রতি বিশেষ মর্মস্পর্শ অনুভুতি প্রকাশ করেছেন।

৫.৬. অদ্বৈতের লেখাতে অর্থনৈতিক দারিদ্র ভাবনা

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই নদী সমূহকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন মানব সভ্যতার (যেমন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ৮০০০-২০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব, সুমেরীয় সভ্যতা ৪৫০০-১৯০০ খ্রীষ্ট পূর্ব, হরপ্পা সভ্যতা ৩২৫০-১৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব, মিশরীর সভ্যতা ৩১৫০-৩১ খ্রীষ্ট পূর্ব, ইত্যাদির) সূচনা হয়েছিল। যা আমরা ইতিহাসের পাতায় প্রত্যক্ষ করে থাকি। ঠিক তেমনি ভাবেই তিতাস নদী কেন্দ্র করেই কুমিল্লার মালোসমাজ তথা লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) আর্বিভাব হয়েছিল। ব্যক্তি অদ্বৈতকে আশ্রয় করেই "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসটি বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন স্থায়িত্ব লাভ করেছে বলেই পাঠকবর্গের ধারনা। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একে অপরের পরিপূরক। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কুমিল্লার মালোপাড়া থেকে রাজধানী কলকাতায় যেমন বিচরণ করেছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও অবাধে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সাহিত্যিক জীবনে চারটি ছোট গল্প, ছয়টি কবিতা, চব্বিশটি প্রবন্ধ বা নিবদ্ধ এবং উপন্যাস লিখেছেন তিনটি। অদ্বৈতের অপ্রকাশিত গল্পও রয়েছে একটি সেটি হল আশালতার মৃত্যু। তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতে ধরা পড়েছে ঔপনিবেশিক বাংলা, ভারতবর্ষ এবং এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ব্যথিত, ক্ষুধিত ও অর্থনৈতিক ভাবে দারিদ্র মানুষের চালচিত্র। যদিও তাঁর লেখাপত্র বহু কাল নির্জন নিভৃতে ছিল কিন্ত বর্তমানে লেখক ও গবেষকদের নিরলস প্রয়াসের দ্বারা আবিস্কারের ফলে ভারত তথা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারেও বিপুল সমাদর লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। মানব সভ্যতার সূচনা কাল থেকেই আমরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বৈপরীত্য স্বভাব বা প্রকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্ করে থাকি। যদিও মার্কসের ধারনা অনুযায়ী আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী

কালে শ্রেণী সংগ্রাম বা বৈপরীত্যের সূত্রপাত ঘটেছিল। তাঁর মতে বস্তুজগতের মধ্যে বিপরীত মুখী শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে যেমন বস্তুজগতের আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনি মানব সমাজেরও বিকাশ ঘটেছে তার আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ফলে।[৫৬] আর এই বৈপরীত্যের পরিধিও ব্যপক যেমন আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্রি, উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল, জন্ম-মৃত্যু, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি।

অদ্বৈত তাঁর স্বল্পময় জীবত কালে যে সমস্ত সাহিত্যিক ফসলগুলি সৃষ্টি করেছিল তাতে এক হৃদয়বান মরমীদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যা। এবং তিনি এক ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর লেখা সমুহে সমাজের প্রায় সবধরনের ব্যথাতুর চিত্রগুলি ধরা পড়েছে। যেমন প্রাচীন ভারতী্য় জাত ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের প্রভেদ, ধনীর প্রাচুর্য্যতা, দারিদ্রের ব্যকুলতা, মুক্তিকামী মানুষের আকুতি, হিন্দু মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং সমকালীন সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তাঁর সুনিপুন লেখনিতে ধরাপড়েছিল। যদিও আলোচ্য অংশের প্রধান বিষয়বস্তু হল লেখক অদ্বৈতের লেখা সমুহে সমকালীন অর্থনৈতিক দারিদ্র ভাবনা কিভাবে ফুটে উঠেছিল তারই একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য মানুষদের আনন্দ, বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং তাদের সমগ্র জীবন যুদ্ধের একজন অংশিদার হিসাবে নিম্নবর্ণীয় সাহিত্যিক রূপে আর্বিভুত হয়ে অদ্বৈত তৎকালীন সমাজ রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। “তিতাস একটি নদীর নাম” উপন্যাসে আমরা দেখতে পায় মালোরা সামাজিক ভাবে যেমন পিছিয়ে ছিল তেমনি আর্থিক দিক থেকেও

তারা পিছিয়ে ছিল। কারন কেবল মাত্র তিতাসকে কেন্দ্র করেই তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি। তিতাস থেকে যেটুকু রোজগার হয় তাদিয়ে তারা সারাবছরের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করে থাকে কোনক্রমে। তাই অদ্বৈত লিখেছেন – “নিত্যানন্দ পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনা নাই”।[৫৭]

এই মন্তব্যের দ্বারা লেখক বলতে চেয়েছেন যে যৎসামান্য রোজগারে যেখানে সংসার অচল সেখানে ঐ দরিদ্র মানুষজনের কাছে তামাকের নেশা বিলাসিতাসম। নদী কেন্দ্রীক উপন্যাসে মরশুম ভিত্তিক উপার্জন প্রত্যক্ষ করে থাকি। যা দিয়ে তাদের সারাবছর ব্যয়ভার বহন করতে হয়। ফলে সেখানে সাংসারিক অর্থনৈতিক দারিদ্র নিত্য সঙ্গী, যেমন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে আমরা আরো প্রত্যক্ষ করতে পারি –

“বর্ষায় খুব কষ্টে পড়িল। অনন্তর মা খায় কি। এই সময়ে মাছ খুব পড়ে। কিন্তু তার আগেই সকলের জাল বোনা শেষ হইয়া যায়। তারপর আর কেউ সুতা কিনিতে আসে না। সুতা কাটাতে আর হাত চলে না। বিক্রি হয় না, কাটিয়া কি লাভ। তার সংসার অচল হইয়া পড়িতেছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পারিয়া অনন্ত দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছে”।[৫৮]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং ইংরেজদের শাসনে ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থিক অনটন কোন মাত্রাই পৌছেছিল তা আমরা অদ্বৈতের এই উপন্যসের মাধ্যমে খুব ভালো ভাবে উপলবদ্ধী করতে পারি – ‘কাদিরের হাটে আলু বিক্রি করতে গিয়েছিল,

দুই-চারিটা ছোট ছোট আলু এপাশ ওপাশে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। আর সেগুলি মালিকের অধিকারের বাইরে মনে করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরিতেছিল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভিখারির ছেলে নয় কিন্তু, ইহারা সবখানেই আছে, সব দেশে সব গাঁয়ে আর সব গাঁয়ের বাজারে। কাদিরের ঐ দুঃখী ছেলেদের কিছু না বললেও বেপারীরা তাদের ধমক দিত। আলুতে হাত দিলে চড়চাপড় মারে'।[৫৯] এই সব ঘটনাকে লেখক আর্থিক দারিদ্রের ফল হিসাবেই বর্ননা করেছেন। কারন তখন বৃটিশ শাসন ও শোষণ চরম পর্যায়ে গিয়েছিল। এছাড়া অদ্বৈত আরো লিখেছেন এবং অনন্ত নিজে মন্তব্য করেছেন –

"মা কোনদিন পয়সা দিয়া পান কিনিয়া খাইতে পারে নাই। তার হাতের কুড়ানো পচা পান পাইয়া মা কত খুশি হইয়াছে"।[৬০]

প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি যে খাদ্যাভাব। এবং আমরা জানি আর্থিক সংকটের কারনেই খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। এইভাবে অদ্বৈত সমগ্র উপন্যাসে মালো সমাজ তথা বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরাবস্থাকে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় 'রামধনু' এই অধ্যায়টি আরো অনেক বেশি মর্মস্পর্শী বর্ণনা। মালো সমাজ যে অর্থনৈতিক ভাবে দেউলিয়া সেটা ভালো ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সমাজে 'পণ প্রথা' প্রচলিত থাকার কারনে কোন কোন ব্যক্তি তার কন্যা বা বোনকে বিয়ে দিতে গিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়। তা আমরা অদ্বৈতের উপন্যাসেও লক্ষ্য করতে পেরেছি-

“বনমালীর কথা কও? তুমি ত জান দিদি, মা বাপ ভাই বেরাদর যার নাই, ক্ষেত পাখর জাগা-জমি যার নাই, টাকা-কড়ি গয়নাগাটিয়ার নাই, তারে লোকে মাইয়া দেয়? অন্তত তিনশ টাকা হাতে থাকত ত দেখতাম-মাইয়ার আবার অভাব।

তিনশ টাকা! পর পর তিনটা বোনের বিবাহ হইয়াছে বাবা বাঁচিয়া থাকিতে। পণ লইয়াছে তিনশ টাকা করিয়া। আর এই টাকা দিয়া সমাজের লোক খাওয়াইয়াছে। এখন বনমালীর নিকট হইতেও তিনশ টাকা পণ লইয়া মেয়ের বাপ তার সমাজকে খাওয়াইবে। কি ভীষন সমস্যা”![৬১] আলোচ্য অংশে আমরা এওলক্ষ্য করেছি যে কোন কোন সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে অনেক পুরুষ ছেলে বিয়ে করতে পারেনা।

এছাড়া “স্পর্শদোষ” নামক ছোট গল্পেও আমরা অদ্বৈতের অর্থনৈতিক দারিদ্র ভানার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। গল্পের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত মোটামুটি একই ছবি ধরা পড়েছে। একদিকে দেখানো হয়েছে টাকা পয়সার অভাব এবং অন্য দিকে খাবারের অভাব। খাবার চুরি করে খেতে গিয়ে বৌমা শাশুড়ীর হাতে কিভাবে ধরা পড়ছে। তাই লেখক সুকৌশলে তাঁর স্পর্শদোষ গল্পে লিখেছেন-

“পল্লীর যে বধু শাশুড়ীর গঞ্জনা মাত্র ভক্ষন করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত উদরটাকে দিনের পর দিন শূন্য রাখিয়া নির্ব্বিবাদে চলে-তাহাকে দেখিয়া যতটা ব্যথা না পাই, যে-বৌ শাশুড়ীর রক্ষিত সুখাদ্য চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে সে আমাদের সহানুভুতি আকর্ষণ করে বেশি”।[৬২]

তিনি আরো লিখেছেন-

“অভাব লইয়া যাহারা বাঁচে, অভাব তাহাদের গ-সহা। বৈদান্তিকের তাহারা নির্মল প্রশংসার অধিকারি। অভাব লইয়া যাহারা কাঁদে মানুষের বুকে দেয় তাহারা আঘাতের পর আঘাত”।[৬৩] অর্থাৎ খাদ্যের অভাব সমগ্র মানবিক মানব সমাজকে ব্যথিত করছে সেই কাহিনীকে আলোচনা করেছেন।

উপন্যাস, ছোট গল্পের মত অদ্বৈতের কবিতাতেও ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থ-সামাজিক শ্রীহীন অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। সমকালীন ক্ষুধিত ,মুমূর্ষু মানুষদের ঐ আর্থিক দূরাবস্থার জন্য তিনি প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্টি কৃত্রিম বিপর্য্যয়কে দায়ী করে -১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত “ত্রিপুরা লক্ষ্মী” কবিতার মাধ্যমে লিখেছিলেন –

“অনশনে, অর্ধাশনে জীণ শীর্ণ কংকালের মত
রয়েছে পড়িয়া
নাহিমা প্রাণের সাড়া, নাহি উৎসবের ধারা
প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া”।[৬৪]

এইভাবে গ্রাম বাংলার যন্ত্রনা দগ্ধ প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক অসহনীয় অবস্থা অদ্বৈত তাঁর সৃষ্টিশীল কলমের দ্বারা সাহিত্য ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া কখনো কখনো ঐ সমস্ত মরনাপন্ন মানুষদের জন্য তৎকালীন বুদ্ধিজীবি নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি বর্গের অচৈতন্য অবস্থা শ্রীঅদ্বৈতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাই তিনি অনেক সময় সরাসরি প্রশ্ন তুলে লিখেছেন-

“সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়

কয় বড় বড় কথা

ছোট ছোট প্রাণগুলো মৃত্যু মোহ তন্দ্রাতে –বিলীন।

কে বুঝিবে ব্যথা”।[৬৫]

এই সমস্ত কবিতার মধ্যদিয়ে লেখক অদ্বৈত যেমন তাঁর মানবিক হৃদয়য়ের প্রকাশ করেছিলেন তেমনি আর্থিক ভাবনার মাধ্যমে সমাজকেও চিত্রিত করেছিলেন।

অদ্বৈত তাঁর “তিতাস একটি নদীর নাম” উপন্যাসে যেমন শুধুমাত্র মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় গুলিকে মনোরম ভাবে তুলে ধরে বাস্তব রূপ দান করেছেন লেখনীর দ্বারা। ঠিক তেমনি ভাবে “ভাই ফোঁটার গান” প্রবন্ধে বাংলার সমগ্র হিন্দুদের এক মিলন মুখর উৎসব ভাই ফোঁটা উপলক্ষ্যে গ্রাম বাংলার মেয়েরা যে সমস্ত গান বাঁধে তাকেও সুন্দর ভাবে বর্ননা করেছেন। ঐ গান গুলির ভাষা এবং ভাব শুনলে পাঠক সমাজ ধারনা করতে পারেন যে ঐ গান গুলি বাংলার আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র, নিম্নবৃত্ত, ও মধ্যবিত্ত পরিবারের গান কারণ অদ্বৈত ছিলেন ঐ সকল মানুষদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিনিধি যা তাঁর প্রতিটি সাহিত্য কর্মে স্থান দিয়েছেন।

এছাড়া ঐ একই প্রবন্ধে মাতৃ স্নেহের কিছু প্রাচীন গানও তিনি তুলে ধরেছেন আর সেই গান গুলির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ঔপনিবেশিক বাংলার পারিবারিক দারিদ্রতা। বাঙ্গালীর পৌরাণিক কাহিনীকে অদ্বৈত বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সাথে মিলিত হতে

দেখেছেন। যেমন একটি গানে শিবগৌরীর নিদারুন অভাব অনটনকে মর্মান্তিকভাবে পরিবেশন করেছেন –

“মৃদু বাতাস এলে হাঁড়ি খুঁড়ি নড়ে,

ওমা মেনকা, আমার মন চলে না

ভাঙড়া শিবের ঘরে

শিবের ঘরে নাই দুয়ার বান্ধে

বদনে ছাউনি ছান্দে”।[৬৬]

সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। অদ্বৈত সেই সমাজ দর্পনে বার বার সকরুন দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য, নিম্নবর্ণীয় দলিত তথা সমগ্র মানব সমাজের আর্থিক দুরাবস্থাকে ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে কাচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যখন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন তখনও তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার মানুষজনদের প্রতি নিষ্ঠাবান হৃদয়াবেগের অনুভুতি প্রকাশ করেছিলেন। যা তাঁর লেখা চিঠি পত্রের মাধ্যমেও আমরা জানতে পেরেছি। অদ্বৈত বাবা চন্দ্র কিশোর নামে এক ব্যক্তিকে পত্রের মাধ্যমে জানাচ্ছেন যে – “গঙ্গায় রোজি রোজগার নাই বলিয়া শুনিয়াছি”।[৬৭] রোজি রোজগার অর্থাৎ শ্রমের বা কর্মের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ। ঐ অর্থ দিয়েই মানুষ জীবন ধারন করে থাকেন। কর্ম মানুষের আর্থিক উন্নতির স্মারক কিন্তু কর্মহীন জীবন আর্থিক অবনতির প্রতীক। শারীরিক ভগ্ন অবস্থায়ও তিনি যখন মানুষজনের আর্থিক অবস্থার খবরাখবর

নিচ্ছেন এর দ্বারা প্রমানিত হয় লেখক অদ্বৈত কত বড় মাপের মানবিকতা পূর্ন মানুষ ছিলেন। এবং সর্বদা তাঁর মন প্রাণ সমাজের নিচুতলার মানুষদের জন্য উদ্বেলিত ছিল।

"ভারতের চিঠি পার্ল বাক-কে" বইটি ছিল অদ্বৈতের প্রথম প্রকাশিত বই, আমরা তাঁর অন্যান্য লেখাগুলি পড়েও বুঝতে পেরেছি তিনি শয়নে, স্বপ্নে ও মননে ছিলেন নিম্নবর্ণীয়, অস্পৃশ্য, দলিত তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের সমগ্র দীনদের সেবক। তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি ঐ সমস্ত মানুষজনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'ভারতের চিঠি পার্ল বাক কে' বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্ল এস বাক(১৮৯২-১৯৭৩) ছিলেন মার্কিন লেখিকা তিনি ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তাঁর "The Good Earth" গ্রন্থের জন্যে।[৬৮] অদ্বৈত তাঁর ঐ গ্রন্থটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। গ্রন্থটিতে অধ্যাপিকা বাক দেখিয়েছেন প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত শাসনে চীনের মানুষজনের আর্থিক ভাগ্য কি নিদারুন ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সেই জন্য অনাহার ছিল তাদের ঐ সময়ের সঙ্গী। তাই দরিদ্র চাষী ওয়াংল্যাঙ জীবনে বাঁচার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। আর তাতে ঐ চীনা চাষী জয়ী হলেও কিন্তু তাদের নিত্য সমস্যা রয়ে গিয়েছিল।[৬৯]

অদ্বৈত একটি পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মানব সমাজের প্রান্তিকায়িত মানুষদের যেমন প্রতিনিধি ছিলেন। ঠিক তেমনি একই ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের মানবভূমি ক্ষেত্রেও বিচরণ করেছেন।[৭০] সমকালীন সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতির বিষয়েও অদ্বৈত ছিলেন খুবই ওয়াকিবহাল। সেইজন্য তিনি 'Good Earth' পড়ে উপলব্দ্ধী

করেছিলেন যে চীনাবাসী ওয়াংলাঙ্গের প্রত্যাহিক জীবনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলার অবহেলিত মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবন সংগ্রামেরও অনেকাংশে মিল পরিলক্ষিত করেছিলেন।[৭১]

অদ্বৈতের ভারতের চিঠি গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কারনে ভারতের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তখন বাংলায় ব্যপক ভয়ংকর আকার ধারন করেছে। এছাড়া বিংশ শতব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশৃঙখলার কারনে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ঘনীভূত হয়ে ওঠে ছিল এবং ঔপনিবেশিক ভারতের মানুষদের আর্থিক অবস্থাও ছিল সংকটপূর্ন।[৭২] সেই পরিস্তিতির কথা অদ্বৈত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

“পথ চলতে লক্ষ অন্নহীনের ভীড় ঠেলতে হয়, তারা যেন তোমার ‘Good Earth’ এর চিত্রিত মানুষগুলিরই প্রতিচ্ছবি। না খেতে পেয়ে দলে দলে শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে কতক মরে কতক বেঁচে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের নারীদের কাপড় নেই; সেই দিকে চোখ রেখে ওরা বিড়ির টুকরো ফেলে হাসতে হাসতে চলে য়ায়। অফিস ফেরত ক্লান্ত বাবুদের মুখ নিঃসৃত আমের আঁটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঐ নারীরা শীর্ন শিশুগুলির মুখে পুরে দেয়। আমের দাম বেড়ে গেছে। আঁটি দুষ্প্রাপ্য। ডাস্টবিনের পচাগলা কুকুর, বিড়াল ইঁদুরের মাংসের সঙ্গে মিশে আছে যে খাদ্য কনিকা, স্বর্নরেনু অনুসন্ধানের অভিনিবেশ নিয়ে তাই তারা খুঁজে বার করে। সাহেববাড়ির চাকর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত পচা রুটির টুকরো ছিটিয়ে দেয় কাদার উপর। তাই নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি মারামারি করে। ধরতে না পারলে গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে

দেয় তারপর এই করে কিছু দিনের পর জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে ফুটপাথের উপরে শুয়ে পড়ে একটি ব্যঙ্গের হাসি রেখে মরে যায়। আরো, দুঃখের বিষয়, তাদের বিকৃত দেহ গুলো কে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার মতো সভ্য নাগরিক ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত আমাদের নেই"।[৭৩]

অদ্বৈত তাঁর চিঠিতে লিখেছেন পার্ল বাক একজন শেতাঙ্গ লেখিকা হয়েও তিনি তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের আর্থিক দুরাবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সহমর্মীতার পরিচয় দিয়েছেন। ঠিক তেমনি অদ্বৈত তাঁর লেখাসমুহেও ঔপনিবেশিক বাংলার মানুষদের অর্থনৈতিক দারিদ্র কে স্থান দিয়ে তিনিও বিশেষ মর্মস্পর্শী অনুভুতির প্রকাশ করেছেন।

অদ্বৈতের যে সমস্ত লেখা সমুহে বাংলার আর্থিক দারিদ্র ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য হল "আশালতার মৃত্যু" গল্পটি। যদিও এটি তাঁর অপ্রকাশিত গল্প। আর্থিক দুর্দশার ইতিহাসের চরমতম রূপটি আমরা তাঁর এই গল্পতটির মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। অদ্বৈত গল্পটিতে তিনজন আশালতার কথা উল্লেখ করেছেন – প্রথমে যার কথা বলেছেন তিনি হলেন আশালতা চাকলাদার। যে কিনা বিংশ শতব্দীর চারের দশকে দুর্ভিক্ষ জনিত কারনে অন্নের অভাবে মারা গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত আশালতা তালুকদার, আমরা জানি অন্ন, বস্ত্র, বাস্থান তিনটি হল মানুষের প্রধান চাহিদার বিষয়বস্তু ঐগুলি ছাড়া মানুষের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে সেই রকম আশালতা তালুকদার মৃত্যুবরণ করেছিল তার শারীরিক লজ্জা ঢাকবার বস্ত্রের অভাবের জন্য। এবং শেষজন হলেন পূর্ব্বঙ্গের আশালতা মণ্ডল সে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল তার পারিবারিক অর্থনৈতিক অভাবের জন্য। ১৯৪০ এর

দশকে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার ফলে সাধারন মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠেছিল আর সেই কথা বর্ননা করতে গিয়ে অদ্বৈত প্রশ্ন করেছেন –"অমুকগাঁয়ের আশালতা চাকলাদার নামে এক কুলবধূ না খেয়ে আজ মারা গিয়েছে মহামান্য সরকার এ সম্বন্ধে কী বলেন"।[৭৪] এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারের তরফের মনোভাবের কথাও অদ্বৈত ব্যকুলভাবে বর্ননা করেছেন – "সরকার হচ্ছে এমনি এক বস্তু যার মধ্যে কোন দিন কোন দোষ স্পর্শে না। মন্দ লোকেরা যাই বলুক, তিনি তো জানেন তিনি সিজারের স্ত্রীর মতো সৎ, আর যীশুর মত নিস্পাপ। তাঁর দায়িত্বের অধীনে কোণ লোক না খেয়ে মারা যাবে এটা যে কিছুতেই হতে পারেনা। এটা নিশ্চিত মন্দ উদ্দেশ্য প্রনোদিত সংবাদ। ...... যা হোক, সরকারি তদন্ত হল এবং সেই তদন্তের ফল সরকারি বিবৃতি হিসাবে কাগজে ছাপা হল তাতে বলা হয়েছে আশালতা মারা গিয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু না খেয়ে মারা গিয়েছে একথা মিথ্যা। আসলে তার মাথা খারাপ ছিল এবং অত্যধিক খাওয়ার ফলে দম আটকে গিয়ে সে মারা যায়"।[৭৫] সরকারি এই বিবৃতি গুলি যে মিথ্যা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সরকারি উদাসিনতার জন্য সমাজের এই আর্থিক পরিস্থিতি বলেই মনে করেন লেখক। অর্ধশতাব্দী অধিক কাল আগে শ্রীঅদ্বৈত সরকারি মনোভাবের যে পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গল্প, কবিতার মাধ্যমে তা আমরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক ভাবনা সম্পর্কে সরকারি মনোভাবেরও একই প্রতিচ্ছবি লক্ষ করে থাকি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্যিক সৃষ্টি ফসলগুলি আধুনিক যুগের হলেও তাঁর বহু রচনা অনেক দিন নির্জন নিভৃতে অবস্থান করেছিল। বর্তমানে সেগুলি আবিষ্কারের ফলে

সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণা ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতি পাচ্ছে। তিনি সমাজ, রাজনীতির মতো অর্থনৈতিক বিষয়ক লেখা সমূহেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন যা আমরা উপরিউক্ত উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ গুলি বিশ্লেষন করে অনুভব করতে পারি। ১৯৪০ এর দশকে ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতে এবং ভারতের বাইরের যে অর্থনৈতিক দারিদ্র বা অভাব সৃষ্টি হয়েছিল সেই ইতিহাসকেও তিনি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সমাজের নিম্নবর্নীয় সম্প্রদায়ে অবস্থান করলেও তাঁকে আমরা সমাজের সমস্থ মুক্তিকামী অসহায় মানুষদের প্রতিনিধি রূপেও পেয়েছি।

৫.৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখার প্রধান বিষয়বস্তু কি?

অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতাগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে- কেন তিনি অল্প বয়স থেকেই কলম হাতে তুলে মনে নিয়েছিলেন, তাঁর লেখার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল কেনই বা তিনি বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দিয়েছিলেন সেই প্রশ্নটি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়-

১. সব শিল্পীরই হৃদয়ে একটা শিল্প যন্ত্রণা বাসা বাঁধে আর সেই যন্ত্রণা হল মায়েদের প্রসব যন্ত্রণার মত জ্বালাময়ী। সে যতক্ষণ না কোন নবরূপ দিতে বা সৃষ্টি করতে পারে ততক্ষণ তার ঐ বাসাতে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। অদ্বৈতের ঐ তীব্র যন্ত্রণা থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ ফসল গুলি একের পর এক সৃষ্টি হয়েছিল যেমন-'তিতাস একটি

নদীর নাম', 'শাদা হাওয়া', 'স্পর্শদোষ', 'ত্রিপুরালক্ষী', 'আশালতার মৃত্যু' ইত্যাদি।[৭৬] ঐ সমস্ত লেখাগুলিতে তিনি তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন।

২. অদ্বৈত তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা চিঠি পত্র সমস্ত ক্ষেত্রেই শান্ত স্নিগ্ধ দয়ালু ও ভাবুক মরমী দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন ভারতবর্ষ ও ঔপনিবেশিক বাংলার নিম্নবর্ণের/ নিম্নবর্গের দলিত মানুষদের অবস্থা, তাদের অশিক্ষা, দারিদ্র, ক্ষুধার জ্বালা এবং তাদের মর্ম বেদনাময় মনোকষ্টকে লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন।[৭৭]

৩. তাঁর কবিতায় দেশপ্রেমেরও আভাস রয়েছে। তিনি যখন মোহাম্মদী পত্রিকায় কাজ করতেন তখন 'মোহনলালের খেদ' নামে (যদিও অপ্রকাশিত) কবিতা লিখেছিলেন। ঐ কবিতাটির বিষয় বস্তু ছিল দেশপ্রেম মূলক সেই জন্য তৎকালীন শাসক ব্রিটিশদের রোষে পড়তে হয়েছিল পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে।[৭৮] দেশ প্রেম জাগরিত করাই ছিল ঐ কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু।

৪. এছাড়া তিনি লেখার মধ্য দিয়ে সমাজের উচ্চবর্ণীয় জমিদার শ্রেণী বা সরকারের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্নও তুলেছেন। যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে যখন মালোদের সংস্কৃতিকে শহরের উচ্চবর্ণীয়দের সংস্কৃতি গ্রাস করেছিল তখন সুবলের স্ত্রী তাদের বিরুদ্ধচারণ করেছিল।[৭৯]

৫.অদ্বৈতের রচনাতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক অসাধারণ মেল বন্ধনও প্রতিফলিত হয়েছে। যা গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে প্রবাহমান ও সুদৃঢ় করতে পেরেছিল।[৮০] যার অন্যতম উদাহরণ হল 'তিতাস একটি নদীর নাম'

উপন্যাসে। তিতাসের উপর নির্ভরশীল অধিকাংশ মালো সম্প্রদায়ের হলেও মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের দলিত মানুষজনও তার উপর জীবিকা নির্বাহ করত।[৮১]

৬. তথাকথিত বাংলার নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষদের এবং দারিদ্র পীড়িত মানুষদের বাস্তব অবস্থাকে সমাজের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিরা যাতে উপলব্ধী করতে পারে তার জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। অদ্বৈত মনে করতেন ঐ সমস্ত মানুষদের গৃহত্যাগ, প্রাকৃতিক এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্টির কৃত্রিম বিপর্যয়ের ফলে মানুষদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল সেই বাস্তব চিত্রগুলি যাতে পাঠক সমাজ বুঝতে পারে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে।।[৮২]

৭. লেখক/ঔপন্যাসিক অদ্বৈত চাইতেন সমাজের নিম্নবর্ণের অবহেলিত মানুষ গুলো যাতে ভবিষ্যতে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারে তাই তিনি সমাজের দর্পণ সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর লেখার মাধ্যম হিসাবে যেমন অদ্বৈত যখন লেখাপড়া করত তখন গোকর্ণঘাটের মালোরা চাইতেন অদ্বৈত যেন শিক্ষিত মানুষ হয়ে তাদের উপরে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ক্রমবর্দ্ধমান, তার রক্ষাকর্তা হিসাবে ফিরে আসে।[৮৩]

৫.৮. প্রধান বাংলাভাষী প্রদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ অপ্রাসঙ্গিক কেন ?

অবিভক্ত ভারত তথা অধুনা বাংলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক উপন্যাসিক হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনি অনুসন্ধানমূলক এবং সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসাবেই অধিক পরিচিত। স্বল্পজীবী প্রবল প্রতিভাধর লেখক ছিলেন। তিনি ছিলেন

মালো সম্প্রদায়ের দলিত। অদ্বৈত দলিত সাহিত্যিক হলেও বাংলা ভাষার ও অ দলিত সাহিত্যেও তিনি তার সাহিত্যিক প্রতিভার গভীর ছাপ রেখেছিলেন। যদিও প্রতিভা কোনদিন জাতপাত ধর্ম বর্ণ স্থান-কাল দেশ-বিদেশের সীমা রেখা মানেনা। অদ্বৈত ছিলেন সেই রকম একজন ব্যক্তিত্ব। তার জন্ম কুমিল্লা শহরে হয়েছে এবং পড়াশোনা যতটুকু করেছে ওই কুড়ি বছর নিজে জন্মস্থানে ছিলেন। দারিদ্রতা এবং পিতামাতা ও সহোদরের মৃত্যু শোকের কারণে তার কলেজের পড়া অসম্পূর্ণ রেখে ১৯৩৪ সালে জন্মস্থান কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কলকাতায় কাজের সন্ধানের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৮৪] এবং কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেছেন মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত। অদ্বৈত এই কলকাতার নবশক্তি দৈনিক আজাদ মাসিক মোহাম্মদী দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকাতে কাজ করতেন। এই বর্তমান পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতার নারকেল ডাঙ্গার ষষ্ঠিতলা লেনে আশ্রয় নিয়ে বাংলা দলিত সাহিত্য এবং অদলিত সাহিত্যকে অকৃত্রিম সেবা করেছেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবেই আমরা অদ্বৈত এর বিখ্যাত সমস্ত সাহিত্যিক সৃষ্টিগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছি। তার সর্বাধিক খ্যাতি তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের জন্য। এছাড়া কবিতা প্রবন্ধ অনুবাদ ছোট সমস্ত ক্ষেত্রেই তার খ্যাতি ছিল অসামান্য।

অদ্বৈতের লেখাতে বাংলার পল্লীগীতি ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিশেষত ভারত বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস কেও তুলে ধরেছেন।[৮৫] অদ্বৈত এর আর্থিক পুঁজি নগণ্য এতদ সত্বেও তার নিজস্ব জীবনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহে ছিল সেগুলিকে জনগণের ব্যবহারের জন্য তাঁর মৃত্যুর

পরে তার সহকর্মী সাগরময় ঘোষ প্রেমেন্দ্র মিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমথনাথ বিশ্রী সুবোধ চৌধুরী প্রমূখদের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২৬ শে এপ্রিল অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মরণ সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রন্থ গুলি কলকাতার রামমোহন লাইবেরিকে দান করেছিলেন।[৮৬] অদ্বৈত এর তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস কে কেন্দ্র করেই বাংলাভাষী মানুষজন পেয়েছেন উৎপল দত্তের নাটক এবং ঋত্বিক কুমার ঘটকের যা আমাদের মুগ্ধ করেছে দলিত মালদের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের ইতিহাস। সমাজের ব্রাত্য মানুষদের ইতিহাস তুলে ধরেছেন শ্রীঅদ্বৈত মল্লবর্মণ। তা সত্ত্বেও অদ্বৈত বর্তমান পশ্চিম বাংলাতে তিনি অপ্রাসঙ্গিক রয়েছেন কিন্তু পাশের বাংলাভাষী প্রদেশ ত্রিপুরা তাকে অনেকটা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যেমন বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে ত্রিপুরা সরকার ১৯৯৬ সালে তার বিরাশি তম জন্মদিন স্মরণে কেমতলীতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র ও পাঠাগার নির্মাণ করেছেন। ত্রিপুরা সরকার ১৯৯৭ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের সূচনা ও করেছিলেন যা আজও সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার ও প্রধান শুরু করেছে।[৮৭] এমনকি অদ্বৈত মল্লবর্মণ কে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ত্রিপুরাতে উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।[৮৮] অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গতে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে জৎ সামান্য সম্মান দিয়েছে বা দেয়নি বললেই চলে। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার অত্যন্ত গ্রামে অদ্বৈত পাঠাগার তৈরি করা হয়েছে। যদিও সেটি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল কালচারাল ও সোসাইটি এবং মালো জাতির নিজস্ব উদ্যোগে। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন অবদান নেই।[৮৯]

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি, যে ইংরেজ জাতি এই ভারতবর্ষ তথা বাংলা কে দুশো বছর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সার্বিক দিক থেকে শাসন এবং শোষণ করেছে। সংস্কৃতি সেই সব ইংরেজ শাসক, গভর্নর, গভর্নর জেনারেলদের নামে বিভিন্ন গ্রন্থাগার স্থাপত্য রাস্তার নাম দেখতে পাই। যেমন অক্টারলোনি মনুমেন্ট, নিউ রোড, হেস্টিং রোডস ইত্যাদি। অথচ অদ্বৈত মল্লবর্মণের নামে একটি ও রাস্তার নাম তৈরি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি (১৯৬৯), অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল ও কালচারাল সোসাইটি এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা বারবার সরকারের কাছে দরবার করেছে ষষ্ঠী তলা লেনের নাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ এর নামে অভিহিত করার জন্য কিন্তু কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।[৯০]

বর্তমান গবেষণার প্রধান প্রশ্ন হল কিন্তু কেন এই বঞ্চনা উপেক্ষা অপ্রাসঙ্গিকতা? উত্তর দুটি কারণে অদ্বৈত মল্লবর্মণ অপ্রাসঙ্গিক। এবং প্রথমত সামাজিক কারণে। ভারত তথা বাংলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে সমাজের চতুর্থ বর্ণে জন্মগ্রহণকারী সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিভা সম্পন্ন হলেও তারা আমাদের কাছে ব্রাত্য হয়ে থাকে বা ব্রাত্য রাখা হয় সমাজে। তার মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও একজন দলিত ব্রাত্য চতুর্থ বর্ণের মানুষ ছিলেন এবং অপ্রাসঙ্গিক? যদিও বর্তমান সাহিত্য সমাজবিজ্ঞানের এবং ইতিহাসের গবেষণায় তলা থেকে ইতিহাস রচনা বা গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি চর্চার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত এই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জাতিগত বর্ণগত সম্প্রদায়গত সংখ্যা দক্ষ জনগোষ্ঠীকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালো

সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আর বাংলাতে এই মালদের জনসংখ্যা মাত্র তিন লক্ষ ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী। তাই তিনি অপ্রাসঙ্গিক। অপর পক্ষে বাংলাতেই অন্যান্য তপশিলি দলিত জাতিগুলি পৌন্ড্র নমঃশূদ্র রাজবংশী তারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে।

৫.৯.পর্যবেক্ষন: বাংলা দলিত সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার লিখিত সাহিত্যিক ফসল গুলিতে অবিভক্ত বাংলার নিম্নবর্ণীয় ও নিম্নবর্গীয় দলিত সমাজের মানুষজনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ইতিহাস কে তুলে ধরেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন সাহিত্য রচনা করেননি। যা সাধারণত ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়। সেই জন্যই দেবীপ্রসাদ ঘোষ অদ্বৈত মল্লবর্মণ কে নিয়ে লিখতে গিয়ে তার বইয়ের শিরোনাম দিয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ: একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত।[৯১] তার সব ধরনের লেখাতে রয়েছে ইতিহাসের মতো বাস্‌তব সত্য ঘটনা। যেমন আলোচ্য অংশে দলিত-মালো সমাজের ইতিহাস কে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের নিম্নবর্ণীয় সামাজিক অবস্থান অর্থনৈতিক দারিদ্রতা সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার ইতিহাস কে আলোচনা করা হয়েছে। মালোদের অর্থনৈতিক ইতিহাস কে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে মহাজন বা জমিদার এবং মাছের ব্যবসায়ীদের কাছে তারা কারারুদ্ধ ছিল।[৯২] অদ্বৈত তার লেখাতে শুধুমাত্র দলিত মালোদের জীবন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন তা নয়। নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের নিদারুণ জীবন যন্ত্রণার ইতিহাসকেও তার রচনায় স্থান দিয়েছেন। অদ্বৈত ছিলেন ব্রাত্যজীবনের ব্রাত্য লেখক। এছাড়া তিনি দলিত নিম্নবর্ণীয় এবং

নিম্নবর্গীয়দের জীবন বোধের চেতনার ইতিহাসকেও আলোচনা করেছেন। বহু ক্ষেত্রে দলিত সমাজের হয়েও উচ্চ বর্ণী এদের প্রশ্নের প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। অদ্বৈত এর লিখিত রচনার মধ্যে শুধু স্থানীয় মালোদের ইতিহাস রচিত হয়নি, তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। যেমন তার ভারতের চিঠি পাল বাক্যে গ্রন্থটিতে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর কাহিনী তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রধান চার্চিলের ব্যঙ্গক্তি সমস্ত কিছু রয়েছে।[৭৩]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র',* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০), পৃ. VIII।

২. রূপ কুমার বর্মণ: *'হ্যাঁ নিম্নবর্গীয়রা লিখতে পারে',* (বাংলা জর্নাল, খণ্ড-২১, ১৪২২), পৃ. ৫৭।

৩. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. VIII।

৪. নন্দলাল ভট্টাচার্য: *'জ্ঞান তাপস রাধাকৃষ্ণন',* (কলকাতা, গ্রন্থতীর্থ, ২০০৩), পৃ. ২০।

৫. তপোধীর ভট্টাচার্য: *'অদ্বৈতমল্লবর্মণ',* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ২০০০),পৃ ১৫।

৬. *তদেব,* পৃ. ১।

৭. মনোহর বিশ্বাস: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ: অতীতের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা খুঁজে',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৪, ডিসেম্বর), পৃ. ৪২।

৮. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১।

৯. *তদেব,* পৃ. ১।

১০. *তদেব,* পৃ. ২।

১১. *তদেব,* পৃ. ২।

১২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *'তিতাস একটি নদীর নাম',* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং,২০১৩), প্রচ্ছদপট।

১৩. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩।

১৪. *তদেব,* পৃ. ৫।

১৫. মনোহর বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২।

১৬. *তদেব,* পৃ. ৪২।

১৭. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮।

১৮. মনোহর বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৩।

১৯. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ৭-৮।

২০. দলিত সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক: (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৪),পৃ. ১২৩।

২১. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯।

২২. *তদেব,* পৃ. ২।

২৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *'তিতাস একটি নদীর নাম',* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩), পৃ. ৬।

২৪. দেবাশিস মণ্ডল: *'অবতলজনের স্বতন্ত্র স্বর',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৫), পৃ. ৫৬।

২৫. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫।

২৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র',* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০), পৃ. ৪৫৩।

২৭. দেবাশিষ মণ্ডল: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৯।

২৮. *তদেব,* পৃ. ৬০।

২৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৫৩।

৩০. *তদেব,* পৃ. পৃ. ৪৫৩-৪৫৪।

৩১. *তদেব,* পৃ. ৮৭।

৩২. *তদেব,* পৃ. ৮৭ ।

৩৩. *তদেব,* পৃ. ৮৮।

৩৪. *তদেব,* পৃ. ৮৮।

৩৫. *তদেব,* পৃ. ৮৮।

৩৬. *তদেব,* পৃ. ৮৮।

৩৭. রূপ কুমার বর্মণ: *'হ্যা নিম্ন বর্ণীয়রা লিখতে পারে',* (বাংলা জর্নাল, খণ্ড-২১, ১৪২২),পৃ ৫২।

৩৮. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৩৯. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *'আশালতার মৃত্যু',* প্রথম প্রকাশ, একাল শারদীয়া ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ,ভাসমান-১০, কলকাতা, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. পৃ. ১-৮।

৪০. *তদেব,* পৃ. ৪।

৪১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৯।

৪২. *তদেব,* পৃ. ৯৯।

৪৩. *তদেব,* পৃ. ১০০।

৪৪. *তদেব,* পৃ. ১৩৪।

৪৫. দেবী চ্যাটার্জী: *'মানবাধিকার ও দলিত',* (ভাষান্তর সন্তোষ রানা), (কলকাতা, ক্যাম্প,২০১৪), পৃ. ১২৬।

৪৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২৬।

৪৭. *তদেব,* পৃ. ১২৬।

৪৮. *তদেব,* পৃ. ১২৬।

৪৯. *তদেব,* পৃ. ১২৬।

৫০. মনোহর বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।

৫১. *তদেব,* পৃ. ৩৯।

৫২. রূপ কুমার বর্মণ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৮।

৫৩. মনোহর বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।

৫৪. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫০।

৫৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৬৫।

৫৬. ড.প্রদ্যোত কুমার মাইতি: *'ইতিহাস পরিক্রমা',* (পশ্চিম মেদিনীপুর, মাইতি পাবলিকেশন, ২০১১), পৃ. ১৯।

৫৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *'তিতাস একটি নদীর নাম',* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩), পৃ. ২০।

৫৮. *তদেব,* পৃ. ১২৬।

৫৯. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৪২-১৪৩।

৬০. *তদেব,* পৃ. ১৪৮।

৬১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭৪।

৬২. অচিন্ত বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৬৩. *তদেব,* পৃ. ২০।

৬৪. অচিন্ত বিশ্বাস (সম্পা): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৬৫. *তদেব,* পৃ. ৩৪।

৬৬. *তদেব,* পৃ. ১০০।

৬৭. *তদেব,* পৃ. ১৩৪।

৬৮. মনোহরমৌলি বিশ্বাস: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ, অতীতের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা খুঁজে',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৪) পৃ. ৩৯।

৬৯. *তদেব,* পৃ. ৩৯।

৭০. রূপ কুমার বর্মণ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৮।

৭১. মনোহরমৌলি বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯।

৭২. তপোধীর ভট্টাচার্য: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ',*(ককাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ২০০০), পৃ. ৫০।

৭৩. অচিন্ত বিশ্বাস (সম্পা): *তদেব,* পৃ. ৫৬৫।

৭৪. অদ্বৈত মল্লবর্মণ: *'আশালতার মৃত্যু',* পুনর্মূদ্রন ভাসমান-১০, (কলকাতা, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, ২০০৩), পৃ.পৃ. ১-৮।

৭৫. *তদেব,* পৃ. ৪।

৭৬. দেবাশিস মণ্ডল: *'অবতল জনের স্বতন্ত্র স্বর',* (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০১৫), পৃ. ৫৮।

৭৭. রূপ কুমার বর্মণ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭।

৭৮. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯।

৭৯. দেবাশিস মণ্ডল: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬০।

৮০. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪।

৮১. দেবাশিস মণ্ডল: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭।

৮২. রূপ কুমার বর্মণ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৭।

৮৩. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২।

৮৪. বিমল চক্রবর্তী: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার',* (আগরতলা, অক্ষর পাবলিকেশন, ২০১২), পৃ. ২০।

৮৫. রূপ কুমার বর্মণ: *'সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ',* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২), পৃ. ১১২।

৮৬. তপোধীর ভট্টাচার্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১।

৮৭. বিমল চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৪।

৮৮. রূপ কুমার বর্মণ: *'সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ',* পৃ.পৃ. ১১২-১১৩।

৮৯. রূপ কুমার বর্মণ: *তদেব,* পৃ. ১১৩।

৯০. রূপ কুমার বর্মণ: *তদেব,* পৃ. ১১৩।

৯১. বিমল চক্রবর্তী: ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯২. সান্তনু কায়সার: *'নদী ও মানুষের যুগলবন্দী',* অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৪) পৃ. ৬৬।

৯৩. বিমল চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫১।

উপসংহার

(CONCLUSION)

বর্তমান গবেষণা পত্রের জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক এবং সহায়ক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলিকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষক নিজস্ব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল। বর্তমান গবেষণা পত্রটির প্রধান বিষয়বস্তু হল অবিভক্ত বাংলার তিনজন দলিত ব্যক্তিত্বের উপর তুলনা মূলক রচিত। দলিত শব্দটি আধুনিক মারাঠি শব্দ। বর্তমান গবেষণাপত্র থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাত ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি এবং বিস্তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই প্রথা প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত একটি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ফলে ভারতীয় সমাজ বহুধা বিভক্ত সমাজে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ শাসনাধীনে যখন ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনার সূচনা হল তখন থেকে আবার জাতি পরিচিতি নির্মাণও শুরু হয়েছিল। যেটা বৈদিক সমাজে চতুর্থ বর্ণ বা শূদ্র হিসেবে বর্ণিত তাদেরই বৃহৎ অংশ আধুনিক ভারতে SC, ST, OBC হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এবং আম্বেদকরের চেতনায় তাঁরা দলিত হিসাবে পরিচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলাতে আমরা ৭৬ টি তপশিলি জাতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এবং তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাতি সম্পর্কে অবিভক্ত বাংলায় তাদের জেলা ভিত্তিক বাসস্থান, জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে সমক্য ধারনা অর্জন করতে পেরেছি।

এছাড়া সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কখন থেকে কিভাবে দলিত জাতি সমুহের আত্মচেতনাবোধ জাগরিত হয়ে ওঠে সে সম্পর্কেও বিশদে জানতে পেরেছি। জেমস মিল তার *'হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'* গ্রন্থে বারংবার আলোচনা করেছেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, যুক্তি, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা ছাড়া ভারতীয়রা আধুনিক হয়ে উঠতে পারবে না। তাই অষ্টাদশ শতকে ইংরেজরা যখন ভারত বিজয় করল তারপর থেকেই তারা ভারতীয় সমাজকে পাশ্চাত্যকরণ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এবং তার প্রধান অস্ত্র হিসাবে তারা এদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারকে প্রাধান্য দিয়েছিল। যদিও ওই শিক্ষা আধুনিক ভারতে প্রথমদিকে উচ্চবর্ণীয় সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ শাসনের একশ বছর পরে নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তিবর্গও আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এবং শিক্ষা বিস্তারেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেমন জ্যোতিবা ফুল, সাবিত্রীবাঈ ফুলে, ই. ভি. রামস্বামী পেরিয়ার, বি. আর. আম্বেদকর, শ্রীনারায়ণ গুরু প্রমূখ নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তিবর্গগণ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নিম্নবর্ণীয় দলিত জাতি সমূহকে শিক্ষার মাধ্যমে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা নিম্নবর্ণীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অধিকার গুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়েছিলেন। যা বর্তমান গবেষণা পত্রের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

অবিভক্ত ঔপনিবেশিক বাংলায় নিম্নবর্ণীয় দলিত সমাজের ব্যক্তিবর্গও আলোচ্য সময়ে পিছিয়ে থাকেনি। বাংলার দলিত চেতনায় নমঃশূদ্রদের হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, পৌণ্ড্রদের বেনীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ রাজবংশীদের পঞ্চানন বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ

প্রমুখরাও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। দলিত জাতি গুলির কিছু শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য রচনা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পর্কে জাগরিত করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। যেমন আলোচ্য গবেষণাপত্রে পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণের জনক মহাত্মা রাইচরণ সরদার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

রাইচরণ সরদারের সমকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই জটিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিভেদ প্রথা সমগ্র বাংলায় স্বীকৃত সামাজিক প্রথা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। মহাত্মা রাইচরণ সরদারকে ছাত্রাবস্থা থেকে ওই প্রথার দ্বারা শিকার হতে হয়েছিল এবং ওই প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল যা আমরা আলোচ্য গবেষণা পত্রে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। তিনি জাত ব্যবস্থার শিকার হয়ে সরকারি চাকরি থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চেতনায় আচ্ছন্ন পৌণ্ড্র জাতিকে শিক্ষার আলো দেখাতে রাইচরণ ছিল সর্বদা সচেষ্ট। তিনি তাঁর জীবতকালে অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করার জন্য সমাজের কাছ থেকেও অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজে ছাত্র অবস্থায় যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেইগুলো যাতে তার পরবর্তী প্রজন্মকে বাধা পেতে না হয় সেই ব্যবস্থাও করেছিলেন। যেমন রাইচরণ ছাত্রজীবনে কলকাতায় হোস্টেল পেতেন না। তার কারণ তিনি নিম্নবর্ণীয় পৌণ্ড্র সম্প্রদায় ভুক্ত। তাই রাইচরণ নিজে চেষ্টায় হোস্টেলও তৈরি করেছিলেন। এছাড়া রাইচরণ পৌণ্ড্র সমাজ গঠনেও হাত

লাগিয়েছিলেন। তিনি একাধিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পত্রপত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। পৌণ্ড্র সমাজকে জাগরিত করতে রাইচরণ পূর্বসূরী হিসাবে পেয়েছিলেন বেণীমাধব হালদার এবং শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণকে। এছাড়া উত্তরসূরী হিসেবে পেয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ করণকে। যা আমার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছি। মহাত্মা রাইচরণ সমাজ সংস্কারেও ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। তিনি পৌণ্ড্র জাতির শুদ্রত্বমোচন করে ক্ষত্রিত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন আলোচ্য গবেষণায় বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ঐ সংস্কারের কাজ সূচনা করেছিলেন বেণীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ প্রমূখ। কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন রাইচরণ সরদার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাইচরণ কে পৌণ্ড্র জাগরণের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

এছাড়া রাইচরণ সরদার রচিত দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমস্যা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র আর্য পৌণ্ড্র প্রভৃতি গ্রন্থ গুলির সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। পৌণ্ড্র জাতির ইতিহাস রচনায় ওই গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তা বর্তমান গবেষণায় স্থান পেয়েছে। এতদসত্বেও রাইচরণ সরদার তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা এবং বর্তমান পশ্চিম বাংলাতে ও যোগ্য সম্মান পায়নি। তার কারণ হিসেবে মনে করা হয় তিনি ছিলেন অস্পৃশ্য শুদ্র। এমনকি তার পৌণ্ড্র জাতির কাছ থেকেও সঠিক মর্যাদা পায়নি। যদিও তার কারণ পৌণ্ড্র জাতির শিক্ষার অভাব। রাইচরণ নিজেকে বাংলার প্রথম দলিত সাহিত্যিক হিসেবেও তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে সম্পর্কে এই গবেষণায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা রয়েছে। পৌণ্ড্র

সমাজের প্রথম উচ্চ শিক্ষিত গ্রাজুয়েট ব্যক্তি হিসেবে জাতির প্রতি রাইচরণ তার কর্তব্য পালন করেছেন। যেমন শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, সমাজ গঠন সবকিছুতেই অবদান রেখেছেন।

বর্তমান গবেষণাপত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল বর্ণময় আবার ধূসর। অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের নিম্নবর্ণীয় দলিত জনগনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এতসত্বেও তাঁর জীবনে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলও ছোটবেলায় ভারতীয় জাত ব্যবস্থার দ্বারা একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছিলেন যা বর্তমান গবেষণায় অসংখ্য তথ্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত বিবিধ স্থানেও তিনি জাত ব্যবস্থার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য বিনা অর্থেই আইনি সমস্যার সমাধান করতেন। সাধারণ মানুষের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা এবং কৃষিজীবীদের জন্য কৃষির উন্নতিতে অভূতপূর্ব সাহায্য করতেন। ওই সমস্ত কার্যকলাপকে বেশি সংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয়েছিল তাঁকে। এবং মানুষের প্রয়োজনীয় দাবী গুলোকে সরকারের কাছে তুলে ধরতে সমর্থ্য হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণীয় রাজনৈতিক দলগুলি আম্বেদকরের মত আইনজ্ঞকে সংবিধান সভায় পাঠাতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল নিম্নবর্ণীয় সাধারন মানুষের কথা ভেবে আম্বেদকরকে বাংলা থেকে সংবিধান সভায় নির্বাচন করেছিলেন। তিনি কিন্তু নিজে যেতে পারতেন সংবিধান সভায়। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তা করেননি। এই সমস্ত

গুণাবলির জন্যই তাঁকে মহাপ্রাণ অভিধাতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতসত্বেও যোগেন্দ্রনাথকে আজীবন উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ শুনতে হচ্ছে বঙ্গভঙ্গের জন্য তিনিই দায়ী। উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস দল এবং উচ্চবর্গীয় মুসলিম লীগ তারা ক্ষমতা লাভে উৎসুক ছিলেন। যে কারণেই বাংলাকে বিভক্ত হতে হয়েছিল। অথচ সেই দায় সুকৌশলে তারা যোগেন্দ্রনাথের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তার বদনাম করার চেষ্টা করছে। যদিও এই ঐতিহাসিক বির্তকের অবসান সম্ভব নয়। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন দলিতদের জন্য নিবেদিত প্রান যা গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া আমার গবেষণাপত্রে মালো সমাজের দলিত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর অসংখ্য লেখার মধ্যে ভারতীয় জাত ব্যবস্থার দ্বারা সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ওই জাত ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আদেশও তিনি দিয়েছেন। অদ্বৈত তার লেখাতে শুধুমাত্র দলিত মালোদের জীবন ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন তা নয়। নিম্নবর্গীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের নিদারুণ জীবন যন্ত্রণার ইতিহাসকেও তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছেন। অদ্বৈত ছিলেন ব্রাত্যজীবনের ব্রাত্য লেখক। এছাড়া তিনি দলিত নিম্নবর্ণীয় এবং নিম্নবর্গীয়দের জীবন বোধের চেতনার ইতিহাসকেও আলোচনা করেছেন। বহু ক্ষেত্রে দলিত সমাজের হয়েও উচ্চবর্ণীয়দের প্রশ্নের প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। অদ্বৈতের লিখিত রচনার মধ্যে শুধু স্থানীয় মালোদের ইতিহাস রচিত হয়নি, তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

যেমন তাঁর ভারতের চিঠি পাল বাক্ গ্রন্থটিতে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর কাহিনী তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রধান চার্চিলের ব্যঙ্গক্তি সমস্ত কিছু রয়েছে। এতদসত্বেও অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রধান বাংলা ভাষী রাজ্য হিসাবে পশ্চিম বাংলাতে তিনি অপ্রাসঙ্গিক। অপর পক্ষে ভোট ব্যাঙ্কে সংখ্যাধিক্য পৌণ্ড্র, রাজবংশী, নমঃশূদ্রদের বিভিন্ন মনীষীগন প্রাধান্য পেয়েছে এই রাজ্যে। যেমন হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পঞ্চানন বর্মা, সাধু রামচাঁদ মুর্মু প্রমুখের নামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আমরাও আশাবাদী ভবিষ্যতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের নামেও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে অদ্বৈতের নামে পুরষ্কার প্রদানের কথা কি ভাবতে পারেনা?

তুলনা মূলক আলোচনার মাধম্যে বর্তমান গবেষণাপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পৌন্ড্র সমাজের রাইচরণ সরদার ছিলেন পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট একজন আইনজীবী এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বিবিধ সংস্কার মূলক কাজের মাধ্যমে তার সমাজকে জাগরিত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং নমঃশূদ্র সমাজের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। তিনি সর্বদা নিম্নবর্ণীয় দলিতদের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। এবং নিম্নবর্ণীয়দের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বি. আর. আম্বেদকরকে সংবিধান সভাতে পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে দলিত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন নিম্নবর্ণীয় মালো সমাজের। তিনি

প্রাচীন ভারত থেকে প্রচলিত জাত ব্যবস্থা কিভাবে আধুনিক ভারতীয় সামাজিক অবস্থাকে কলুষিত করেছিল তা তিনি তাঁর বিবিধ রচনায় সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানতে পারছি যে তিনটি সম্প্রদায়ের তিনজন ব্যক্তি তিনটি ক্ষেত্রের সাহায্যে তাদের সমাজকে জাগরিত করছে এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার দিশা দেখাচ্ছে।

সংযোজনী (Addition)

সংযোজনী: ১. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের জীবন পঞ্জিকা

১৮৭৬: ১৫ই মার্চ ১৮৭৬ বুধবার ২৪ পরগনার বন সুন্দরিয়া গ্রামের এক কৃষিজীবি পৌন্ড্র পরিবারে জন্ম।

১৮৮১: পাঠশালায় নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার শুরু।

১৮৮৪: রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুরু।

১৮৮৮: 'বোধদয়' গ্রন্থ পাঠ। পাঠশালার ছাত্রদের পড়ানো শুরু। মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ভর্তি।

১৮৮৯: আট বছরের এক কন্যাকে (বিলাসী)বিয়ে।

১৮৯১: এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে ধামুয়াতে ওই ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা। তবুও ব্রাহ্মণদের জাতিবিদ্বেষ এর শিকার। মধ্য ইংরাজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯২: বোড়ালের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ভর্তি ও সেখানকার এক ব্রাহ্মণের ছেলেদের পড়িয়ে ওই ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। স্কুলে ছাত্রদের জাতিবিদ্বেষ মূলক মনোভাবের উপলব্ধি।

১৮৯৩: ব্রাহ্মণের দুর্ব্যবহারে অসম্মানিত অথচ কায়স্থের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করবেন না তাই গৃহে প্রত্যাবর্তন। হরিনাভির অ্যাংলো সংস্কৃত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি ও এক ব্রাহ্মণ এর ছেলে কে পড়ানোর বিনিময়ে ওই ব্রাহ্মনের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ লাভ।

১৮৯৫: এন্টান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ও এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় আর্য মিশন ইনস্টিটিউটে এফ. এ. (F. A.) ক্লাসে ভর্তি। কিছুদিন পর মাতৃবিয়োগ।

১৮৯৭: এফ. এ. পাস ও বনসুন্দরিয়ার জমিদার তারণ কৃষ্ণ দেবের সহায়তায় কলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে বি. এ. (B. A.) ক্লাসে ভর্তি হন।

১৯০০: বি. এ. (B. A.) পাস।

১৯০১: জ্যৈষ্ঠ পুত্রের জন্ম। মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে রোডসেস বিভাগে কলকাতায় সরকারি চাকুরী লাভ ও ভবানীপুরে রামতারণ নস্করের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ। বঙ্গবাসী কলেজে বি. এল. (B. L.) ক্লাসে ভর্তি ও নতুন বাসা খুঁজতে গিয়ে আবার জাতি বিদ্বেষের শিকার। ভবসিন্ধু লস্করের সঙ্গে পরিচয়।

১৯০২: মনিন্দ্রনাথ মন্ডলের সঙ্গে পরিচয়। কবিবর শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ এর সঙ্গে পরিচয়। চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত। এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে গিয়ে রেলওয়ে এক ব্রাহ্মণ বড়বাবুর নিকট একটি চাকুরি প্রার্থনা করায় জাতি বিদ্বেষের শিকার ও অসম্মানিত।

১৯০৩: ত্রিপুরায় রাধা কিশোর হাই ইংলিশ স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার পদে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে যোগদান। মগজাতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা।

১৯০৪: হেডমাস্টার পদে উন্নীত ও সরকারি স্কুলের শিক্ষকতার ইচ্ছা প্রকাশ।

১৯০৫: গৃহে প্রত্যাবর্তন ও পৌন্ড্র সমাজের ও ধাড়াই ব্রাহ্মণ সম্পর্কে অনুসন্ধান। চট্টগ্রামের রামগতি রামধন ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষকতায় নিযুক্তি ও মগ ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ।

১৯০৬: পিতৃবিয়োগ। বি. এল. (B. L.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯০৭: প্রধান শিক্ষকতার চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ ও চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন। ডায়মন্ড হারবারের মুন্সেপ আদালতের বারে যোগদান ও বেণীমাধব হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সমাজ সংস্কারে ব্রতী।

১৯০৮: ডায়মন্ড হারবার মহকুমার লোকাল বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত।

১৯০৯: 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি' গঠন ও তার সভাপতি পদ গ্রহন। সপরিবারে ডায়মন্ড হারবারে বসবাস। শিক্ষা বিস্তারে বাল্যবিবাহ রোধ ও কুসংস্কার ত্যাগে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

১৯১০: মন্দির বাজার হাইস্কুলে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতির' অধিবেশনে শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান। 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব' নামক জাতীয় পত্রিকা প্রকাশে সহ-সম্পাদনার ভার গ্রহণ।

১৯১১: 'জাতি বিবেক' গ্রন্থটির সারমর্মের ইংরেজি অনুবাদ করে ও তা মুদ্রিত করে সেন্সাস অধিকর্তাকে প্রদান।

১৯১২: 'সর্ব বঙ্গ হিন্দু শিক্ষা' সম্মেলনের সভায় যোগদান ও মহেন্দ্রনাথ করনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯১৫: মহেন্দ্রনাথ করনকে পত্র প্রেরণ করে ইংরেজি ভাষায় তার জাতীয় ইতিহাস রচনার অগ্রগতির খবরাখবর অনুসন্ধান।

১৯১৭: কোটালপুরে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতির' বিশেষ অধিবেশনে মেদিনীপুর থেকে আগত মহেন্দ্রনাথ করনের সঙ্গে এবং খুলনা থেকে আগত মাদারচন্দ্র রায়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের পাঠানো খুলনার পৌন্ড্রদের সম্পর্কে অবহিত।

১৯১৮: ইংরাজিতে মহেন্দ্রনাথ করনের লেখা পৌন্ড্রদের জাতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থটির প্রকাশের জন্য পান্ডুলিপিটি কুন্তলীন প্রেস এ গিয়ে প্রধান ও মুদ্রণ ব্যয় সংকুলানের জন্য ভিক্ষা গ্রহণের উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত।

১৯১৯: 'A short history and ethnology of the cultivating pods' নামক মহেন্দ্রনাথ করনের লেখাজাতীয় ইতিহাস গ্রন্থটির প্রকাশ। কলকাতায় 'আর্য পৌঁন্ড্রক ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা। খুলনার কিশোর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শদান।

১৯২০: স্মৃতিকণ্ঠ নস্করের মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপস্থিত ব্যক্তি বর্গকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা দান।

১৯২১: পৌন্ড্র জাতি যে মূলত মৎস্যজীবী নয় তা প্রমাণের জন্য মহেন্দ্রনাথ করণের সঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্যানুসন্ধান।

১৯২২: কবিবর শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ এর জ্যৈষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ।

১৯২৩: সাধারণ যাত্রীদের উপর খায়েরদের বহুদিন থেকে চালানো অত্যাচার দমন। সমাজ পিতা বেণীমাধব হালদারের মৃত্যু।

১৯২৪: পাবনার সিরাজগঞ্জে 'হিন্দু মহাসভার' অধিবেশনের যোগদান।

১৯২৫: জগদীশপুরে স্কুল নির্মাণ ব্যাপারে স্মৃতিকণ্ঠ বাবুর সঙ্গে আলোচনা।

১৯২৬: লন্ডন মিশনারি কলেজে পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশনে পৌন্ড্রদের দ্বাদশহ অশৌচ পালন ও উপনয়ন সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান।

১৯২৭: জগদীশপুর বিদ্যালয় এর সেক্রেটারি পথ গ্রহণ। কল্যানপুরে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ সমিতির সভায় উপস্থিত হয়ে পৌন্ড্রদের প্রস্তাবিত ব্রাত্যস্টোম যজ্ঞ সংক্রান্ত কাজে ব্রাহ্মণদের সহযোগিতা প্রার্থনা।

১৯২৮: দিগিন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্যের সহায়তায় ব্রাত্যস্টোম যজ্ঞ ও হরিনাম সংকীর্তনের পর আরো কয়েকজন সহ রায়চরণ বাবুর উপবিত গ্রহণ।

১৯২৯: ভবসিন্ধু লস্করের সীতাকুণ্ডের বাড়িতে পৌন্ড্রদের উপনয়ন উপলক্ষে হাজির ও পুরোহিত হরিপদ কবিভূষণের সাথে সাক্ষাৎ। এই সভায় দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকে সভাপতি করায় উপস্থিত তিলক ব্রাহ্মণদের সভাস্থল ত্যাগ।

১৯৩০: পরবর্তী১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পৌন্ড্রজাতির নাম পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করানোর জন্য ভবসিন্ধু লস্কর ও অন্নদা প্রসাদ লস্করকে নিয়ে সেন্সাস সুপারিন্ডের সঙ্গে অগ্রিম সাক্ষাৎ।

১৯৩১: এ বছরের সেন্সাস রিপোর্টে ডিপ্রেস্ট ক্লাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ডিপ্রেসড ক্লাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান।

১৯৩২: খুলনার ভীমচন্দ্র রায়ের বাড়িতে দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত বিশাল পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সম্মেলনে ২৪ পরগনা ও হাওড়া থেকে কয়েকজন প্রতিনিধির সাথে রায়চরণ বাবুর যোগদান। পৌন্ড্রদের উপনয়ন গ্রহণ করানোর ব্যাপারে রাইচরণ বাবুর ব্যর্থ প্রয়াস।

১৯৩৩: বি. আর. আম্বেদকরের দাবি মেনে প্রস্তুত করা ডিপ্রেসড ক্লাসের তালিকায় পৌন্ড্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভবানীপুর সাউথ সুবারবান স্কুলে অনুষ্ঠিত পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশনে প্রতিবাদ জানিয়ে ডিপ্রেসড জাতিগুলোর ওই তালিকা থেকে এই জাতির নাম বাদ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংস্কার বিভাগের কমিশনারকে রাইচরণ বাবুর আবেদন পত্র প্রেরণ।

১৯৩৪: গোবিন্দপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের ব্যাপারে তদারকির জন্য প্রেসিডেন্স বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর জে এম সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩৫: তপশিলি জাতির তালিকায় পৌন্ড্র জাতির নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং পরে আলোচনার জন্য ভবসিন্ধু লস্করের বাড়িতে অনুষ্ঠিত 'সর্ব বঙ্গ পৌন্ড্র সমিতির' বিশেষ

অধিবেশনে এই জাতির নাম তপশীল জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য রাইচরণ বাবুর উত্থিত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ায় সংস্কার বিভাগের কমিশনার গিলক্রাইস্টকে রাইচরণ বাবুর আবেদনপত্র প্রেরণ ও পৌন্ড্র জাতির নাম তপশিল জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ জ্ঞাপন। রাইচরণ সরদারের পত্র প্রেরণ।

১৯৩৬: মগরাহাট হাই স্কুল প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভা ডেকে সেই সভায় নির্বাচন উপলক্ষে তপশিল সংরক্ষণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিবাদ জানান ও সংরক্ষিত আসনের প্রতিদ্বন্দ্বি পৌন্ড্রদের কাউকে কোন ভোট প্রদান না করার অনুরোধ জানান।

১৯৩৭: পৌন্ড্র জাতির পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় নামক রাজানুমদনের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নিকুঞ্জ বিহারী মাইতির মাধ্যমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপদ পরিষদের দারস্ত হন।

১৯৩৮: জগদীশপুর এর বিদ্যালয়টি তপশিল সাহায্য গ্রহণ করায় ওই স্কুলের দীর্ঘদিনের সেক্রেটারি রাইচরণ বাবু প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদ জানিয়ে স্কুলের সেক্রেটারি পদত্যাগ করেন।

১৯৩৯: রাইচরণ বাবুর উদ্যোগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে পৌন্ড্র জাতির পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় নামের রাজানুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হলেও পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় নাম রাজানুমোদন লাভ করেনি। হোলি উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমস্যা প্রকাশ করেন।

১৯৪০: পৌন্ড্র জাতির আর্য ক্ষত্রিত্ব প্রমাণের জন্য গবেষণা শুরু। একটি জনসভা আহ্বান করে এই জাতির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিশেষত পৌন্ড্র জাতির নাম তপশিল তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বাংলা সরকারের গভর্নরের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ।

১৯৪১: 'শ্রীমনমহাপ্রভুর কৃপা পাত্র আর্যপৌন্ড্র' নামক পুস্তকটির প্রকাশ।

১৯৪২: পৌন্ড্র জাতির নাম তপশিল জাতির তালিকাভুক্ত করায় এই তপশিল অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য পৌন্ড্র জাতির কিছু নেতার বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্দেশ্যে একটি আর্জি প্রস্তুত করেন। কিন্তু আর্জটি আদালতে পেশ করার আগেই ২৪ শে জানুয়ারি শনিবার রাত আটটা তিরিশ মিনিট নাগাদ তিনি দেহত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্র: দিলীপ গায়েন সম্পাদিত: *মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌন্ড্রসমাজ,* পৌণ্ড্র মহাসংঘ, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ৫৯-৬৩।

সংযোজনী: ২. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের রচিত এবং সংকলিত পুস্তকের তালিকা

১	অষ্টোত্তরী শতমুখী	১৩	বাসুদেবের গান
২	কথামালার আলো	১৪	ব্রজবিলাস বন্দনা
৩	কিসে কেন কি চান	১৫	মোকদ্দমার কথা

৪	কৃষ্ণ কার্যনো বন্দনা	১৬	শ্রীপতি গীতা
৫	কৃষ্ণ কেন এলেন প্রভৃতি	১৭	শ্রীশ্রী রামলীলা স্তুতিমন্ত্র (সংক্ষিপ্ত রামায়ণ)
৬	ছাত্রবন্ধু গ্রন্থমালা	১৮	শ্রী শ্রী রাসলীলা সংকীর্তন
৭	দিনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা (চার খন্ড)	১৯	শ্রী শ্রী ব্যাসপূজা
৮	নবদ্বীপ বন্দনা	২০	শ্রী দশমুল সঞ্চয়ন
৯	নচিকেতার দান (কঠোপ নিষেত)	২১	শ্রীমনমহাপ্রভুর কৃপা পাত্র পুণ্ড(দুই খন্ড)
১০	পঞ্চতত্ত্বের প্রেম ও নতিস্তুতি	২২	স্তব সন্দর্ভ
১১	পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমস্যা	২৩	স্তোত্ররত্নের অনুকীর্তন
১২	বৈদিক সন্ধ্যায় বিশ্বের কল্যাণ	২৪	স্তব লহর

তথ্যসূত্র - মহাত্মা রাইচরণ সরদারের জ্যৈষ্ঠ পুত্র সনৎ কুমার বর্মন (সরদার) কর্তৃক প্রকাশিত *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা* গ্রন্থে প্রকাশিত পুস্তক তালিকা

সংযোজনী: ৩. রাইচরণ সরদারের উক্তি বা বাণী

“ভাবিয়া দেখিও অর্থের অভাব-অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। সমাজে অর্থের অভাব নাই, অভাব কেবল প্রবৃত্তির”।

“মনে রাখিও - ভিক্ষা, কাকুতি মিনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হতে পারেন কিন্তু মৎসর (হিংসুক) মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়”।

“মনে রাখিও - একতাই বল, সংঘশক্তি বল”।

“মনে রাখিও- কূটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, চলিতে হইবে। লুপ্ত গরীমা কি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে”।

"স্মরণ রাখিও - তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও- পালি প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, আরবি,পারসি, তামিল, তেলেগু,ওড়িয়া,গুজরাটি, কানারি, আসামি, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে”।

“মৎসর (হিংসুক) হস্তের বিকৃত বিবৃতিতে তোমার লেখনীর নির্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে”।

“স্মরণ রাখিও যুদ্ধ চলিয়া ছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্তকাল চলিবে”।

“স্মরণ রাখিও - শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না”।

তথ্যসূত্র- রাইচরণ সরদার: *দিনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা।*

সংযোজনী: ৪. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলনে উপবীত ধারণকারী ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানার তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	গ্রাম	পোষ্ট	থানা	জেলা
১	শ্রী রাইচরণ সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২	শ্রী সনৎ কুমার সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩	শ্রী শ্রীপতি কুমার সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪	শ্রী ভূপতিকুমার সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫	শ্রী মনোজ কুমার সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৬	শ্রী পরীক্ষিত সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৭	শ্রী মতিলাল নস্কর	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৮	শ্রী ক্ষেত্রমোহন সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৯	শ্রী পঞ্চানন সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

১০	শ্রী ভূধর চন্দ্র বৈদ্য	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১১	শ্রী ভূষণ চন্দ্র বৈদ্য	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১২	শ্রী রতন চন্দ্র বৈদ্য	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১৩	শ্রী চন্দ্র কুমার সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১৪	শ্রী মাখনলাল সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

১৫	শ্রীবিনোদ বিহারী সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১৬	শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১৭	শ্রী পরাণ কৃষ্ণ পাটোয়ারী	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১৮	শ্রী বরদা প্রসাদ পাটোয়ারী	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১৯	শ্রী সারদা প্রসাদ পাটোয়ারী	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২০	শ্রী শ্যামাপদ সরদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে

					দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২১	শ্রী দ্বিজ পদ বর্মণ	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২২	শ্রী নিমাই চরণ হালদার	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৩	শ্রী রমানাথ লস্কর	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৪	শ্রী মোহন চাঁদ লস্কর	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৫	শ্রী গৌরহরি লস্কর	বনসুন্দরিয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৬	শ্রী রাজকুমার মন্ডল	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৭	শ্রী শ্রীশচন্দ্র	জলধাপায়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৮	শ্রী চুণীলাল রায়	নারায়ণপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
২৯	শ্রী পশুপতি সরদার	নারায়ণপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩০	শ্রী কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস	নারায়ণপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩১	শ্রী রমানাথ রায়	নারায়ণপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে

					দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩২	শ্রী কুশময় তরফদার	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৩	শ্রী গোকুল চন্দ্র মন্ডল	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৪	শ্রী ভুবন চন্দ্র তরফদার	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৫	শ্রী নন্দলাল মণ্ডল	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৬	শ্রী গঙ্গাধর লস্কর	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৭	শ্রী নবকুমার তরফদার	জলধাপা	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৮	শ্রী ভূপতি কুমার লস্কর	জয়নগর	জয়নগর মজিলপুর	জয়নগর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৩৯	শ্রী পূর্ণ গোপাল সরদার	পাঁচগেছিয়া	গোচরণ	জয়নগর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪০	শ্রী গধাধর মহতা	কেশবপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪১	শ্রী রমানাথ মহতা	কেশবপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪২	শ্রী কমলাকান্ত মহতা	কেশবপুর	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে

					দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৩	শ্রী প্যারিমোহন মণ্ডল	মুল্টী	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৪	শ্রী অনুকূল চন্দ্র মণ্ডল	মুল্টী	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৫	শ্রী সীতানাথ হালদার	বীরেশ্বরপুর		কুল্পী	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৬	শ্রী প্রিয়নাথ বর্মণ	রামলোচনপুর	ঘাটেশ্বরা	কুল্পী	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৭	শ্রী নরেন্দ্রনাথ হালদার	মতিলাল	ঘাটেশ্বরা	মথুরাপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৮	শ্রী রেণুকা রঞ্জন রায়	জয়কৃষ্ণপুর	কাশীনগর	মথুরাপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৪৯	শ্রী নারায়ণ প্রসাদ বর্মণ	কালিকাপুর	মথুরাপুর	মথুরাপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫০	শ্রী বরদাপ্রসাদ বর্মণ	গোপালনগর	হটুগঞ্জ	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫১	শ্রী সুরেন্দ্রনাথ লস্কর	ঘনশ্যামপুর	মগরাহাট	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

৫২	শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র বর্মণ	ধামুয়া	মুল্টী	মগরাহাট	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫৩	শ্রী ননীগোপাল রায় সরদার	কাঠালবেড়িয়া	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫৪	শ্রী কালীচরণ সরদার	কাঠালবেড়িয়া	মুল্টী	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫৫	শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	গোপালপুর	রামনগর	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
৫৬	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	গোপালপুর	রামনগর	বারুইপুর	২৪ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

তথ্যসূত্র- রাইচরণ সরদার দীনের আত্মকাহিনী বা সত্যপরীক্ষা, (ক্যানিং, রাধারাণী প্রেস,১৯৫৯), সনৎ কুমার নস্কর (সম্পা): পৌণ্ড্র মনীষা, (সোনার, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ,২০১২),পৃ. পৃ. ৩৩৫-৩৩৯।

সংযোজনী: ৫. রাইচরণ সরদার কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে পাঠানো (০৪.০৩.১৯৩৫) চিঠি।

From

Raicharan Sardar B.L.

President All Bengal Poundra Kshatriya Association, Bengal

To,

Mahatma Gandhi.

Revered Sir,

I beg most humbly & respectfully to lay before you the following facts for favour of your kind perusal and intercession.

That Poundra Kshatriya (commonly known as Pod) Community of Bengal numbering about 7 lacs of souls is an important unit in the Hindu society of Bengal. From the annexed enclosures containing answers to the marks of the Scheduled Castes you will be pleased to see that this community cannot be marked as depressed and included in the list of the Scheduled castes .

As soon as the preliminary list of scheduled castes of Bengal including this community in it was published the All Bengal Poundra Kshatriya Association held it sitting on 28.1.33 and I as President thereof representing the voice of the whole community submitted a protest ant the secretary of this Association as directed by it officially prayed for submitting proper representation to Mr. Gilchrist Esq. C.I.E. I.E.C. Reforms Commissioner and Joint Secretary to the Government of Bengal, Appointment Department Reforms Branch, but unfortunately for this helpless community no opportunity for such deputation and representation was given.

At last this helpless community is surprised to see that it is included in the final list of Scheduled castes forwarded to me by the said Reforms commissioner with his office letter No. 106 A.R. dated 5th January, 1935 containing a copy of Bengal Government's Resolution No. 915 A.R. dated the 28th December, 1934 on the subject of the list of Scheduled Castes in Bengal.

Section 7 Regulation IV of 1809 enumerating low castes of Bengal excludes this community and the same thing is repeated in Regulation XI of 1810and you will be pleased to know the social manners and customs and the present states of this community from the enclosed enclosures.

On receiving the aforesaid final list and understanding that it has been forwarded to His Excellency the Vice-roy of India in council I as Presedent of the said Association representing the Voice of this community have submitted one petition to His Excellency the Viceroy of India in Council for favourable consideration of the protest and for favour of exclusion of this community from the list of Scheduled castes. Copies of the petition are enclosed herewith for your kind perusal

This helpless community looks upon you as its only savior in this crisis. Under the circumstances I representing the voice of the whole community most humbly and respectfully pray that you will be pleased to intercede and plead for its just cause and request His Excellency the Viceroy not to favour the record of untruth in respect of this community and thus save it from the social degradation and also from the so-called special political privileges which it does not want and never wanted.

I have the honour
to be
Sir
Your most obedient servant
(Sd) Raicharan Sardar.

তথ্যসূত্র: রাইচরণ সরদার: *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্যপরীক্ষা, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড,* (ক্যানিং, রাধারাণী প্রেস, ১৯৫৯), সনৎ কুমার নস্কর (সম্পা): পৌণ্ড্র মনীষা, (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২), পৃ.পৃ. ৩৯৮-৩৯৯।

সংযোজনী: ৬. রাইচরণ সরদার কর্তৃক আর.এন.গিলক্রাইষ্ট সাহেবকে পাঠানো (২৮.০১.১৯৩৩) চিঠি।

From:
Babu Raicharan Sardar B.L.
President, All Bengal Poundra-Kshatriya Association.

To
The Reforms Officer, Government of Bengal.
The humble petition of Undersigned, the President All Bengal Poundra-Kshatriya Association, registered under Act XXII of 1860.

Most respectful showeth:
1. That your petitioner is directed by the All Bengal Poundra Kshatriya Association to submit to you the fallowing grievances by the resolutions annexed herewith and which has been unanimously passed at its meeting held on 28.01.33. in the South Subarban School Premies. Calcutta.

2. That this community consting of about 7 lacs of souls commonly called "Pod" in the presidency and Burdwan divisions and "Pundari or Punro" in the Rajshahi division, submits to you its present grievences, in its enlistment among the Depressed Classes in the matter of election of members of the Legislative Council of the Government of Bengal, and that it has satisfactorily proved its kshatriya origin before the census authorities and has been trying to have itself recorded in the Census Reports as Poundra Kshatriya which however is not its present subject of grievance submitted to you.

3. That this community has among others 2 B.SC's of the Glasgo University one of whom is of Imperial Service and the other a minig engineer, about 80 graduates (M.As, B.As. B.Ls.) of the Calcutta University of whom 18 B.Ls. Pleaders, one is advocate, High Court, Calcutta, one Sub Deputy, 5M. Bs. One engineer from Benares University, About 30 L.M. Fs. 12 Muktiers, more than 50 Undergraduates, more than 400 Matrics, more than 50 Normal-Passed Pandits, more than 100 Gurutraining teachers and numerous other vernacular teachers, besides many others associated with some religious institutions such as Rama Krishna Mission, Hindu Mision, Goruiya Math and Navadwip Math.

4. That the Census Report shows that this community has been recorded as Pod-Poundra Kshatriya'.

5. That this community is far superior, in respect of education, to some of the Nabasayaks viz-Gope (Milkman), Maali (Dealers in flowers), Tili (Dealers in sesame mustard), Tanti (Weaver), Modaks (Confectioners), Baruji (Betal-dealers), Kulal (Potters/Karmokars (Blacksmiths) and Napits(Barbars) and many other castes who are not enlisted as depressed.

6. This superiority in its proportion of educated and religious men to some of the aforesaid Nabasayaks should beregarded as the basis of its enlistment it the general body of electors.

7. That this community has free access the Hindu temples of Gods and Goddesses and has the privilege to prepare sweetmeat used as offerings to Gods and Goddesses in many places and that it will lose this right and privilege if it be marked as depressed.

8. That the aforesaid enlistment of this community among the depressed classes is not fair and just and unnecessarily wounds its feelings seriously.

9. That this community is very much aggrieved by the aforesaid enlistment and this humble petitioner is directed by the aforesaid "All Bengal Poundra Kshatriya Association" to place its cause before you with an earnest prayer that you will be pleased to give a favourable consideration to this its grievance and remove this community from the list of the depressed class to that of the general body of electors and to note this community as Pod (Poundra Kshatriya) in consistence with the Census Report.

I Have the honour to be Sir, Your most obedient servant (Sd.) Raicharan Sardar President, All Bengal Poundra Kshatriya Association

তথ্যসূত্র: রাইচরণ সরদার: *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্যপরীক্ষা, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড,* (ক্যানিং, রাধারাণী প্রেস, ১৯৫৯), সনৎ কুমার নস্কর (সম্পা): পৌণ্ড্র মনীষা, (সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২), পৃ.পৃ. ৩৭৭-৩৭৮।

সংযোজনী: ৭. যোগীন্দ্রনাথ মন্ডলের উক্তি

"আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই যে একজন সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট নেতা কিরূপে আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া ধিক্কার দিতে পারে”।

“ব্রাক্ষনের পদধূলি গ্রহন এবং মন্দিরে প্রবেশের দ্বারা আপনাদের কোনও উপকার ও দুঃখ-কষ্ট লাঘব হইবে না। কে আপনাদের দুঃখ-কষ্টের অবসান করিবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে”

তথ্যসূত্র-জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ২য় খণ্ড,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৫।

সংযোজনী: ৮. অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনপঞ্জি

১৯১৪: বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সন্নিকটে তিতাস নদীর তীরবর্তী গোকর্ণঘাট নামক গ্রামে ১লা জানুয়ারি জন্ম।

১৯২৭: অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি।

১৯৩৩: মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯৩৪: কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি এবং অর্থাভাবে পাঠ অসমাপ্ত রেখে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আগমন।

১৯৩৪: ত্রিপুরা হিতসাধনী সভার মুখপত্র ত্রিপুরায় যোগদান।

১৯৩৬: নব শক্তি পত্রিকার সহ সম্পাদক পদে যোগদান। সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র।

১৯৩৮: নবশক্তির সম্পাদক পদে উন্নীত।

১৯৪১: দলবেঁধে গল্পসংকলনের সম্পাদনা। এই সংকলনে তার একটি মাত্র গল্প স্পর্শদোষ স্থান পেয়েছে। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় যোগদান। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। কার্যতো তিনিই এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। সেই সঙ্গে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ও কাজ করতেন।

১৯৪৫: সহ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সহযোগী হিসেবে দেশ পত্রিকায় যোগদান।

১৯৪৮ : যক্ষা রোগের চিকিৎসার জন্য কাঁচরাপাড়া যক্ষা হাসপাতালে ভর্তি।

১৯৫১, ১৬ এপ্রিল: নারকেল ডাঙ্গার ষষ্ঠীতলা লেনের চারতলার এক চিলেকোঠায় নিত্যান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ।

১৯৫২, ২৬শে এপ্রিল: এক স্মরণসভার আয়োজন করে সাগরময় ঘোষ। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমূখদের সহযোগিতায় তার সংগৃহীত বই রামমোহন লাইবেরির কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দান।

১৯৫৬: মৃত্যুর ৫ বছর পর তিতাস একটি নদীর নাম এই অমর উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩: বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের পরিচালনায় মিনার্ভা মঞ্চে তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি নাট্য রূপে অভিনীত হয়।

১৯৭৩: ঋত্বিক ঘটক কর্তৃক চলচ্চিত্রায়ন।

১৯৮২: যাত্রা অভিনয় তিতাস একটি নদীর নাম সুশীল নাট্য কোম্পানি কর্তৃক।

তথ্যসূত্র -বিমল চক্রবর্তী: *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার,* অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০১২।

সংযোজনী: ৯. অদ্বৈত মল্লবর্মণেররচনা সমগ্র

A) অদ্বৈত মল্লবর্মণেরপ্রবন্ধ- নিবন্ধ

১. অপ্রকাশিত পল্লীগীতি: মোহম্মদী, মাঘ, ১৯৪৪।

২. অপ্রকাশিত পুতুল বিয়ের ছড়া: নবশক্তি, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৩৮।

৩. অপ্রকাশিত বাউল সংগীত: নবশক্তি, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৩৮।

৪. আম্রতত্ত্ব: নবশক্তি, ১২ ই মার্চ ১৯৩৭।

৫. এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়: নবশক্তি, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

৬. উপাখ্যান মূলক সংগীত: নবশক্তি, ৯ই ডিসেম্বর, ১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

৭. ছায়াছবির ছবি আঁকা: দেশ শারদীয়, ১৯৪৬।

৮. ছোটদের ছবি ও কাহিনী: দেশ।

৯. জল সওয়া গীত: নব শক্তি, পয়লা এপ্রিল, ১৯৩৮।

১০. টি এস এলিয়ট: দেশ, ১৩ ই নভেম্বর, ১৯৪৮।

১১. দুইটি বারমাসি গান: নবশক্তি,জানুয়ারি, ১৯৩৬।

১২. ত্রিপুরার একটি বারমাসি গান: নবশক্তি, ৩ রা জানুয়ারি, ১৯৩৬।

১৩. নাইওরের গান: নব শক্তি, ৪ ঠা নভেম্বর, ১৯৩৮।

১৪. পল্লী সংগীতে পালা গান: নবশক্তি, ৪ ঠা নভেম্বর, ১৯৩৬।

১৫. পরিহার সংগীত: নবশক্তি, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮।

১৬. পাখির গান: নবশক্তি, ২৫ শে নভেম্বর, ১৯৩৮।

১৭. প্রাচীন চীনা চিত্রকলার রূপ ও রীতি: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ শে মে,

১৮. বর্ষার বাক্য: নবশক্তি, ৩০ শে জুন, ১৯৩৯।

১৯. ভাইফোঁটার গান: নবশক্তি, অক্টোবর, ১৯৩৮।

২০. মাঘমন্ডল: নব শক্তি, ১৪ই জানুয়ারি,১৯৩৮।

২১. বরজের গান: নবশক্তি, ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

২২. রোকেয়া জীবনী: নবশক্তি, ২১ জানুয়ারি, ১৯৩৮।

২৩. শেওলার পালা: নব শক্তি।

২৪. সাগরতীর্থে: দেশ ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ ।

B) গল্প -কাহিনী -উপন্যাস

১. তিতাস একটি নদীর নাম, পুঁথিঘর, ১৯৫৬।

২. জীবন তৃষা, অনুবাদ উপন্যাস: আরভিং স্টোনের লেখা - লাস্ট ফর লাইভ এর অনুবাদ। ১৯ মার্চ ১৯৪৯ থেকে ২০ই মে ১৯৫০।

৩. ভারতের চিঠি- পার্লবাককে।

৪. দলবেঁধে: গল্প গ্রন্থ।

৫.নাটকীয় কাহিনী: দেশ, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ থেকে

১৩ ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ রম্য রচনা বিদেশি কাহিনী অনুসরণে লেখা।

৬. রাঙ্গামাটি, উপন্যাস চতুষ্কোণ প্রকাশিত।

৭. শাদাহাওয়া, উপন্যাস, সোনার তরী শারদীয়া ১৩৫৫।

৮. সন্তানিকা, গল্প   ভারতবর্ষ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

৯. স্পর্শ দোষ গল্প চতুর্থ দুনিয়া , অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৪।

১০. কান্না।

১১. বন্দী বিহঙ্গ।

তথ্যসূত্র -বিমল চক্রবর্তী: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার',* অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা, ২০১২।

সংযোজনী: ১০. যক্ষা হাসপাতাল থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণেরলেখা চিঠি

ওঁ

কাঁচড়াপাড়া

টি বি   হাসপাতাল

ওয়ার্ড নম্বর বি-৩

২৮ শে বৈশাখ, ১৩৫৭

কল্যাণবরেসু

বাবা চন্দ্রকিশোর,

কয়েকদিন আগে তোমার একখানা পত্র পাইয়া সকল বিষয়ে অবগত হইলাম। ইহার পূর্বে যেসব চিঠি লিখিয়াছি তাহা আমি পাই নাই। আমি এখনো হাসপাতালেই আছি। আরো কতদিন থাকিতে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যতদূর মনে হয় আমি আরো এক বৎসর এই হাসপাতালেই থাকিতে পারিব। তারপর কোথায় যাইবো ভগবান জানে। নবদ্বীপের সকলেই ভালো আছে। গঙ্গায় রোজি রোজগার নাই বলিয়া শুনিয়াছি। আমার শরীর আগের মতই আছে। তবে একটু ভালোর দিকে বলিয়া মনে হয়। যাহোক আমার জন্য তোমরা কোন চিন্তা করিও না। আমার যতদিন ভোগকপালে লেখা আছে ততদিন অবশ্যই ভুগিতে হইবে। (সব সময়) পত্র লিখিয়া তোমাদের কুশল সংবাদ অবগত করাইবা।

ইতি

আশীর্বাদক

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

তথ্যসূত্র-অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা): *‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র’,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০।

চিত্রাবলি

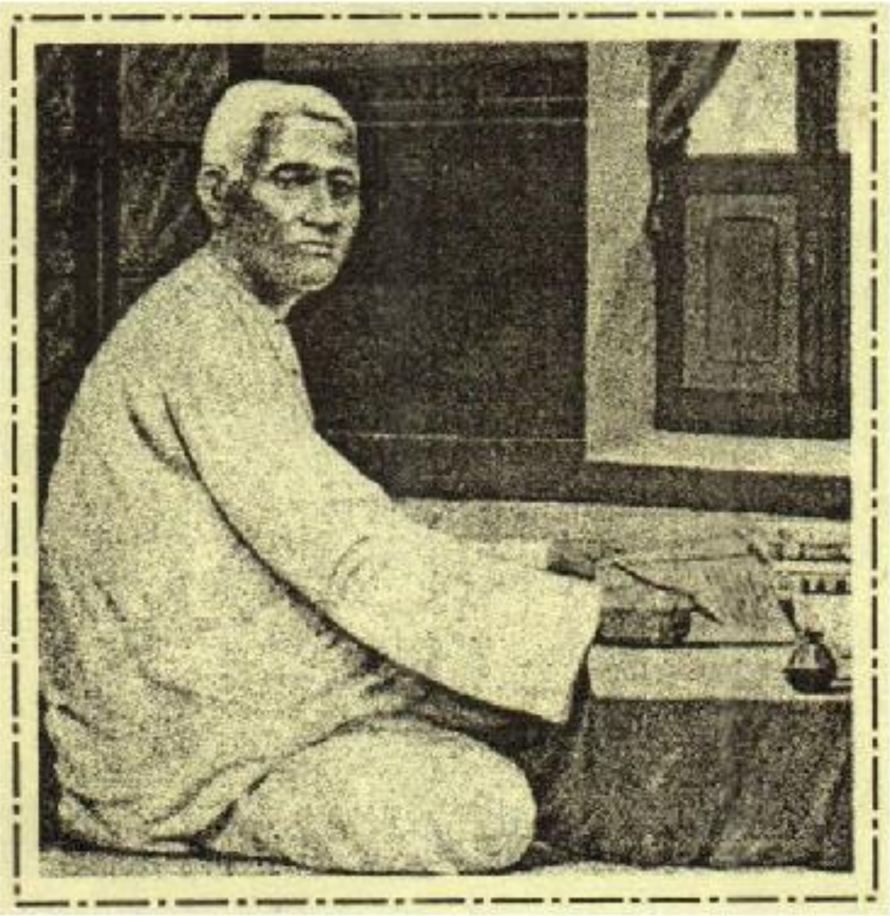

পৌন্ড্রসমাজ জাগরণের জনক মহাত্মা রাইচরণ সরদার

জন্ম:১৫ ই মার্চ, ১৮৭৬

মৃত্যু :২৪ শে জানুয়ারি,১৯৪২

তথ্যসূত্রঃ বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক রাইচরণ সরদার- ধূর্জটি নস্কর

যোগেন্দ্রনাথকে মেয়োয়ার প্রদত্ত 'স্বর্ণ পদক' পরিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী সরদার আবদুররব নিস্তার

তথ্যসূত্রঃ জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯

মাইনরিটি সাব কমিটির অধিবেশনে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় যোগেন্দ্রনাথ

তথ্যসূত্রঃ জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

জন্ম: ২৯ শে জানুয়ারি, ১৯০৪

মৃত্যু : ৫ ই অক্টোবর,১৯৬৮

তথ্যসূত্রঃ https://image.app.goo.gl/yfbaABojYBGRB16o7

তথ্যসূত্রঃ http://image.app.goo.gl/SjwB5jygKLeN8EEv6

জনৈক মহিলা যোগেন্দ্রনাথের ললাটে চন্দন পরিয়ে দিচ্ছেন

তথ্যসূত্রঃ জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯

(L.to R. Standing) Mr. Hasan Ali, Minister of Building and Works; Mr. Nurul Amin, Premier; Hamidul Haq Choudhery, Minister of Finance, Commerce and Industry; Mr. Habibulah Bahar, Minister of Local Self-Govt. and Public Health and Mr. Yusuf Ali Choudhary. M. L. A., Adviser of E. Bengal Govt. (Sitting) Mr. Fazlur Rahman, Khwaja Nazimuddin and Mr. J. N. Mandal.

তথ্যসূত্রঃ জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯

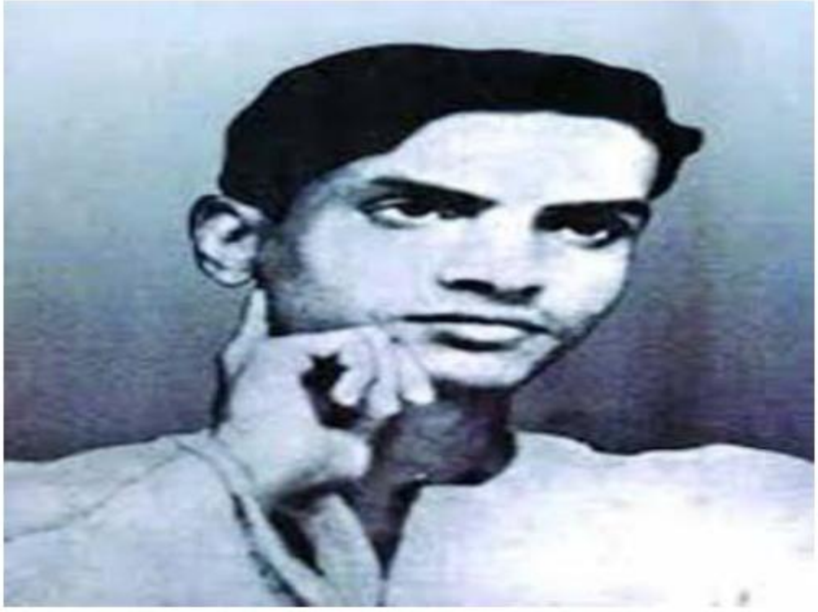

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

জন্ম: ১ লা জানুয়ারি, ১৯১৪

মৃত্যু : ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫২

তথ্যসূত্রঃ http://en.m.wikipedia.org/wiki/AdwaitaMallabarman

মানচিত্র

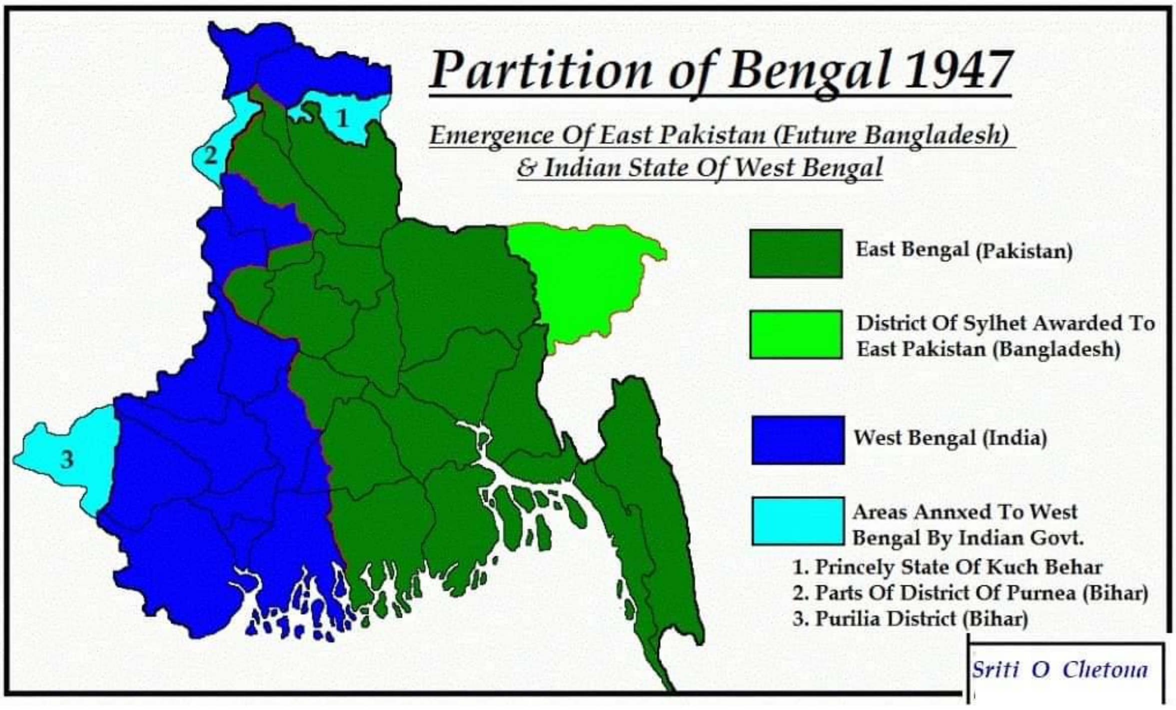

তথ্যসূত্রঃ https://image.app.goo.gl/3s9MXLZ4mcbGxKqz5

তথ্যসূত্রঃ https://www.mapsofindia.com/maps/india/prepartitionmap.htm

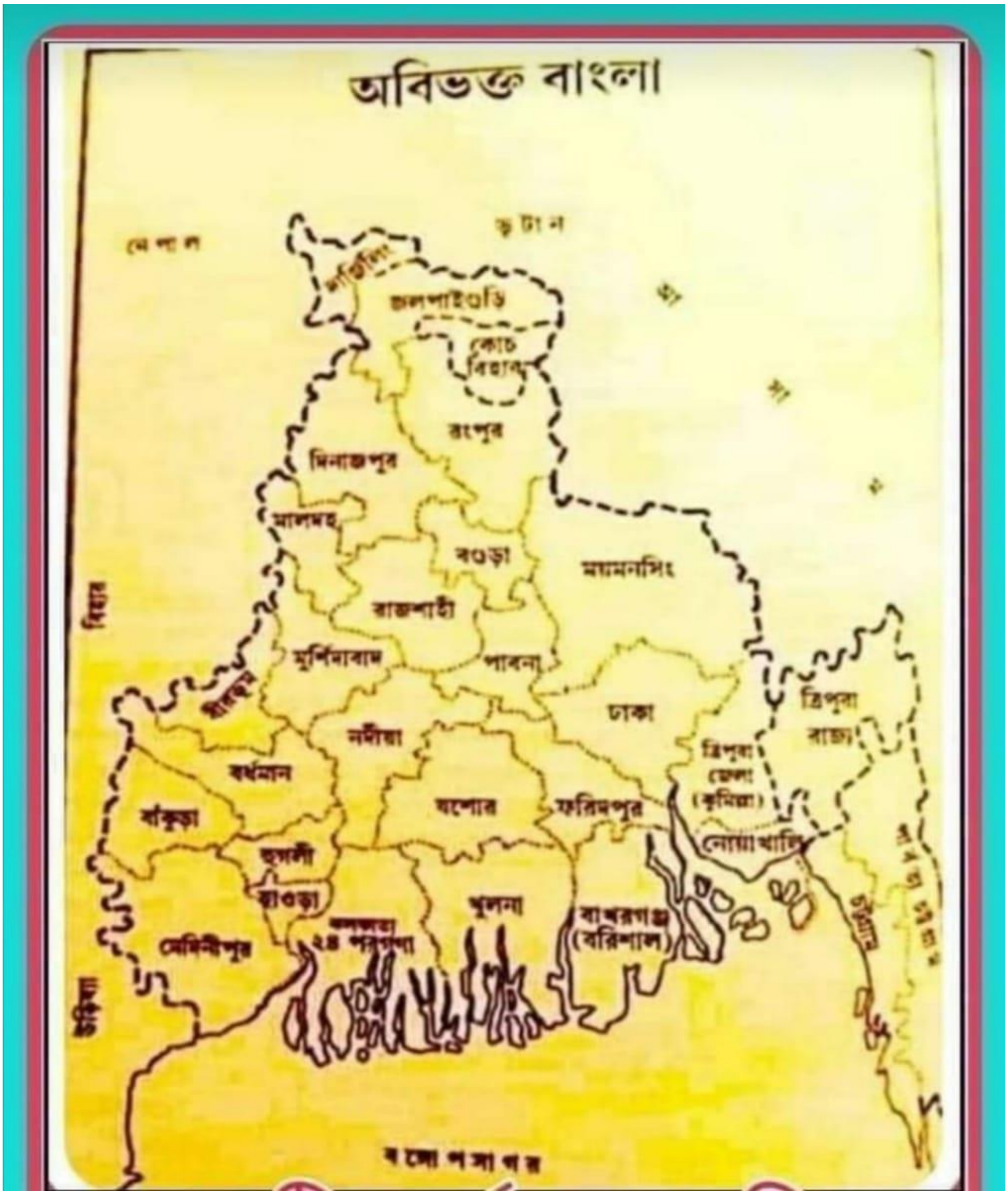

তথ্যসূত্রঃ https://images.app.goo.gl/98fiLBEjXzrHZ45f7

নামের নির্দেশিকা তালিকা (List of Name Index)

আম্বেদকর, বি. আর-২ , ৫১, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮৯, ১২৮ গুরু, শ্রী নারায়ণ-২, ৮৬,

১০৮

উল্লাহ, হাজী শরীয়ত- ৯৫

এন্ডারশন, এডউইন রবাট- ৯০

করন, মহেন্দ্রনাথ- ৯৮, ১৫৫, ১৪০

কবির- ৮৯

কয়াল, কালীচরণ- ১১৭

কাম্বলে, বেবিতাই -১৪৯

কাম্বলে, শান্তা বাঈ -১২৯

কাম্বলে, শোন -১২৯

খাঁ, রামজীবন -১৩৮

গান্ধী, মহাত্মা- ২১৯, ২২০

ঘটক, ঋত্বিক-২৪৭

চাকলাদার, আশালতা-২৫৯

চাঁদ, উর্মি – ১৯২

জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী -১৬৯,

১৭০

ঠাকুর, গুরুচাঁদ -১০,২১, ১৪,

২৩, ৯৭

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ- ১০৮,

১৫২

ঠাকুর, প্রমথ রঞ্জন-২০, ২২২

ঠাকুর, হরিচাঁদ -১০,২১, ১৪,

২৩, ৯৩,৯৪, ৯৫

খান, সৈয়দ আহমেদ- ৯৫

খরাট, শংকর রাও -১২৯

ক্ষরসাগর, সগুনাবাই-৮২

গড়গড়ি, গোপাল চন্দ্র- ১১০,

দত্ত, উৎপল-২৪৭

দত্ত, গোপাল চন্দ্র -১১৯

দাশগুপ্ত, প্রমোদ -২২৩

নস্কর, সিতিকণ্ঠ- ১১৭

নস্কর, ধূর্যটি- ১১৭

নস্কর, রামতারণ -১১৯

নাজিমুদ্দিন- ১৮৮

নেভাসে, খান্ডজি – ৭৯

নেহেরু, জহরলাল -২০, ১৬৯, ১৭০

ডাঙলে, অর্জুন -১৪৯

ডিউই, জন- ৯০,

তালুকদার, আশালতা-২৫৯

ত্রিপতি- ৭৯

বর্মা, ঠাকুর পঞ্চানন-৯৮

বানভট্ট-১৪৫

বাবর, সম্রাট -১৫০

বিদ্যাভূষণ, শ্রীমন্ত নস্কর- ৯৮, ১১৮, ১৩৬, ১৪২

বিশ্বাস, মনিন্দ্র ভূষণ- ২২২

বিবেকানন্দ – ৮৭

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র-১০৮, ১৫২

বিবি,ফতিমা-৮২

বুদ্ধ, গৌতম-৪৮, ৯৪

পাওয়ার, দয়া -১২৯

পাটিল, খন্ডজি-৮০,

পেরিয়ার, ই ভি রামস্বামী-২, ৮৭

প্যাটেল, সরদার বল্লভভাই-২১১

ফুল, জ্যোতিবা-২, ৫১, ১০৮,১২৮

ফুলে, সাবিত্রীবাঈ-২, ৭৮, ১০৮

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ-১৭, ৯৮

মহতাব, স্যার উদয়চাঁদ-২০৩, ২০৪

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত- ৩, ২৪, ৩০, ২৪৭

মন্ডল, রাম দয়াল- ১৭৬

মন্ডল, সন্ধ্যা দেবী- ১৭৬

মন্ডল, যোগেন্দ্রনাথ-৩, ১৫, ২৪, ৩০, ১৭৫ ১৫২

মন্ডল, নন্দলাল -১১৯

মন্ডল, আশালতা-২৫৯

বসু জ্যোতি-২২৩, ২০৫

বসু, সমরেশ-২৫১

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক-২৫১

বোস, শরৎচন্দ্র- ২১১

ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র নারায়ন -১২১

ভট্টাচার্য, সর্বেশ্বর পালধী- ১১২

মহাবীর, বর্ধমান-৪৮

রমাবাই, পন্ডিতা- ৭৯

রাম, সখা- ৭৯

রামপাল-১৪৬

রায়, পতিরাম-১৪৯

রায়, রাজা রামমোহন-৯৫, ১০৮,

রায়, দেবেশ-২৫১

রাসেল, বার্ট্রান্ড- ৯০

মাউন্টব্যাটেন, লর্ড- ১৭০

মালাগাত্তি, ড.অরবিন্দ -১৪৯

মানে, লক্ষণ -১৪৯

মীরজাফর- ১৯২

মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ-২০৪, ২১৯, ২২০, ২১১

মুরমু, সাধু রামচাঁদ- ২৮৪

মেকেলে, লর্ড- ১০৮

মেগাস্থিনিস, বরিশালের- ১৮৪

মেনের্ড, জন- ৯০

সরদার, রাইচরণ-৩, ১৫, ২৪, ৩০, ১০৯

সরদার, মধুসূদন -১১৯

সরস্বতী, দয়ানন্দ- ১০৮, ১৫২

সিদুজি- ৭৯

সিন্ডে, তারাবাই-৭৯

রিচলে, হারবার্ট হোপ- ১, ৪১

র‌্যাডক্লিফ, স্যার সিরিল- ১৯৩, ২০৫

লাং, ওয়াং- ২৬৪

লিম্বালে, শরণ কুমার -১২৯

শ্রীচৈতন্যদেব- ৯৪

সরকার, শান্তি- ১৪৯

সরকার, মুরারি মোহন- ১৪৩

সরদার, গদাধর- ১০৯,

সরদার, লক্ষ্মী দেবী- ১০৯

সেন, কেশব চন্দ্র-১৫২

সেন, দুর্গা মোহন- ১৮৪

সোহরাবর্দি, এস এইচ- ২০৬

হক, ফজলুল- ২০৬, ১৯৮ ২০০, ২০৫

হর্ষবর্ধন- ১৪৫

হালদার, বেণীমাধব- ৯৮, ১১৮, ১৩৬, ১৪২, ১৫৫

হ্যামিলটন, বুকানন- ১

হান্টার, উইলিয়াম উইলসন-১, ৪

বিষয় ভিত্তিক নির্দেশিকা তালিকা (List of Subject Index)

অথর্ব বেদ -৪৪

অশূচি- ৫২

আর্য পৌন্ড্রক ব্রহ্মচর্য আশ্রম -১১৬

আজাদ -২৫০

আল্লাহু আকবার – ১৭২

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান -২০৪

ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি -৯১

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন- ২১৩

ইংরেজি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি -১১৫

উপনয়ন বা উপবিত -১২০

উডের ডেসপ্যাচ -৮১

ঋগ্বেদ- ৪৪

ওয়েবলিওগ্রাফি -২৭

কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন -১১২

কম্যুনিস্ট পার্টি -১৭২

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ -২৪৯

কৃষক প্রজা পার্টি- ১৯৮ ২০০, ২০৫

কৈবর্ত- ৮, ১৬, ১০৯, ১১০, ১১৮

কৈবর্ত বিদ্রোহ -২৩

কোচ -৮

কোল -১৫

ক্রমনিম্ন পরিশ্রুত তত্ত্ব -১০

গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল- ১৮৯

গাবরদের পাড়া -২৪৮

গারো বিদ্রোহ -২৩

গুলামগিরি -৭৬

চাকমা বিদ্রোহ-২৩

চিফ কমিশনার – ১৮৯

চুয়াড় বিদ্রোহ -২৩

জাত ব্যবস্থা- ২, ৪, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭

জাস্টিস পার্টি -৮৮

জাতীয় কংগ্রেস -১৭০

জাগরন পত্রিকা -১৮৬

জৈবিক তত্ত্ব- ৪৩

ডায়মন্ড হারবার ওমেন্স ইউনিভার্সিটি- ১৫৪

ডায়মন্ড হারবার মুনসেফ আদালত- ১১৪

ডিপ্রেস্ট ক্লাসেস- ৫১, ৫২

ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস – ১৬৮

ডোম-১৫, ৬০

তপশিলি জাতি -৪১

তম -৪৬

দলিত-১

দলিত স্টাডিজ- ১, ৯, ১৩০

দলিত পতর্ক- ১, ৯, ১৩০

দীনবন্ধু -৭৬

দলিত বন্ধু -৫১

দ্রাবিড় সমিতি - ৮৮

পাগল -৯৬

দ্বাদশ সাহ অশৌচবিধি - ১৩৭

দ্বিজাতী তত্ত্ব – ১৯২

ধর্মীয় রহসাত্মক তত্ত্ব - ৪৩

ধোবা -১৬, ৬১

নবজাগরণ বা রেনেসাঁ ৭৩, ৯৫, ৯৭, ১১৫

নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন ৯৭

নবশক্তি -২৫০

নবযুগ- ২৫০

তুজুক-ই-বাবরি – ১৫০

তপশিলি উপজাতি – ৪৯

নাপিত -১৬, ১০৯, ১১০

নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র সংস্থা- ৯৮

পিপলস এডুকেশন সোসাইটি -৯১

প্রার্থনা সমাজ-৭৫

পুঁজিবাদ – ১৭১

পৌন্ড্র ৩, ৮, ১৬, ৬০, ১০৯, ১১০

পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার- ১৪০

বরজের গান – ২৫৫

বঙ্গীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন -১৮৬

বরিশাল হিতৈষী পত্রিকা – ১৮৪

বাগদি- ৬১, ১০৯, ১১০,১১৮

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র- ৪৫

নমঃশূদ্র-৩, ৮, ৬৫, ১০৯, ১১০, ১১৮

নমঃশূদ্র সুহৃদ ৯৮

ব্রাত্যস্তম যজ্ঞ- ১২১

ব্রাহ্মসমাজ -৭৫

ভগবানের সন্তান-৫২

ভারত সভা- ৩

মতুয়া- ১০, ২১

মুসলিম লীগ -১৭০

মহাভারত -১৪২

মেথর - ১১০

মালো -৩, ৮

মন্দির বাজার সিতি কণ্ঠ ইন্সটিটিউশন – ১১৭

মতুয়া ধর্ম -৯৫

মাহার সত্যাগ্রহ -৯০, ৯১

বন্দেমাতরম- ১৭২

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি- ১১৯

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব- ১১৯

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব -১৪০

রজক -১৬

রজ -৪৬

রামায়ণ -১৪২

রাজবংশী ৮, ১৬, ৬১, ১০৯, ১১০, ১১৮

লেফটেন্ট গভর্নর – ১৮৯

শুঁড়ি- ১১০

শুচি,৫২

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান- ১৩৬

সত্য সাধক সমাজ -৭৭

সমাজতন্ত্র -১৭১

সর্ববঙ্গ পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতি – ১২০

মালি বা কুনবি -৭৬

মুসলিম লীগ- ১৬৮

মোহাম্মদী- ২৫০

যজু বেদ -৪৪

সাইমন কমিশন -৪১

সাম বেদ-৪৪

স্বত্ব -৪৬

সাবালটন স্টাডিজ -১, ৯, ১৩০

সাংস্কৃতিকরণ -২, ৬

সামাজিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব -৪৩

সিডিউল কাস্ট অ্যাসোসিয়েশন

সেন্সাস-১৪৪

হরিজন -৫১

হাঁড়ি - ১৫, ৬৪

হিন্দু মহাসভা- ২০৪

সদগোপ -১৬
হোস্টেল বা ছাত্রাবাস ১১৬
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ৯৩
১৯৩২ সালের পুনা চুক্তি-২২৪
সামন্ততান্ত্রিক -২৪৯
১৯৩৫ সালের সিডিউল কাস্ট অ্যাক্ট -৫২
সাম্প্রদায়িকতা -১৭৫
১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ- ১৭৩
সাঁওতাল বিদ্রোহ, ২৩
১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন- ২০৬
১৯৪৭ এর দেশ ভাগ- ১৬৮
১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা- ২০০, ২০৫
১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ ১৭৪
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ-১৬৮
১৯৬৫ সালের লকুড় কমিশন ২২৪

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী (Selected Bibliography)

বাংলা প্রাথমিক উপাদান:-

করণ, মহেন্দ্রনাথ: *'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুল-প্রদীপ'*,১৯২৮, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০১।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা): *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০।

মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-প্রথম খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৫।

---------------------: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-দ্বিতীয় খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৫।

---------------------: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-তৃতীয় খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯।

---------------------: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-চতুর্থ খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৭৯।

---------------------: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-পঞ্চম খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৪।

---------------------: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-ষষ্ঠ খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৪।

---------------------: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ-সপ্তম খণ্ড'*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৬।

রায়, দেবেশ: ধ্বরিশালের যোগেন মণ্ডল', দেজ পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১০।

সরদার, রাইচরণ: 'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা', রাধারানী প্রেস, ক্যানিং টাউন, ১৩৬৬।

-----------------: *'শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র*, প্রথম খণ্ড, সরস্বতী প্রেস, বারুইপুর, ১৯৪১।

------------------: *'শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৯৪১।

পৌণ্ড্র জাতির আন্দোলন বিষয়ক পত্র-পত্রিকা:-

গায়েন, কৃষ্ণপদ: '*পৌণ্ড্র দর্পণ'*, কলকাতা, ২০১৮

গায়েন, দিলীপ: *'পৌণ্ড্রসমাজ পরিচয়'*, দক্ষিন ২৪ পরগণা, ২০১০।

বিশ্বাস, উৎপল (সম্পা): '*গনমুক্তি'*, ১০ ম উদ্যোগ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংখ্যা, ঢাকা, বি এস প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৯।

মণ্ডল, যোগেন্দ্রনাথ: ব্যাক্তিগত চিঠি, -চতুর্থ খণ্ড।

অপ্রকাশিত বাংলা Ph.D/M.Phil গবেষণা সন্দর্ভ:-

ড.কৃষ্ণ কুমার সরকার: *'জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ : বাংলার পৌন্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯১১-২০১১)'*।

ড.রাজেশ বিশ্বাসের: *'পশ্চিমবঙ্গে তপশিলী জাতিভুক্ত উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৭১'*।

বিমলেশ মান্না: *'ঔপনিবেশিক বাংলার দলিত চেতনা: রাইচরণ সরদার ও অদ্বৈত মল্লবর্মনের একটি তুলনামূলক আলোচনা',* এম. ফিল গবেষণা সন্দর্ভ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, ২০১৬।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার:-

কৃষ্ণকুমার সরকার, বয়স-৩৮, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন'স কলেজ, মেদিনীপুর। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫/০৭/২০২৩।

গোর্বদ্ধন দাস, বয়স- ৮৭, ভাঙ্গাগড়া, মহিষাদল, পুর্বমেদিনীপুর। সাবডিভিশনাল অফিসের ক্লার্ক। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৯/০৭/২০২২।

দিলীপ গায়েন, বয়স- ৫৮, সোনারপুর, দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, শিক্ষক, নলতা মহাজাতি হাইস্কুল ফর বয়েজ, দমদম, উত্তর চব্বিশ পরগণা। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০/০৮/২০২৩।

ধূর্জটি নস্কর, বয়স ৭৭, দক্ষিন বারাসাত, চব্বিশ পরগনা। (এ জি বেঙ্গলের প্রাক্তন আধিকারিক, বর্তমান পৌণ্ড্রসমাজ আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা, বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও গবেষক)। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮/০২/২০১৬।

মনোহরমৌলি বিশ্বাস, বয়স- ৯০, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, ৬৫১-VIP নগর, কলকাতা।

হরষিত সরকার, বয়স- ৪৮, অশোক নগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক।

পত্র-পত্রিকা:-

বাংলা-

অনন্য সাহিত্য পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা।

চতুর্থ দুনিয়া।

বর্তমান পত্রিকা।

মায়ের ডাক পত্রিকা।

যুগান্তর।

সাপ্তাহিক জাগরণ।

ইংরেজি-

Dalit Miror.

The Statesman.

The Times of India.

প্রকাশিত বাংলা সহায়ক গ্রন্থ সমূহ:-

কবিরাজ, বিশুদ্ধ নন্দন: *‘দলিতের দুর্দশায় শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর’,* গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০২১।

গায়েন, দিলীপ: *‘ভারতীয় মূলনিবাসী বহুজন সমাজে নবজাগরণ আন্দোলনের অগ্রদূত হরিচাঁদ’,* প্রকাশক বৌদ্ধদর্শন পাঠচক্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০২১।

------------(সম্পা): *‘মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ’,* পৌণ্ড্র মহাসংঘ, সোনারপুর, ২০১১।

গায়েন, পীযূষ (সংকলন ও ভাবনা): *‘মূলনিবাসী পথ প্রদর্শকদের কথা আমাদের ইতিহাস’,* প্রকাশিকা নীলিমা গায়েন, সোনারপুর, ২০১৩।

গোস্বামী, অঞ্জন: *‘ভারত অনুসধান প্রথম খণ্ড’,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

ঘোষ, তপনকুমার (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা): *‘প্রাচীন ভারতে বর্ণ শ্রেনী ও জাত’* ছোঁয়া, হুগলী, ২০১৬।

চন্দ্র, বিপন: *‘ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০’* আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬।

চক্রবর্তী, ড.বরুনকুমার: *‘বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ’,* অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭।

চক্রবর্তী, বিমল: *‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার’,* অক্ষর পাবলিকেশনস্, ত্রিপুরা, ২০১২।

চ্যাটার্জী, দেবী: *‘জোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে সমাজ বিপ্লবের পথিকৃৎ’,* প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, কলকাতা, ২০২২।

চ্যাটার্জী, দেবী: *‘পতিত, ভারতের জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণী দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান’*, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০১।

চ্যাটার্জী, দেবী: *‘মানবাধিকারন ও দলিত’,* ক্যাম্প, কলকাতা, ২০১৪।

চৌধুরী, অলোকনারায়ণ: *‘ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা’,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন: *‘সাহিত্য প্রকরন’,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০১।

ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ (সম্পা): *‘বাংলার নমঃশূদ্র প্রথম খন্ড’*, কে এন টি এ এ, কলকাতা, ২০২২।

দাস, নরেশচন্দ্র: *‘নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ’* প্রকাশক নরেশচন্দ্র দাস, কলকাতা, ১৩৬৮।

দাস, স্বপন (সম্পা): *‘দলিত ভাবনায় প্রবন্ধ’*, প্রয়াগ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

দে, শুভঙ্কর (সম্পা): *‘ভারতের সামাজিক ইতিহাস অনূর্দ্ধ ৩০ এর কলমে’*, আবিষ্কার, কলকাতা, ২০১৬।

দে, অমলেন্দু: *‘সমাজ ও সংস্কৃতি’*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮১।

নস্কর, ধূর্জটি: *‘বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক রাইচরণ সরদার’*, দেবলা প্রকাশনী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১১।

-------------: *‘পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক’*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৬।

নস্কর, সনৎ কুমার (সম্পা): *‘পৌণ্ড্রমণীষা’*, পৌণ্ড্রমহাসঙ্ঘ, সোনারপুর, ২০১২।

প্রামানিক, মৃন্ময় (সম্পা): *‘দলিত চেতনা, দলিত দর্শন কথায় কথায় শরণকুমার লিম্বালে’* হুগলি, ২০২২।

-------------: *‘দলিত সাহিত্যচর্চা’*, গাংচিল, কলকাতা, ২০২৩।

প্রামাণিক, শ্যামল: *‘পুন্ড্র দেশ ও জাতির ইতিহাস’*, ফার্মা কে. এল. এম. কলকাতা, ২০১০।

বর্মণ, রূপ কুমার: *'জাতি-রাজনিতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক',* অ্যালফাবেট বুকস্, কলকাতা, ২০১৯।

-------------------: *'সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ জাতপাত, জাতি-রাজনিতি ও তপশিলি সমাজ',* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২।

বর্মা, যূথিকা: *'জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবং',* সোপান, কলকাতা, ২০২১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর: *'পলাশি থেকে পার্টিশান: 'আধুনিক ভারতের ইতিহাস',* ওরিয়েন্টলংম্যান, হায়দ্রাবাদ, ২০০৬।

বসু, নির্মল কুমার: *হিন্দু সমাজের গড়ন,* বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৯৪৮।

বসু, সোমেন: *'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী',* রবীন্দ্রচর্চা ভবন, কলকাতা, ১৯৯৩।

ব্রহ্ম, অনন্ত কুমার: *'বাঙালি জাতির উৎস সন্ধানে'* জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০।

বালা, মঞ্জু: *'দলিত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা',* এখন-তখন, কলকাতা, ২০০৯।

বালা, যতীন: *'সমাজ চেতনার গল্প',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১২।

--------------: *'দলিত সাহিত্য আন্দোলন',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০২।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা): *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০।

বিশ্বাস, জগদ্বন্ধু: *'মানবতাবাদের অক্লান্ত যোদ্ধা, ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড.বি.আর. আম্বেদকর',* প্রকাশিকা শ্রীমতী অঞ্জলি বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ, ২০০০।

বিশ্বাস, মনোশান্ত: *'বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনিতি,'* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬।

বিশ্বাস, মনোহরমৌলি ও প্রামাণিক, শ্যামল কুমার (সম্পা): *'শতবর্ষের বাংলা দলিত সাহিত্য',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১১।

বিশ্বাস, মনোহরমৌলি: *'দলিত সাহিত্যের দিগ্‌বলয়',* ড.আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২।

------------------------: *'ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩।

বিশ্বাস, সদানন্দ: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ',* দীপালি বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৪।

বৈরাগী, মনি মোহন: *'অস্পৃশ্য জনজাতির মুক্তি-সূযর্, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল',* প্রকাশক অভিমান্য পাল, নদীয়া, ২০১৬।

ভট্টাচার্য, তপোধীর: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ',* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ২০০০।

ভট্টাচার্য, নন্দলাল: *'জ্ঞান তাপস রাধাকৃষ্ণন',* গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, ২০০৩।

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা): *'নিম্নবর্গের ইতিহাস',* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।

ভৌমিক, শ্রীখগেন্দ্র নাথ: *'সংরক্ষন ও জাতপাত'* সঞ্চয়ন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০02।

মাইতি, ডঃপ্রদ্যোত কুমার: *'ইতিহাস পরিক্রমা',* মাইতি পাবলিকেশন, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১১।

মুখ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ: *'জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালি সমাজ',* কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮১।

মুখোপাধ্যায়, জীবন: *'ইতিহাস শিক্ষক',* স্কলার বুকস, কলকাতা, ২০০৯।

মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র: *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর',* বিশ্বাস পাব্লিশার, কলকাতা, ১৯৯৯।

মণ্ডল, দেবাশিস: *'অবতল জনের স্বতন্ত্র স্বর',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৫।

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত: *'তিতাস একটি নদীর নাম',* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩।

মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব ও নন্দী, দেবাশিস: *'ভারতীয় রাজনীতি',* জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১১।

রায়,গৌতম (সম্পা): *'রোকেয়া রচনাসংগ্রহ',* দেজ পাবলিশিং কলকাতা, ২০১৮।

রায়, জগদীশচন্দ্র (সম্পা): *'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ',* হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ প্রকাশনী, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২০২১।

রায়, দেবেশ: *‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।

রায়, দেবেশ (সম্পা): *‘দলিত’,* সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯৭।

রায়, প্রকাশচন্দ্র: *‘পুড়ো-পোদ্দরাজ তথা পৌণ্ড্র জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’,* নীলশিখা প্রকাশন, উত্তর প্রদেশ, ২০০২।

রায়, প্রদীপ: *‘নারী মুক্তির প্রথম নেত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে’,* বহু জন সাহিত্য প্রকাশনী, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৯৭।

রায় লশকর, ধূর্জটি: *‘পুণ্ড্র পৌণ্ড্র জাতি ও সভ্যতার ইতিহাস’,* দেবলা প্রকাশনী, দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, ২০১৯।

রানা, সন্তোষ ও রানা, কুমার: *‘পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী’,* ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯।

লশকর, ধূর্জটি: *‘পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধ সভ্যতা’,* বিভূতি প্রিন্টিং ওয়াকর্স, কলকাতা, ২০০৮।

সরকার, কৃষ্ণ কুমার ও বাগ, বুবাই (সম্পা): *‘প্রসঙ্গ ইতিহাস সাম্প্রতিক ভাবনা’,* কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌, কলকাতা, ২০২১।

সরদার, রাইচরণ: *‘দীনের আত্মকাহিনী’, পৌণ্ড্রমনীষা,* পৌণ্ড্র মহাসংঘ, সোনারপুর, ২০১২।

সরকার, হরষিত (সম্পা): *‘সোজাকথা গুরুচাঁদ সংখ্যা’,* প্রকাশক সোজাকথা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১৯।

-------------------------: *‘সোজাকথা নমজাতি সংখ্যা’*, প্রকাশক সোজাকথা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১৯।

-------------------------: *‘সোজাকথা, বাংলাভাগ সংখ্যা’*, প্রকাশক সোজাকথা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২০।

-------------------------: *‘সোজাকথা, মূল-ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা’*, প্রকাশক সোজাকথা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২১।

-------------------------: *‘সোজাকথা সংরক্ষণ সংখ্যা’*, প্রকাশক সোজাকথা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২০।

সেনমজুমদার, জহর: *‘নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন’*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০৭।

সেন, পৃথ্বীরাজ: *‘দলিত সূর্য আম্বেদকর’*, আদ্রিশ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮।

সেন, শুচিব্রত ও ঘোষ, অমিয়: *‘আধুনিক ভারতের ইতিহাস : ১৮৮৫- ১৯৬৪’*, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮।

সেন, সুজিত (সম্পা): *‘দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ’*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৩।

---------------------: *‘জাতপাতের রাজনীতি’* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯।

---------------------: ‘জাতপাত ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট’, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০০৮।

হালদার, সুধীর রঞ্জন: 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রসঙ্গে', কমলা পাবলিশার্স, নদীয়া, ২০২০।

প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ সমূহ:-

কায়সার, সান্তনু: *'নদী ও মানুষের যুগলবন্দী',* অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

গায়েন, দিলীপ: *'পৌণ্ড্রসমাজ জাগরণ-আন্দোলন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও মহাত্মা রাইচরণ সরদারের ভূমিকা',* দিলীপ গায়েন (সম্পা): *'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ',* পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ: *জাত জাতি- জাতীয়তা,* সুজিত সেন (সম্পা), *জাতপাতের রাজনীতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯।

নস্কর, ড. সনৎকুমার: '*পৌণ্ড্রগৌরব তিন মনীষীর জীবন ও সাধনা',* চতুর্থ বার্তা, অক্টোবর ২০২২ ও মার্চ ২০২৩, সুধাংশুকুমার সরকার (সম্পা), কলকাতা, ২০২৩।

নাথ, মৌসুমী: *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত: দেবেশ রায়ের নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপায়ন'* 'অন্তর্মুখ' পর্ব-৪, সংখ্যা-২, বর্ধমান, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪।

প্রামাণিক, শ্যামল কুমার: *'বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ও তাঁর সমাজ দর্শন,স্মরণে-মননে আম্বেদকর বিশেষ সংখ্যা',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৪।

বর্মণ, রূপকুমার: *'বাঙালী নিম্নবর্ণ মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম: সমাজ ও সাহিত্যের তুলনাত্মক বিশ্লেষণ'* 'অন্তর্মুখ' পর্ব-৪, সংখ্যা-২, বর্ধমান, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪।

'----------------: *হ্যাঁ নিম্নবর্ণীয়রা লিখতে পারে',* বাংলা জর্নাল' ১৩শ বর্ষ, ২১ শ সংখ্যা, কানাডা, টইটুম্বর, ডিসেম্বর ২০১৫ ।

বাড়ৈ, ড. অরুন কুমার: *'শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরঃ প্রসঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক আন্দোলন'* 'চতুর্থবার্তা' চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৫।

বিশ্বাস, মনোহর: *'অদ্বৈত মল্লবর্মণ: অতীতের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা খুঁজে',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

বিশ্বাস, মনোহর মৌলি:*'এনাইহিলেশন অব কাস্ট' ও বি. আর আম্বেদকর, স্মরণে-মননে আম্বেদকর বিশেষ সংখ্যা',* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৪।

মাইতি, লাল্টু: *'দলিত লেখকের আত্মজীবনী: প্রসঙ্গ মনোরঞ্জন ব্যাপারী',* চতুর্থ বার্তা, অক্টোবর ২০২২ ও মার্চ ২০২৩, সুধাংশুকুমার সরকার (সম্পা), কলকাতা, ২০২৩।

মুখোপাধ্যায়, ড. মানবেন্দ্র: '*প্রান্তিক নিম্নবর্গ দলিত: পরিভাষার অন্তরে'* 'অন্তর্মুখ' পর্ব-৪, সংখ্যা-২, বর্ধমান, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪।

মৃধা, শশাঙ্কশেখর: *'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও সমাজ উন্নয়ন',* দিলীপ গায়েন (সম্পা): *'মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ',* পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১১।

মল্লবর্মন, অদ্বৈত: *'আশালতার মৃত্যু',* প্রথম প্রকাশ, একাল শারদীয়া ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ,ভাসমান-১০, অদ্বৈত মল্লবর্মন এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৩।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বর্ণ ও রাষ্ট্র,* সুজিত সেন (সম্পা), *জাতপাতের রাজনীতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯।

সরকার, কৃষ্ণকুমার: '*দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা': বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী',* Literature, Culture And Society, অরেন্স মহলদার ও দেবদীপ ধীবর (সম্পা), মহাবোধী বুক আজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫।

---------------------: *'পোদ থেকে পৌণ্ড্রঃ বাংলার পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক আলোচনা'* 'চতুর্থবার্তা' চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল, কলকাতা, ২০১৫।

---------------------: '*পৌণ্ড্র জাতির জাতিসংগঠন ও কার্যক্রম: একটি আলোচনা (১৮৭২-১৯৪৭)',* ইতিহাস প্রবন্ধমালা, সংখ্যা ১৭, সম্পাদক অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২২।

---------------------: *'আত্মচেতনার উন্মেষ: পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনে পত্র পত্রিকার অবদান (১৯১০-১৯৭০)',* বাংলা জর্নাল, ২১শ সংখ্যা, ইকবাল করিম হাসনু (সম্পা), কানাডা, টইটুম্বর, ২০১৫।

সরকার, ড.জীবন কুমার: *'উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনে নমঃশূদ্রদের ভূমিকা'* 'চতুর্থবার্তা' চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৫।

Selected English Bibliography

English Primary Sources:-

Broomfield, J. M: *'The partition of Bengal: A Problem in British Administration, 1830-1912',* In Proceedings of the Indian History Congress, vol. 23, Indian History Congress, 1960.

Gupta, Sisir. K: *'Moslems in Indian politics, 1947–60',* India Quarterly 18, no. 4 1962.

Hunter, William Wilson: *A statistical account of Bengal 20 Volume,* (London, Trubner & Co,1875-77), reprint edn, (New Delhi, Concept Publishing Company, 1984.

Kaviraj, Sudipta: *'Religion, politics and modernity,'* Occasional Paper, 1994.

Suhrawardy, Huseyn Shaheed: *'Political stability and Democracy in Pakistan', Foreign Affairs* 35, no.3, 1957.

Zaidi, Z. H: *'The Political Motive in the Partition of Bengal, 1905', Journal of the Pakistan Historical Society* 12, no.2, 1964.

Government Report:-

Beverley, H: Report on the Census of Bengal 1872, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872.

Census report of India: 1911, 1941, 2001, 2011

Government of West Bengal, Short Note on Scheduled Caste of West Bengal,(Kolkata: Cultural Research Institute. Backward Classes Welfare Department, 2005.

The Government of India(schedule caste) order 1936.

Risley, H.H: The Tribes and Castes of Bengal, 2 Vol, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1891.

পৌণ্ড্র জাতির আন্দোলন বিষয়ক ইংরেজি চিঠিপত্র:-

Letter of Raicharan Sardar to the Reforms Officer, Government of Bengal, dated, Calcutta, 28th January 1933.

Letter of Raicharan Sardar to Mahatma Gandhi, dated, Calcutta 4th March 1935.

Unpublished Ph.D/M.Phil Thesis:-

Amlan Baisya: 'Caste Politics in West Bengal: The Inside Story'. *Chakradhar Baldeo Indurkar, PhD Scholar, School of* 2015.

Dr.Deboshree Dey: *'Adivasi Women in Eastern India 1947-2010'.*

Dr.Aparna Mondal: *‘Life and Culture in the Sundarbans 1770-1870’.*

Secondary Books in English:-

Ahmed, Ishtiaq: *‘The 1947 partition of India: A paradigm for pathological politics in India and Pakistan,’* Asian ethnicity 3, no.1, 2002.

Ali Baig, Mirza Rashid: *‘The partition of Bengal and its Aftermath’*, The Indian Journal of Political Science 30, no.2, 1969.

Ali, Syed Ashraf: *Sher-e-Bengla: 'The Daily Star,* Collected date*: 10 August 2017.*

Ambagudia, Jagannath: *‘Scheduled tribes and the politics of inclusion in India’, Asian Social Work and Policy Review* 5, no.1, 2011.

Asif, Ghazal: *‘Jogendranath Mandal and the politics of Dalit recognition in Pakistan’. South Asia’,* Journal of South Asian Studies 43, no.1, 2020.

Baisya, Amlan: ‘Caste Politics in West Bengal: The Inside Story’. *Chakradhar Baldeo Indurkar*, PhD Scholar, School of 2015.

Baily, Christopher A: ‘The Pre-history of Communalism’? Religious Conflict in India, 1700–1860’, Modern Asian Studies 19, no.2, 1985.

Bandyopadhyay, Sarbani: *‘The Invisibility of Caste in Bengal’,* The Oxford Handbook of Caste 2023.

Bandyopadhyay, Sekhar : ‘*Caste Protest and Identity in Colonial Bengal : The Namasudras of Bengal 1872-1947,’* Surrey, Curzon Press 1997.

----------------------------: '*Caste Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal*,' New Delhi,Sage Publications, 2004.

----------------------------: *'Caste, Politics and the Raj: 1872-1937,'* Kolkata, K P Bagchi& Company, 1990.

----------------------------: *Caste in Bengal : Histories of Hierarchy Exclusion and Resistance*, Permanent Black, 2022.

Bandyopadhyay, Sekhar and Basu Ray Chaudhury, Anasua : *'Partition in Bengal: Re-visiting the caste question, 1946–47',* Studies in History 33, no.2, 2017.

Barman, Rup Kumar: '*Caste Identity Formation: Mobility and Elite Leadership, in B K Saha (ed) Wealth and Welfare*,' Kolkata Academic Enterprise, 2005.

----------------------------: '*Partition of India and its Impacts on Scheduled Caste of Bengal*,' New Delhi, Abhijeet Publications, 2012.

----------------------------: *'Caste Violence in India Reflections on violence against the Dalits of Contemporary India',* Voice of Dalit, Vol-3,No-2' (July-Dec), 2010.

Basu Ray Chaudhury, Anasua: *'Politics of rehabilitation: struggle of the lower caste refugees in West Bengal',* Voice of Dalit 3, no.1, 2010.

Bhattacharyya, Swapan Kumar: '*Exploring BR Ambedkar's Sociology: A Biographical Approach'. In Indian Sociology: Theories, Domains and Emerging Concerns*, Singapore: Springer Nature Singapore, 2023.

B.Dirks, Nicholas : *'Castes of Mind Colonialism and the Making of Modern India',* Permanent Black, 2002.

Belmekki, Belkacem: *‘The formation of the Indian National Congress: A British manoeuvre?’,* ES: Revista de filología inglesa 29, 2008.

Biswas, Manosanta: *‘Caste, Community, Religion and Empowerment: The Political Movement of the Muslims, Matua and Namasudras in the Colonial Bengal’,* Afro Asian Journal of Anthropology and Social Policy 5, no.1, 2014.

Biswas, Oneil : *‘Matuaism in a nutshell’,* Dekas Prakasani, Kolkata, 2010.

Bryant, Gerald. J: *‘Indigenous Mercenaries in the Service of European Imperialists: The Case of the Sepoys in the Early British Indian Army, 1750-1800’*, War in History 7, no.1, 2000.

Chakrabarty, Bidyut: *‘An alternative to partition: The United Bengal scheme’*, South Asia: Journal of South Asian Studies 26, no.2, 2003.

-------------------------: ‘*The Partition of Bengal and Assam 1932-1947: contour of freedom*. Routledge, 2004.

-------------------------: *‘BR Ambedkar and the history of constitutionalizing India’,* Contemporary South Asia 24, no.2, 2016.

Chakrabarty, Dipesh: *‘Remembered villages: representation of Hindu-Bengali memories in the aftermath of the partition’,* Economic and Political Weekly, 1996.

Chakraborty, Swarnendu: ‘*The partition of Bengal in 1947 and The Role of the Hindu MahaSabha,’* British Journal of Philosophy, Sociology and History 2, no.1, 2022.

Chatterjee, Chhanda & Mookerjee, Syama Prasad: *the Hindu dissent and the partition of Bengal, 1932-1947*. Routledge, 2020.

Chatterji, Joya: *'The fashioning of a frontier: the Radcliffe line and Bengal's border landscape, 1947–52',* Modern Asian Studies 33, no.1, 1999.

Dalwai, Hamid: *'Muslim Politics in India',* Penguin Random House India Private Limited, 2023.

Desai, Meghnad: *'Communalism, secularism and the dilemma of Indian nationhood',* In Asian nationalism, Routledge, 2002.

Dutta, N. K: '*Origin and growth of Caste in India,'* (Combined volume), Calcutta, Farm, a KLM Mukhopadhyay Pvt. Ltd, 1969.

Gilmartin, David: *'Partition, Pakistan, and South Asian history: In search of a narrative',* The Journal of Asian Studies 57, no.4, 1998.

Guha, Ranajit: *'Subaltern Studies III Writing on South Asian History and Society',* Oxford University Press, Delhi, 1994.

Guru, Gopal: *'Humiliation Claims and Context',* Oxford University Press', New Delhi, 2009.

Hazra, Nirupam: *'The Decline of the Caste Question: Jogendranath Mandal and the Defeat of Dalit Politics in Bengal',* by Dwaipayan Sen, Cambridge, MA, Cambridge University Press, 2018, xii ISBN: 9781108417761, 2020.

Islam, Aminul, and Rahman, Mashihur: *'A conceptual analysis and understanding of press freedom from Bangladesh perspective'*, Global Media Journal: Pakistan Edition 9, no.1, 2016.

Ikramullah, Shaista Suhrawardy: '*Huseyn Shaheed Suhrawardy: A Biography Karachi',* Oxford University Press, 1991.

Jinnah, Muhammad Ali: Aga Khan III, AK Fazlul Huq, Nawab Waqar-ul-Mulk Kamboh, Huseyn Shaheed Suhrawardy, Feroz Khan Noon, Khwaja Nazimuddin et al: 'All-India Muslim League', 1975.

Jhingran, Dhir: *'Hundreds of home languages in the country and many in most classrooms: Coping with diversity in primary education in India',* Social justice through multilingual education 250, 2009.

Kausar, Zeenath: *'Communal Riots in India: Hindu–Muslim Conflict and Resolution',* Journal of Muslim Minority Affairs 26, no.3, 2006.

Kumar, Raj: '*Dalit Personal Narratives Reading Caste, Nation and Identity,'* Hydrabad, Orient Blackswan, 2011.

Kokab, Rizwan Ullah and Hussain, Mahboob: *'National Integration of Pakistan: An Assessment of Political Leadership of Huseyn Shaheed Suhrawardy',* J. Pol. Stud. 24, 2017.

Ludden, David: *'Spatial inequity and national territory: remapping 1905 in Bengal and Assam', Modern Asian Studies* 46, no.3, 2012.

Malik, Anushay: *'Alternative politics and dominant narratives: Communists and the Pakistani state in the early 1950s'* In State of Subversion, Routledge India, 2023.

Mandal, Mahitosh: *'Dalit Resistance during the Bengal Renaissance',* CASTE: A Global Journal on Social Exclusion 3, no.1, 2022.

Meyer, John M: *'The Royal Indian Navy Mutiny of 1946: Nationalist Competition and Civil-Military Relations in Postwar India',* The Journal of Imperial and Commonwealth History 45, no.1, 2017.

Molla, Mohammad Kasim Uddin: *'The New Province of Eastern Bengal and Assam, 1905-1911',* PhD diss., SOAS University of London, 1965.

---------------------: 'The Bengal Cabinet Crisis of 1945' Journal of Asian History 14, no.2,1980.

Mookherjee, Nayanika: *'Never again: aesthetics of 'genocidal cosmopolitanism and the Bangladesh Liberation War Museum',* Journal of the Royal Anthropological Institute 17, 2011.

Mughal, Justice R: *'Two Nation Theory: In the Light of the Speeches of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah',* Available at SSRN 2021435, 2012.

Omvedt, Gail: '*Dalits and the Democratic Revolution,'*New Delhi ,Sage Publications, 1994.

------------------: *Ambedkar: towards an enlightened India*, Penguin UK, 2017.

Pachauri, S. K: *'Mountbatten in India and 15 Th August, 1947',* In *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 68, Indian History Congress, 2007.

Parveen, Dr. Kausar and Dr. Awan, Samina: *'Role of Pakistan National Congress in the Constitutional Development in Pakistan, 1947-1958',* Quarterly Journal of the Pakistan Historical Society 70, no.2, 2022.

Ranjan, Amit: *'Bangladesh liberation war of 1971: Narratives, impacts and the actors',* India Quarterly 72, no.2, 2016.

Roy, Kaushik: *'Partition of British India: Causes and Consequences Revisited',* India Review 13, no.1, 2014.

Roy, Suhasini: '*Barishaler Jogen Mandal',* Caste: A Global Journal on Social Exclusion 3, no.1, 2022.

Sarkar, Sumit & Sarkar Tanika (ed): *'Caste in Modern India',* Permanent Black, New Delhi, 2014.

Sana, Arunoday: *‘The caste system in India and its consequences’*, International Journal of Sociology and Social Policy 13, no.3/4, 1993.

Sanyal, Hitesh Ranjan: ‘*Social Mobility in Bengal’*, Calcutta. Papyrus, 1981.

Sen, Amartya: *‘The threats to secular India’,* Social scientist, 1993.

Sen, Dwaipayan:*‘Representation, education and agrarian reform: Jogendranath Mandal and the nature of Scheduled Caste politics 1937–1943’,* Modern Asian Studies 48, no.1, 2014.

Shah, Ghanshyam (ed): ‘*Dalit Identity and Politics,’* New Delhi,Sage Publications, 2001.

Shah, Mohammad: *‘Partition of Bengal: A Review’,* Islamic Quarterly 40, no.2 ,1996.

Singha, K.S: *‘The Scheduled Castes, revised edition’,* (Calcutta, Oxford University Press and Anthropological Survey of India, 1999.

Singh, Narender: *‘Role of Muslim League in the Partition of India’,* International Journal for Social Studies 2, no.9, 2016.

Singh, Pritam: *‘Hindu bias in India's ‘secular’constitution: Probing flaws in the instruments of governance’,* Third World Quarterly 26, no.6, 2005.

Srinivas, Mysore Narasimhachar: *‘Caste in modern India’*, The Journal of Asian Studies 16, no.4, 1957.

Thorat, Sukhadeo & Umakant (ed): ‘*Caste, Race and Discrimination,’* Jaipur & New Delhi, Rawat Publications, Reprinted 2009.

Talbot, Ian Arther: *‘The growth of the Muslim League in the Punjab, 1937–1946’,* Journal of Commonwealth & Comparative Politics 20, no.1, 1982.

Talukdar, Mohammad H R and Hossain, Kamal: *'Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy',* 1987.

Yagati, Chinna Rao: '*Dalit Studies : A bibliographical Handbook*,' New Delhi, Kanishka Publisher, 2003.

Zelliot, Eleanor: *'Understanding Dr. BR Ambedkar,'* Religion compass 2, no. 5 2008.

Webliography:

https://image.app.goo.gl/yfbaABojYBGRB16o7

http://image.app.goo.gl/SjwB5jygKLeN8EEv6

http://en.m.wikipedia.org/wiki/AdwaitaMallabarman

https://image.app.goo.gl/3s9MXLZ4mcbGxKqz5

https://www.mapsofindia.com/maps/india/prepartitionmap.htm

https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE

www.wikipedia-https://bn.wikipedia.org.

https://images.app.goo.gl/98fiLBEjXzrHZ45f7

Bimales Manna
06/09/24

গবেষকের স্বাক্ষর